সাম্রাজ্যবাদ

ফাহমিদ-উর-রহমান

সাম্রাজ্যবাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ

ফাহমিদ-উর-রহমান

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ
ফাহমিদ-উর-রহমান
প্রকাশক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১/বি গ্রীনওয়ে
ওয়্যারলেস রেলগেট, মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ
ফোন : ০১৭১১৫৮৪৮৫৫

প্রথম প্রকাশ
মে ২০১২

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

বাসাপপ্র ২০৫

প্রচ্ছদ
এ তাসনিম রহমান

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ
তাসনিম কম্পিউটার, ঢাকা

মূল্য : চারশত টাকা মাত্র

Samrajjobad
by Fahmid-ur-Rahman
Published by :
Bangla Shahitto Parishad
1/B Greenway, Moghbazar,
Dhaka-1217, Bangladesh.
Phone : 01711584855
Published On: May 2012
Price :Tk.400.00 only

ISBN-984-70274-0023-1

www.pathagar.com

মীরাকে,

যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

অন্য আলোয় দেখা
উত্তর আধুনিকতা
সংস্কৃতির স্বপক্ষে
সেকুলারিজমের সত্যমিথ্যা
উত্তর আধুনিক মুসলিম মন
মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (সম্পাদিত)

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশে ১/১১ এর ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারির শিকার হয়েছি। বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে যাচ্ছে, গৃহযুদ্ধ আসন্ন, ইসলামপন্থীরা শক্তিশালী হয়ে উঠছে ইত্যাদি আকথা-কুকথা বলে বাংলাদেশের উপর এমন একটি সরকার তখন বসিয়ে দেয়া হলো যার কোন সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের রেজিম চেঞ্জের তত্ত্ব আমরা জানি। ঐ সরকার ছিল এই তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ন। ১/১১ তে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তথাকথিত সুশীল সমাজ, কয়েকটি গণমাধ্যম ও কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের নিয়ে বাংলাদেশে এক আজগুবি সরকার তৈরি করলো। ১/১১'র পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে কি দেখা যায়? ১৭৫৭'র ২১ জুনের পলাশী ও তার পূর্বাপরের কথা স্মরণ করুন। নওয়াব পরিবারের অমাত্য ও উচ্চাভিলাষী হিন্দু সমাজ নেতারা কিভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ফোর্ট উইলিয়ামের ষড়যন্ত্রের কাছে। আমাদের এখানকার কয়েকটি বিদেশি রাষ্ট্রদূতের দফতর কি তখন ফোর্ট উইলিয়ামের ভূমিকায় নামেনি। অবশ্যই মীরজাফররা পথ দেখিয়ে এনেছিল। না হলে এতবড় ঘটনা ঘটতে পারতো না।

আমরা এতদিন একটা আত্মপ্রসাদ নিয়ে ছিলাম 'সভ্যতার সংঘাতের' আগুন থেকে বোধ হয় বাংলাদেশ মুক্ত থাকবে। কিন্তু ১/১১'র ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে দুনিয়ার হাল হকিকতে বিস্তর পরিবর্তন এসেছে। ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তানের মতো আমরাও এই যুদ্ধের টার্গেট। কমিউনিজমের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদ ইসলামকে শত্রু গণ্য করে সন্ত্রাসবাদের নামে যে অনন্ত যুদ্ধ শুরু করেছে তার আঁচ আমরাও এখন টের পেতে শুরু করেছি। এটা সত্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ যুদ্ধরত ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনের মত রক্তস্নানের ভিতর দিয়ে এখনো আমরা যাইনি তবে সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসেবে আমাদের রেহাই দেবে এরকম ধারণা করা পুরোপুরি ভুল।

www.pathagar.com

আজ আমাদের জাতীয় ঐক্য বলে অবশিষ্ট কিছু নেই। জাতীয় নেতৃত্বের শত্রু মিত্র নির্ধারণে দেউলিয়াপনা প্রকট। এর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের চোখ পড়েছে আমাদের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের উপর। আবার আমাদের সমাজে তৈরি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিষ্টভোজী ছানাপোনার দল। এদের কথা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ইরাক, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, সোমালিয়া, ফিলিস্তিনে যা করেছে তা আসলে প্রগতিশীলতার স্বার্থে করেছে কেননা এটা নাকি রেডিকাল ইসলাম মোকাবেলার কাজে নিয়োজিত।

বাংলাদেশকে এই মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তথাকথিত 'আধুনিকতা', 'উদার নৈতিকতা', 'প্রগতিশীলতার' পক্ষে দাঁড়িয়ে এখানকার মানুষের লড়াকু চেতনা ধ্বংস করে দেয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান ধারণা, সংস্কৃতির চাতালের তলে নিয়ে আসা। মনে রাখা দরকার এই সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান ধারণার অন্য নামই হচ্ছে আধুনিকতা বা প্রগতিশীলতা। এই কারণেই আজ বাংলাদেশের গণমানুষের মধ্যে প্রবাহমান ইসলামী চেতনা ও ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াই করা সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় দালালদের একমাত্র কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

মৌলবাদের জুজুর ভয় দেখিয়ে বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করার ভিতর দিয়ে দেশের মানুষগুলোকে ইরাক আফগানিস্তানের ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়ার সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই ছানাপোনারা অবাধে নিয়োজিত আছে।

সাম্রাজ্যবাদকে আজ বুঝতে হবে 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের আলোকে। কারণ এটাই এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অফিসিয়াল পলিসি। সাম্রাজ্যবাদকে আজ শুধু বামপন্থীদের মতো পুঁজির কায়কারবার বলে চালানো যাবে না। আবার অন্যদিকে 'সভ্যতার সংঘাতের' এই যুগে জাতি রাষ্ট্রের ধারণাটাও বায়বীয় হয়ে উঠেছে। মূলকথা সভ্যতাভিত্তিক এক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ঘটছে যেখানে নাকি সংস্কৃতির নৈকট্যে শরিক দেশগুলো পারস্পরিক সহায়তার পথ খুঁজছে। এক সভ্যতার দেশকে অন্য সভ্যতায় প্রোথিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। এই কারণেই কি মুসলিম দুনিয়ায় আধুনিকায়ন ও সেকুলারিকরণের চেষ্টা বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে।

www.pathagar.com

যাই হোক পাশ্চাত্যের বিশ্বজনীন হওয়ার ভানভনিতা কিন্তু আরও বেশি করে অন্য সভ্যতার সঙ্গে বিশেষ করে ইসলামের সঙ্গে সংঘাতকে যেন অনিবার্য করে তুলেছে। এর থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে পশ্চিমাদের বিশ্বজনীনতার ভনিতা পরিত্যাগ করা এবং বিশ্বরাজনীতির বৈচিত্র ও বহুসভ্যতাভিত্তিক চরিত্রকে মেনে নেয়া। এই বৈচিত্রকে মেনে নিয়ে পশ্চিমাদের উচিত হবে তাদের White Man`s Bnrden জাতীয় মিশন ত্যাগ করা। অন্যথায় মানব প্রজাতির জন্য বিশ্বশান্তি এক সুদূর পরাহত কল্পনা মাত্র রয়ে যাবে।

আজকে তাই বিশ্বমানুষের মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিনাশ প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদ যেহেতু এই মুহূর্তে ইসলামপ্রধান দেশগুলোকে তাক করেছে তাই ইসলামী জনগোষ্ঠীকে আজ সাম্রাজ্যবাদ মোকাবেলার কৌশল বের করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের চরিত্র হতে হবে আন্তর্জাতিক। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের এক আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আদর্শভিত্তিক অটল নেতৃত্ব এ মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক। সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যই চাইবে নানা ইস্যু তুলে এই ঐক্য প্রতিহত করতে। সেদিক থেকে আমাদের বুঝতে হবে পশ্চিমাদের আপ্তবাক্য নকল করে যাদের আমরা মৌলবাদী বলে গালি গালাজ করি তারাই সত্যিকার অর্থে আজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই চালাচ্ছে। ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক কি এর বড় প্রমাণ নয়। এই মুহূর্তে কৌশলগতভাবে ইসলামী রাজনীতির বিরোধিতা সাম্রাজ্যবাদের গোলামী ছাড়া আর কিছু নয়। এটা মনে করার সংগত কারণ আছে এই অবস্থানের ভিত্তিতে আগামী দিনের শত্রু মিত্র নির্ধারণ হবে এবং আমাদের এখানেও রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রবণতা সেদিকে যাবে। নানান সময়ে নানান প্রয়োজনে এই লেখাগুলো লিখেছি। সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে এটা পুরোপুরি তত্ত্বীয় আলোচনা না হলেও সাম্রাজ্যবাদের নানা কায়কারবার আলোচনার সূত্রে এসব লেখাগুলো সাম্রাজ্যবাদকে বুঝতে সহায়তা করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এ লেখাগুলোর পিছনে এক মূর্তিমান প্রেরণা হয়ে কাজ করেছেন আমার দেশ পত্রিকার মহা ব্যবস্থাপক বন্ধুবর আহমদ হোসেন মানিক। যার উদ্যোগে মূলতঃ এসব লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছে। আরো ধন্যবাদ জানাই আমার দেশ পত্রিকার

www.pathagar.com

সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে, আমার লেখা নিয়ে যার আগ্রহ ছিল অনেক। লেখা পড়ে নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবদুর রহমান সিদ্দিকী, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম মনজুর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবদুন নূর ও ড. মাহফুজ পারভেজ, ফরিদপুরের অক্লান্ত সমাজ কর্মী অধ্যাপক আবদুস সামাদ ও ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান। এদেরকে আমার প্রাণকাড়া মোবারকবাদ।

সবশেষে মোবারকবাদ জানাই আমার সহধর্মীনি ডা. মীরা মমতাজ সাবেকা ও পুত্র সৈয়দ যাইয়ান মাসুদকে যারা আমার লেখালেখির অত্যাচার নীরবে সহ্য করে।

বরাবরের মতো ধন্যবাদ জানাই এ বইয়ের প্রকাশক জনাব তৌহিদুর রহমানকে যে আমার বই প্রকাশে সবসময় ক্লান্তিহীন।

ফাহমিদ-উর-রহমান
৬০/সি পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

সূচীক্রম

বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদ

১. সাম্রাজ্যবাদ..........১৫
২. বিশ্বায়ন..........২৫
৩. কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদ..........৩৪
৪. অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ..........৪৩
৫. মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদ..........৪৯
৬. সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ..........৫৮
৭. পরিবেশগত সাম্রাজ্যবাদ..........৬৪
৮. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ..........৭০
৯. চীনা সাম্রাজ্যবাদ..........৭৭
১০. ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ..........৮৩
১১. মগজ ধোলাই..........৮৮
১২. আধুনিকতা, সন্ত্রাস ও ইনসাফ..........৯৪
১৩. সিভিল সোসাইটি..........১০৩
১৪. অকার্যকর রাষ্ট্র..........১১২
১৫. ভালো মুসলমান, মন্দ মুসলমান..........১১৯
১৬. ইরাক, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও টনি ব্লেয়ারের আত্মকথন..........১২৭
১৭. বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতির ভাঙা সেতু..........১৩৩
১৮. জাতিসংঘ, ইকবাল ও সাম্রাজ্যবাদ..........১৪০
১৯. সাম্রাজ্যবাদের মোহ ও আমাদের বিদ্বৎ সমাজ..........১৪৫
২০. চে গুয়েভারা, সাম্রাজ্যবাদ ও আজকের কমিউনিজম..........১৫৪
২১. উইকিলিকসের নথি, সাম্রাজ্যবাদ ও আজকের মুসলিম উম্মাহ..........১৬০

www.pathagar.com

ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদ

২২. ইসলাম ও সভ্যতার সংঘাত..............................১৭১
২৩. জেহাদ, ফতোয়া ও সাম্রাজ্যবাদ..............................১৮১
২৪. উদারনৈতিক ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদ.....................১৯৫
২৫. জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম.................২০২
২৬. সন্ত্রাসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম........................২১১
২৭. সাম্রাজ্যবাদের আয়নায় মুসলমানের মুখ................২২১
২৮. সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম.....................২২৯
২৯. সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের লড়াই..............২৩৫
৩০. বুদ্ধিজীবী, মাদ্রাসা ও সাম্রাজ্যবাদ.........................২৪২
৩১. ইসলামোফোবিয়া...২৪৯
৩২. সাম্রাজ্যবাদের হামাস হিস্টিরিয়া..........................২৫৫

ইতিহাস ও সাম্রাজ্যবাদ

৩৩. সিরাজউদ্দৌলা ও সাম্রাজ্যবাদ..............................২৬৫
৩৪. ঈমান ও নিশান...২৭১
৩৫. উইলিয়াম ডালরিম্পলের বই, ১৮৫৭'র লড়াই
ও সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ..২৭৭
৩৬. যেন ভুলে না যাই...২৮৯
৩৭. ১৮৫৭ : সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহ................২৯৫
৩৮. ফিলিস্তিনের আরমাগেডন.......................................৩০১
৩৯. সানুসী আন্দোলন...৩১০
৪০. দেওবন্দের ওলামারা..৩১৬
৪১. হায়দারাবাদ ট্রাজেডি...৩২২
৪২. ফরায়েজী আন্দোলন ঃ আত্মসত্তার রাজনীতি...............৩২৬

www.pathagar.com

বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ

১.

শব্দ বা ধারণা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটা এখন বহুল ব্যবহৃত। তবে সেটা নিন্দার্থে। আগে বামপন্থীরা এ শব্দটা বেশি বেশি ব্যবহার করতেন। এখন ইসলামপন্থীরাও করেন। তত্ত্বগত দিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝায় একটি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ওপর আরেকটি দেশের নিয়ন্ত্রণ। অপর রাষ্ট্র গ্রাস করে বা নিয়ন্ত্রণ করে সেই অঞ্চলের মানুষকে জোর করে বিদেশি শাসনাধীনে আনা এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য। এই নিয়ন্ত্রণ শাসক ও শাসিতের, কর্তৃত্ব ও পরাধীনতার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, আজকের দিনে এই সম্পর্কের প্রথম অংশের অধিকারী হচ্ছে পাশ্চাত্য আর শেষাংশের ভারবাহী হচ্ছে অপাশ্চাত্য, বিশেষ করে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলো। শাসক ও শাসিতের এই পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর আবার গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ নামের তত্ত্বগত আদর্শ।

ইংরেজি 'ইম্পেরিয়ালিজম' শব্দটার বাংলা তরজমা করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ। রোমান শব্দ ইম্পেরিয়াল থেকে ইম্পেরিয়ালিজম শব্দটার উদ্ভব, যার অর্থ হচ্ছে অবাধ সামরিক আধিপত্যের একত্রীকরণ ও সমন্বয়। একসময় নেপোলিয়নের আগ্রাসী নীতিকে বোঝানোর জন্য 'ইম্পেরিয়ালিজম' কথাটা ব্যবহার করা হতো। পরে ইংরেজ লেখক ও রাজনীতিবিদরা সাম্রাজ্যবাদ শব্দটার নিন্দামূলক দিক বাদ দিয়ে এর নতুন অর্থ আরোপ করার চেষ্টা করেন। ধীরে ধীরে তা ভূখণ্ড প্রসারের মাধ্যমে 'বৃহত্তর বৃটেন' গঠনের নীতিরূপে গৃহীত হয়। এভাবে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটা ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

এই ইম্পেরিয়ালিজম শব্দটার কাছাকাছি আর একটা শব্দ হচ্ছে এম্পায়ার। এক সময় আমরা কলোনির সুবাদে ব্রিটিশ এম্পায়ার শব্দটা বেশি বেশি শুনতাম। সে সময় ব্রিটিশ এম্পায়ার বলতে যে সব দেশে ব্রিটেনের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল অথবা যে সব দেশ ব্রিটেনের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে নির্ভরশীল ছিল তাকেই বোঝানো হতো। ব্রিটিশরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দুই ধরনের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। একটা হচ্ছে Settler Colony, বসতি উপনিবেশ। এসব দেশে ব্রিটিশ নাগরিকরা গিয়ে নিজেদের বসতি গড়ে তোলে এবং

www.pathagar.com

কর্তৃত্ব হাতে নেয়। যেমন উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড। আর এক ধরনের উপনিবেশকে বলা হতো Trading Colony, বাণিজ্যিক উপনিবেশ। এখানে ব্রিটিশরা বাণিজ্যিক স্বার্থে এসেছিল এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই এসব অঞ্চলে তারা শাসন-শোষণ চালাত। যেমন ভারতবর্ষ। এই উপনিবেশগুলোকে চিহ্নিত করা হতো Colony বলে, যাদের কাছে ব্রিটেন বিবেচিত হতো Mother Country হিসেবে। অবশ্য শাসন-শোষণের ক্ষেত্রে এই তথাকথিত Mother Country বসতি ও বাণিজ্যিক উপনিবেশে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করত। কারণ স্পষ্ট। একটিতে বাস করত, তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী, অন্যটিতে কালো, বিধর্মী প্রজারা।

তবে কলোনি ও কলোনাইজারদের এই পারস্পরিক সম্পর্কের আবরণের তলায় সাম্রাজ্যবাদের অন্য রকম অভিসন্ধিও ছিল। ইউরোপের বন্দরগুলো থেকে উপনিবেশিত দেশগুলোতে শুধু বাণিজ্যিক পণ্যই আসত না, এখানে আরো চালান হতো সেখানকার ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রশাসন–এমনকি চিন্তন প্রক্রিয়া, যা উপনিবেশের মানুষের ওপর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক হয়েছে এবং এর ফলে দেশীয়দের ভেতরে তৈরি হতে পেরেছে এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ। সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক দিক দিয়ে উপনিবেশগুলোতে আধিপত্য বিস্তারের এই পদ্ধতি ও কাঠামোকে বলে সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদ–এ দুটি কাছাকাছি প্রত্যয় হলেও তাত্ত্বিকভাবে এর প্রয়োগগত কিছু তফাতও আছে। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে সেই দর্শন, যা কিনা উপনিবেশকারী দেশের সঙ্গে উপনিবেশিত দেশের নৈতিক দিক দিয়ে সংযুক্ত থাকার ভিত প্রস্তুত করে। আর উপনিবেশবাদ হচ্ছে ওই দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগিক দিকটি বিবেচনা করে। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের তফাত বোঝার জন্য আমরা মরহুম এডওয়ার্ড সাঈদের সাহায্য নিতে পারি। তিনি তার Culture and Imperialism কেতাবে লিখেছেন : 'Imperialism' means the practice, the theory, and the attitudes of a dominating metropolitan centre ruling a distant territory, colonialism, which is almost always a consequence of imperialism, is the implanting of settlements of distant territory. পশ্চিমাদের

www.pathagar.com

বর্ণবাদী ও আধিপত্যকামী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল তাদের উপনিবেশগুলোতে। যাকে এডওয়ার্ড সাঈদ বলেছেন Cultural Hegemony. কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই হেজিমনির সঙ্গে এমন সব দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক তত্ত্ব পশ্চিমারা মিশিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে বাইরে থেকে এর একটা নির্দোষ চেহারা ফুটে উঠেছিল; তা কিন্তু বহুদিন যাবৎ কলোনির অধিবাসীরা বুঝতে পারেনি। এখনো সাম্রাজ্যবাদের সেই তৎপরতা ভিন্নরূপে, ভিন্ন আদলে বহমান। সেটাও কি আমরা যথাযথভাবে ধরতে পারছি?

২.

সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় মিসর ও মেসোপটোমিয়ায়, রোমে এবং তার পূর্বে আলেক্সান্ডারের মেসিডোনিয়ায়। অতীত যুগের ইতিহাস মানে হচ্ছে অনেকটা সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস। সেই ইতিহাসে আলেক্সান্ডার, চেঙ্গিস খাঁ, নেপোলিয়ন, হালাকু খানদের কথা আছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা স্থানীয় শাসনকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করে সেখানেও প্রতিষ্ঠা করত এবং এভাবে তারা তাদের প্রভাবকে সম্প্রসারিত করত। এই সংঘাতগুলোর উদ্দেশ্যই ছিল অন্য জাতির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক অধিকার হরণ, সাংস্কৃতিক বৈষম্য সৃষ্টি, পুঁজি রপ্তানি, বাজার দখল প্রভৃতি। ইউরোপের ইতিহাসে রোমানরা এক সময় ভয়ানক প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল এবং সমগ্র ইউরোপ তাদের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। দেখার বিষয় হলো, রোমান শাসকরা নিজেদের সামরিক-রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ক্যাথলিসিজমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে অংশ নিয়েছিল। ফলে একটা সময় কার্যত ইউরোপে রোমান আধিপত্য আর ক্যাথলিসিজম একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই রোমান সাম্রাজ্যকে Holy Roman Empire বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ব্রিটিশরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের পাশাপাশি খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের ওপরও গুরুত্ব দিয়েছিল। আর এ কারণেই ঘটতে পেরেছিল সিপাহী বিপ্লবের মতো মহাঅভ্যুত্থান। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ বলতে ইউরোপ-আমেরিকাকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদকেই বোঝায়। আবার সাম্রাজ্যবাদ শব্দটার অর্থ ও তাৎপর্য বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। এক সময় সাম্রাজ্যবাদ বলতে সরাসরি অন্য দেশ

www.pathagar.com

দখল ও অধীনস্থকরণের ব্যাপারটা বোঝাত। এখন সাম্রাজ্যবাদ নতুন অবয়বে দুনিয়া নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কয়েকটি মাধ্যম হচ্ছে, বিভিন্ন অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ), বহুজাতিক কোম্পানি, মিডিয়া প্রভৃতি। নতুন এই ব্যবস্থার নাম হচ্ছে বিশ্বায়ন।

৩.

গত চারশ' বছর ধরে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ সম্পদ লুণ্ঠন, বাণিজ্য বিস্তার ও অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের ভেতর দিয়ে পর্ব থেকে পর্বান্তরে এগিয়ে গেছে। বহু ঘটনার মিশেল দিয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার উদ্ভব। ইউরোপের ইতিহাসে এনলাইটেনমেন্ট একটা বিপ্লবী ঘটনা। সেই ঘটনার ভেতর দিয়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসরতা, নানাবিধ আবিষ্কার-উদ্ভাবনা ইউরোপীয়দের দুনিয়া দখলের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে তোলে। প্রথমদিকে এ দখল-পুনর্দখল ছিল ইউরোপের মূল চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরে পাল তোলা জাহাজ ও বাতাসের গতিপথ আবিষ্কারের ফলে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় ইউরোপীয়রা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় সাম্রাজ্য এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় বিস্তৃত হয় প্রথমে পাল তোলা জাহাজে, পরে বাষ্পচালিত জাহাজের বদৌলতে। শুরুতে আপাত নির্দোষ ব্যবসার মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা শাসন ক্ষমতা দখলের ভেতর দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বাণিজ্য, নির্বিচারে দখলীকৃত দেশের সম্পদ লুণ্ঠন ও খ্রিস্টবাদ প্রচার। কিন্তু ইউরোপীয়রা তাদের এই নিকৃষ্ট কর্মকে আড়াল করার জন্য তৈরি করল সাম্রাজ্যবাদী এক তত্ত্ব। সেই তত্ত্বটা হচ্ছে, কেন তারা ওই সব দেশে যাচ্ছে, কেন তারা প্রতিষ্ঠা করছে সাম্রাজ্যিক শাসন তার এক বর্ণবাদী বয়ান। সেই বয়ানের প্রতিপাদ্য হচ্ছে এ রকম : যেহেতু এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ হচ্ছে অসভ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার আলো বঞ্চিত। তাই ইউরোপ তাদের কাছে এসেছে সভ্যতার দূত হয়ে, আলোক বর্তিকা নিয়ে। তার মানে হচ্ছে, ইউরোপ হচ্ছে সভ্য, অবশিষ্ট বিশ্ব হচ্ছে নিচু, অন্য প্রকৃতির, বিকৃত, পদানত ও পদানত হওয়ার যোগ্য।

www.pathagar.com

পশ্চিমের এই বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক বিচার বিবেচনার মূলে আছে সেখানকার রেনেসাঁ, এনলাইটেনমেন্টের পথ ধরে বিকাশ হওয়া আধুনিকতার চিন্তা-ভাবনা, যার কিছু ইতিবাচক উপাদান থাকলেও সব মিলিয়ে তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীন চরম সত্যের একমাত্র মালিক-মোক্তার বলে নিজেকে ভাবার দম্ভ। সেই হিসেবে আধুনিকতাও এক ধরনের মৌলবাদ, যুক্তির মৌলবাদ, যা অন্য জীবনধারাকে যুক্তিবর্জিত, অশিষ্ট, বর্বর মনে করে। আধুনিকতা কোনোভাবেই অসাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। অন্যের যুক্তি তার কাছে অযুক্তি। উপনিবেশ বা অপশ্চিমা বিশ্বের মানুষ তার কাছে অসভ্য, বর্বর। প্রাচ্য-জ্ঞান তার কাছে অজ্ঞানতা, অবিজ্ঞান। আজো তাই আধুনিক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী ও নীতি নির্ধারকরা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানবাধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা, যুক্তিবাদ, আইনের শাসন ইত্যাদি দেখিয়ে যখন-তখন যে কাউকে সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত বানিয়ে ছাড়ে। মানবতা, মানব-মর্যাদা, মানবাধিকার ইত্যাদি কথাবার্তা বলে তারা নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের সভ্যতা, নিজেদের মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয় সবার ওপর। আজকাল পেপসি, কোকাকোলার মতো মার্কিন বহুজাতিকও সাংস্কৃতিক বহুত্ব, পার্থক্যের কথা বলে। বহুত্ব ঠিক আছে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা মানবতা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। কারণ তা মানব মর্যাদার সঙ্গে জড়িত। ওই মানব বা মানবতা যে আসলে একটা মার্কিন মানব অনুসারী মানব সেটা চেপে যাওয়া হয়। হিজাবপরা ইরাকের, ফিলিস্তিনের, আফগানিস্তানের মেয়ে নিপীড়িতা, বন্দিনী, অত্যাচারিতা, তার স্বাধীনতা নেই। হিজাব ছেড়ে পশ্চিমা পোশাক স্কার্ট পরলে সেটাই তার মুক্তি! দেখার বিষয় হচ্ছে আধুনিকতা, স্বাধীনতা প্রভৃতির সঙ্গে পশ্চিমা পোশাককেও এখন সমার্থক বানিয়ে ফেলা হয়েছে। ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করলে সেটা গোড়ামি, তাতে অযুক্তির শেষ নেই। ইসলাম ছেড়ে পশ্চিমা মিডিয়া ও বিজ্ঞাপন সংস্থার আদলে নিজেকে বাড়তে দিলে সেটা স্বাধীনতা, যুক্তি, স্বনির্ভরতা? পশ্চিমা সংস্কৃতি, ভোগবাদী বুর্জোয়া সংস্কৃতির মানদণ্ডে যে প্রয়োজন তৈরি হয় তাই স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন?

এই জন্যই সাদ্দামের 'স্বৈরতন্ত্রে' কিংবা লাদেনের 'নৈরাজ্যে' নাগরিক অধিকার নেই, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত। জনগণের গণতান্ত্রিক শাসন উপেক্ষিত। সেই স্বৈরতন্ত্র ছেড়ে মার্কিনের হাতের পুতুল কোনো সরকারের পশ্চিমা রাজনৈতিক আধুনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত?

www.pathagar.com

আমেরিকা সারা দুনিয়ায় গণতন্ত্র চায়। কিন্তু সেই গণতন্ত্র আমেরিকার নিজের মতো করে ভাবা গণতন্ত্র। অন্যের ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা, রাষ্ট্রতত্ত্ব, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হচ্ছে অগণতান্ত্রিক। আর তাই আজকে তৃতীয় বিশ্ব, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জ্ঞানতত্ত্ব, সংস্কৃতি, রাজনীতি পশ্চিমা আধুনিকতার দ্বারা লাঞ্ছিত। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ভয়ঙ্কর ক্ষমতালিপ্সা তো তথাকথিত এনলাইটেনমেন্ট দ্বারা অনুমোদিত। ওই আধুনিকতার মতে অপশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো যথেষ্ট আধুনিক ও গণতান্ত্রিক নয়। তাই তাকে আক্রমণ করাই ন্যায্য। আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনের মতো জাতি-রাষ্ট্রগুলো হিংস্র কামড় বসিয়েছে অন্য অপশ্চিমা কয়েকটা ব্যর্থ নেশন-স্টেটের শরীরে। ১১ সেপ্টেম্বরের পর মানবতা ও মানবাধিকারের যুক্তি দেখিয়ে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিরাপদ করার অজুহাতের কথা বলে জখমী বাঘের মতো আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী নেশন-স্টেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ চালিয়েছে, তার ভাষায়, প্রাক আধুনিক কয়েকটা রাষ্ট্র ও সভ্যতাকে। পশ্চিমা আধুনিকতার চোখে এই সব প্রাক আধুনিক, অনাধুনিক, অসম্পূর্ণ আধুনিক, অযুক্তিচালিত, অসভ্য, বর্বর রাষ্ট্র রীতিমত আগ্রাসনের যোগ্য। 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র' (rogue state), 'ব্যর্থ রাষ্ট্র', 'স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র', 'অগণতন্ত্রী রাষ্ট্র', 'সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র' বলে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো তেমন কিছু দোষের নয়।

শুধু তাই নয়, আমেরিকা হানা দিয়েছে এনলাইটেনমেন্টের সন্তান সিভিল সোসাইটিকে, তার তথাকথিত ব্যক্তিমর্যাদা, নাগরিক অধিকার, মতপ্রকাশ ও মিডিয়ার স্বাধীনতাকে; এমনকি সে রেহাই দেয়নি নেশন-স্টেটের মহাভোজসভা জাতিসংঘকেও। উপসাগরীয় যুদ্ধ, বসনিয়ার যুদ্ধ, আফগানিস্তান আক্রমণ, ইরাক আগ্রাসন, ইরান-সিরিয়া-উত্তর কোরিয়াকে হুমকি-ধমকি—এসবই কিন্তু ওই আধুনিকতা-এনলাইটেনমেন্ট প্রজেক্টের অংশ। ওই এনলাইটেনমেন্টের ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আফগানিস্তান আক্রমণের নাম দেয়া হয়েছিল অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম এবং ইরাক আগ্রাসনের নাম দেয়া হয়েছে অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম। সিনিয়র ও জুনিয়র দুই বুশই কিন্তু বলেছিলেন ইরাককে ফ্যামিলি অফ নেশনসে ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই মহান কাজের দায়িত্ব নিয়েছে আমেরিকা। ওরা দাবি করছে, ওই পশ্চিমা আধুনিকতার ন্যায্যতা। ওদের মানদণ্ডে যে রাষ্ট্র সাফল্য পায়নি তাই ব্যর্থ রাষ্ট্র। আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরান, লিবিয়া,

www.pathagar.com

কিউবা, চীন, উত্তর কোরিয়া, লেবানন, ভেনিজুয়েলা, সুদান, সোমালিয়া, পাকিস্তান–এগুলো পশ্চিমা সভ্যতা ও গণতন্ত্রের মডেলের বাইরে থেকে তাদের কোনো অনুমোদন আশা করতে পারে না। বুশ তো এদের কয়েকজনকে নাম ধরে শয়তানের অক্ষই বলেছিলেন। আসলে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ছকের বাইরে যা কিছু, তাই ওদের কাছে ভয়ঙ্কর, অজানা, সন্ত্রাসবাদের আড্ডা।

বুশরা ইরাক যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, এ যুদ্ধ নাকি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য! গণতন্ত্রের অদ্ভুত উদাহরণ বটে। ইরাকে শাসক কে হবেন–সেটা ইরাকি জনগণ ঠিক করছে না, পেন্টাগন-সিআইএ ঠিক করছে। এটা শুধু ইরাকের কথা নয়, অপশ্চিমা অনেক দেশের ভাগ্যেই এমনটা ঘটেছে।

এ চিন্তাখাতে ভাবতে ভাবতে আমরা ভুলেই যাই আধুনিক মার্কিন রাষ্ট্র হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের পীঠস্থান। আগে যেমন ছিল ব্রিটেন বা ফ্রান্স।

আন্তর্জাতিক সমাজের বিরুদ্ধে, হিরোশিমা-নাগাসাকি, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, সিআইএ'র বিশ্বজোড়া ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক হত্যা, বিপুল অর্থ ঘুষ, ভয়াবহ হিংসা, অস্ত্র ও মাদক চালানে অর্থ যোগানদার, বীভৎস পরিবেশ দূষণ, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, অস্ত্র উৎপাদন, অর্থনৈতিক লুণ্ঠন, ইরাক-আফগানিস্তান আগ্রাসন–কিনা করেছে সে!

অথচ আমরা অবাক হয়ে দেখি, আমাদের দেশের একাংশ, বিশেষ করে গণমাধ্যমগুলো, আমেরিকার এমত কার্যক্রমকে খোলাখুলি সমর্থন করে। 'ব্যর্থ রাষ্ট্র', 'অকার্যকর রাষ্ট্র' বানানোর ছুঁতো খোঁজে। 'মৌলবাদ', 'জঙ্গিবাদে'র জিগির তোলে। এরা সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে দেশ-জাতি-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও দ্বিধা করে না। আমরা বুঝতে পারি না, আমরা সাম্রাজ্যবাদের চক্রে পড়ে বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকি।

৪.

সাম্রাজ্যবাদকে মার্কসবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ঝোঁক দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করার জন্য 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' নামে একটা বইও লিখেছিলেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, যুদ্ধ ও আগ্রাসন হলো পুঁজিবাদের এক অনিবার্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার। বিদেশ লুণ্ঠন, উপনিবেশ অধিকার ও অপহরণ, নতুন বাজার দখল– এসব কারণেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো আগ্রাসী

www.pathagar.com

যুদ্ধ করে। পুঁজিবাদ দখল করতে চায় নতুন উপনিবেশ। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী জাতি-রাষ্ট্রগুলো তাদের দেশের পুঁজির বিকাশকে সহায়তা করে।

এ জন্যই আমরা দেখি, সতের, আঠার, উনিশ ও বিশ শতকে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় ইউরোপীয় দেশগুলোর ভেতরে উপনিবেশ দখলের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কারণ পুঁজিবাদীরা বুঝে গেছে উপনিবেশগুলোর সস্তা শ্রম ও কাঁচামালের মাহাত্ম্য। তাই যে উপনিবেশে সস্তায় যে পণ্য উৎপাদন করে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া যায়, সেখানে তারা সেই পণ্য উৎপাদনে মনোযোগী হয়। ভারতবর্ষে তারা করে নীলের চাষ। ক্যারিবিয়ায় করে আখের চাষ। ইউরোপে যখন বাণিজ্য পুঁজি শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় তখন উপনিবেশগুলো হয়ে উঠল ইউরোপের শিল্প কারখানার কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্র এবং একই সঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের বিশাল বাজার। এতে করে ইউরোপে তৈরি হয় বিপুল শ্রমিক শ্রেণী। কর্মের সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর উপনিবেশিত দেশগুলোতে বিক্রীত পণ্য হয়ে ওঠে বিপুল মুনাফার উৎস। সাম্রাজ্যবাদী এই মুনাফা চক্র নিয়েই মার্কসবাদী বিশ্লেষণের বিস্তার ঘটেছে। লেনিনের বিশ্লেষণকে খাটো করার প্রশ্ন আসে না। তার বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতাকেও ফেলা যাবে না। তবে সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ঝোঁক যথেষ্ট নয় বলে মনে হয়। কারণ সাম্রাজ্যবাদের একটা দর্শন থাকে। সেই দর্শনের তাগিদেই তারা বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং প্রয়োজনে সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। এই আধিপত্যের প্রয়োজনেই তারা উপনিবেশিত রাষ্ট্রে নতুন ধরনের প্রশাসনিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সাম্রাজ্যবাদের নীতি নির্ধারক ও দেশীয় দালাল শ্রেণী এসব ব্যবস্থাকে তাদের সদিচ্ছার প্রমাণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়। আমরা মেকলের বিখ্যাত উক্তির কথা স্মরণ করতে পারি–যার মাধ্যমে ভারতে ঔপনিবেশিক শিক্ষা বিস্তারের প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। অথচ এই শিক্ষা নিয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কি বিপুল আগ্রহ, তা দেখলে শরমে মাথা নিচু হয়ে যায়। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কি সেই মেকলে বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদের অনুকারী মধ্যস্থতাকারীর জায়গায় কাজ করছেন না?

www.pathagar.com

আমরা দেখেছি সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলোতে শক্তির জোরে নতুন একটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে চেপে রেখে তাদের সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বকে দেখার চেষ্টা করেছে পশ্চিমা দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে; কিন্তু মানব সভ্যতার বৈচিত্র্যকে তারা মানতে রাজি হয়নি। অথচ এরাই সারা দুনিয়ায় ফেরি করে বেড়িয়েছে প্লুরালিজম ও মালটিকালচারালিজমের অমৃত বাণী। এমনিভাবে সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ যে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-ভাষিক আধিপত্য সৃষ্টি করল, তা কিন্তু উপনিবেশিতের মনে সৃষ্টি করল হীনমন্যতা এবং কলোনিয়াল শিক্ষায় শিক্ষিত অনুকারী প্রজন্ম ঘৃণা ও বর্জন করতে শিখল স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বসংস্কৃতিকে। কারণ কলোনির শিক্ষা হচ্ছে গোলামির শিক্ষা। কলোনিয়াল আধিপত্যের এরকম শিকার কমবেশি হয়েছিলেন আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকেও আমরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে ঈশ্বরের শাসন হিসেবে প্রত্যয়নপত্র দিতে দেখেছি। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি এক ধরনের দৃশ্যমান ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় আধিপত্যও লক্ষণীয়। আমরা দেখেছি, ব্রিটিশদের এদেশে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার। ইতিহাস থেকে দেখছি, যে কোনো উপনিবেশেই খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা আগে পৌঁছেছেন, সেখানে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটা ভিত প্রস্তুত করেছেন এবং শেষমেষ সাম্রাজ্যবাদ স্বশরীরে আবির্ভূত হয়েছে। এটা করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদ অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়েছে। আধুনিককালে ইসলাম হচ্ছে এরকম একটা আক্রান্ত ধর্মের নাম। এই কারণেই দেখি, একালেও প্রেসিডেন্ট বুশ ক্রুসেডের ডাক দেন, ঈশ্বর ও যিশুর নামে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কি তাহলে এক ধরনের ধর্মযুদ্ধ–সাম্রাজ্যবাদের আলোচনায় সে বিবেচনাটাও একান্ত জরুরি।

সাম্রাজ্যবাদকে অর্থনীতির সূত্রে ব্যাখ্যার পাশাপাশি ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এডওয়ার্ড সাঈদ আমাদের আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছেন। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদীরা যে যুগে সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব এনে হাজির করেছে সেই কালে সাম্রাজ্যবাদকে সংস্কৃতির

www.pathagar.com

সূত্রে ব্যাখ্যা করা মূল্যবান হয়ে উঠেছে। ধর্ম ও সংস্কৃতির পার্থক্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য ধর্ম ও জাতিকে কিভাবে দেখে, সেই দেখা ও বিচার বিবেচনার মধ্যে যে বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির তাড়নায় সাম্রাজ্যবাদীরা দুশমনি করে তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

৫.

আজকে আমরা সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি চাইছি। কিন্তু সেটা কীভাবে? এক সময় এই মুক্তির– স্বাধীনতার একটা ছেলেভোলানো নাম দেয়া হয়েছিল ডিকলোনাইজেশন। এই ডিকলোনাইজেশন কিন্তু উপনিবেশগুলোতে জাতীয়তাবাদ-জাতি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের ধারণাটাও ঔপনিবেশিক ধারণা, ঔপনিবেশিকতার সূত্রেই এটা আমরা পেয়েছি। আবার রাজনৈতিক ডিকলোনাইজেশন সম্ভব হলেও সাংস্কৃতিক-ভাষিক, শিল্প জগতের ডিকলোনাইজেশন কি সম্ভব হবে? কারণ সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ তো আমাদের জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে দিয়েছে। তত্ত্বগতভাবে হয়তো আমরা সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি; কিন্তু এই চেতনাগত উপনিবেশের হাত থেকে আমাদের মুক্তি কই?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডাযুদ্ধের আঁচ কমে যাওয়ার পর আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে তাবত দুনিয়া এক নির্মম সাম্রাজ্যের অধীনে চলে গেছে। এ এক নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ, নতুন ধরনের উপনিবেশবাদ, নতুন ধরনের এক মেরু-এককেন্দ্রিক বিশ্ব; যার রাজধানী ওয়াশিংটন আর তার রাজত্ব হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনো দেশেরই কার্যত রাজধানী নেই। সমগ্র পৃথিবীর রাজধানী আজ ওয়াশিংটন। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক-সামরিক এই আধিপত্যকে বলা হচ্ছে নিও-ইম্পেরিয়ালিজম বা নিও-কলোনিয়ালিজম। আমেরিকার নীতি-নির্ধারকদের ভাষায় প্রজেক্ট ফর নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি। এই নতুন বাস্তবতায় দুনিয়ার তামাম নিপীড়িত মজলুম মানুষের লড়াই ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই। তবে সেই লড়াইয়ের প্রকৃতি আর আগের মতো হবে না। আবার আজকের দুনিয়ার জ্ঞান জাগতিক বাস্তবতা ধরতে না পারলে এ লড়াই সহজও হবে না।

www.pathagar.com

বিশ্বায়ন

১.

কমিউনিজমের পতনের পর আজকের এক মেরু বিশ্বে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন শব্দটি এক আন্তর্জাতিক ও বিশ্বমানবিক আদর্শরূপে অহর্নিশ প্রচারিত হচ্ছে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি গণমাধ্যমে, সরকারি-বেসরকারি নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তে আর লেখক-বুদ্ধিজীবীদের নিরন্তর আলোচনায় এ শব্দটি রীতিমতো একটা সম্মোহন জাল তৈরি করে ফেলেছে। এখন আমাদের প্রতিনিয়ত শুনতে হচ্ছে বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে, দুনিয়াটা একটা বিশ্বগ্রামে পরিণত হচ্ছে। এখন আমরা এই বিশ্বায়নের পথের পথিক না হতে পারলে কালের গতিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

প্রথমে মনে রাখতে হবে, বিশ্বায়নের প্রচার-প্রচারণার আড়ালে চলছে একটি আন্তর্জাতিক কায়েমি স্বার্থবাদীদের সুপরিকল্পিত ও সুসংঘবদ্ধ অভিযান, যা একটি বিশেষ মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আর্থিক, সামরিক ও রাজনৈতিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে দুনিয়ার তাবত মানুষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়। অবশ্য দেশে দেশে এই শ্রেণীর অন্নভোজী ও তল্পিবাহী গোষ্ঠীও একই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বায়নের জয় নিশান কারা তুলে ধরছে? তাদের স্বার্থ কী? তারা কোন বস্তুর বিশ্বায়ন চায়? এই বিশ্বায়নে কার ক্ষতি, কার লাভ? কোন বিশেষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আদর্শ বিশ্বায়নের নামে সারা পৃথিবীজুড়ে বলবৎ করার চেষ্টা হচ্ছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দেখা যাবে, বর্তমানে বিশ্বায়নের নামে যে বিপুল প্রচার-প্রচারণা চলছে তার পেছনে রয়েছে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ধনবাদী গোষ্ঠী, তাদের বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তাদের করায়ত্ত আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বহুজাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রচারিত এই বিশ্বায়নের লক্ষ্য হচ্ছে সারা দুনিয়ার বিশেষত, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোর বাজার, শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ দখল আর সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেগুলোর ওপর চিরস্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। সর্বোপরি পশ্চিমের ধনবাদী দেশগুলোর রাজনৈতিক ও

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দুনিয়াজুড়ে প্রসারিত ও সুরক্ষিত করা এবং পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিজমের পর বিকল্প ইসলামী আদর্শকে ধ্বংস করে ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের স্বার্থ সুরক্ষা করা। সাম্রাজ্যবাদ শব্দটা এখন বহু ব্যবহারে মলিন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া মোটেই বন্ধ হয়ে যায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তরকালে ধনবাদী দেশগুলো বিশ্বায়নের ছদ্মনামে যে অভিযান শুরু করেছে তা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদেরই একটা বিবর্তিত, বলা চলে পরিণত রূপ। সাম্রাজ্যবাদ, পরদেশ লুণ্ঠন ও নির্দয়ভাবে আফগানিস্তান, ইরাক প্রভৃতি দেশের ওপর নিষ্ঠুর-নির্দয় বোমা হামলা ও যুদ্ধ– এই প্রকট অসভ্যতা ও অমানবিকতাকে আড়াল করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী ধারণাটার জায়গায় গ্লোবালাইজেশন, বাংলায় বিশ্বায়ন কথাটা চালু করা হয়েছে। তাই ঐতিহাসিক কাল থেকে মানুষ যে ঐক্য, সাম্য ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছে, এই বিশ্বায়নের সঙ্গে তার কোন লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। যান্ত্রিক প্রগতি ও তথাকথিত মুক্তবাণিজ্যের ফলে পৃথিবী যদি একটি বিশ্বগ্রামে পরিণত হয় তবে সে গ্রামে সাম্য, মুক্তি ও সমৃদ্ধির বদলে জমিদার-মহাজনের শোষণ-শাসনই প্রবল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি।

২.

আজ যে দুনিয়াজুড়ে বিশ্বায়নের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তা কোনো নতুন ঘটনা নয়, বরং ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদের পরম্পরামাত্র। একদা ঔপনিবেশিকতার ভেতর দিয়ে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ানো হয়েছিল। এ সময়ে উপনিবেশগুলোর কাঁচামাল, শ্রমশক্তি আর পণ্য বাজার দখল করে মজবুত ধনতন্ত্রের ভিত গড়ে উঠেছিল। উপনিবেশিত দেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠন করেই ইউরোপের শিল্প বিপ্লব পাখা মেলেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ধনবাদী দেশগুলো তথাকথিত ফ্রি ট্রেড বা মুক্তবাণিজ্য তত্ত্ব নিয়ে এলো। পৃথিবীর সব মানুষের মঙ্গলের কথা বলে মুক্তবাণিজ্যের তত্ত্বের আড়ালে পশ্চিমাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো পৃথিবী জোড়া উপনিবেশগুলোর বিশাল বাজারে বিনা শুল্কে ও বিনা বাধায় নিজেদের পণ্য বিক্রি করা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে সামরিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দখলদারি কঠিন হয়ে পড়ায় পশ্চিমের ধনবাদী দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশকে অসম চুক্তিতে বেঁধে

www.pathagar.com

ফেলে কার্যত তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেয়। জাতিসংঘের ভিটো ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর স্বার্থেই তৈরি। এ ধনবাদী দেশগুলো বৈদেশিক ঋণের সঙ্গে এমনসব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শর্ত জুড়ে দেয় যাতে দরিদ্র দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মহাজন দেশগুলোর কাছে বাঁধা থাকে। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ, আংকটাড প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থায় অবৈধ আধিপত্য খাটিয়ে তাদের ঋণদান নীতি একইভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নিজেদের স্বার্থে এবং গরিব দেশগুলোর বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। শুধু তাই নয়, নিজেদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সস্তায় গরিব দেশের কাঁচামাল কিনে চড়াদামে সেখানেই নিজেদের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে দেশগুলোকে আধা উপনিবেশে পরিণত করে।

ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তরকালে প্রতিরোধহীন বিশ্বে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের অবাধ অভিযান বিশ্বায়নের আড়ালে আবার শুরু হয়েছে। এই বিশ্বায়নের নবতর স্ট্র্যাটেজিতে আছে একই সঙ্গে বিশ্ব যোগাযোগ, অর্থনীতি, সামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণের সাম্রাজ্যবাদী কৌশল।

৩.

সাম্রাজ্যবাদের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে প্রথম থেকেই প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের স্ফীতি হয়েছে ও সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছে অন্যদিকে আবার সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে যোগাযোগ মাধ্যমগুলোরও উন্নতি ঘটেছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রচুর বিনিয়োগ ঘটেছে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পরস্পরকে বিকশিত করেছে।

বর্তমান বিশ্বায়িত যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর ইন্টারনেটের আবির্ভাব। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে সারা পৃথিবীতে সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্ভব। সাম্য ও গণতন্ত্রের নীতির ভিত্তিতে ইন্টারনেট প্রযুক্তি পরিচালনা সম্ভব হলে মানব জাতির ভিতরকার সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হতো, সভ্যতার অগ্রগতিও ত্বরান্বিত হতো। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর পুঁজিপতি শ্রেণী সংবাদপত্র, টেলিভিশনের মতো কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে, যার ফলে এসব গুটিকয়েক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিশ্ববাজারকে

www.pathagar.com

যেমন একদিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তেমনি বিশাল মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে। এভাবে আন্তর্জাতিক অসাম্য ও শোষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া আমেরিকার নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি ও যুদ্ধবাজিতে এবং পুঁজিবাদী পশ্চিমা সংস্কৃতি সারাবিশ্বে বিশেষত আজকের মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিতে কম্পিউটার প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা বিশেষভাবে সাহায্য করছে। বিশ্বায়নের সুবাদে এখন বলা হচ্ছে, যোগাযোগ প্রযুক্তির বৈপ্লবিক উন্নতি হয়েছে। আসল কথা হলো, সেই বৈপ্লবিক ঘটনাকে পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার না করে মূলত ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বময় শোষণ-শাসনকে চিরস্থায়ী করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। আর তাই এর মঙ্গলময় দিকগুলোর পরিবর্তে অমঙ্গলকামী রূপই আমরা বেশি দেখতে পাচ্ছি। একদিকে যেমন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়াররূপে ধনবাদী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ জনমতকে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী হানাদারির সপক্ষে প্রভাবিত করার কাজে লাগানো হচ্ছে, তেমনি গরিব দেশগুলোর একাংশের জনমতকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসারও কৌশলী কার্যক্রম চলছে।

৪.

বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক কৌশল হচ্ছে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর পুঁজির বাজারকে বিশ্বব্যাপি প্রসারিত করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিশাল বাজার দখলের মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগ তথা পণ্য বিক্রয়ের বিশ্বায়নের মাধ্যমে ধনতন্ত্রকে মজবুত করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য সাধন করতে হলে আগের মতোই গরিব দেশগুলোর বিশাল আর সস্তা শ্রমশক্তি এবং কাঁচামালের ওপর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ দখলদারি প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ধনবাদী দেশগুলোর দ্বারা এভাবে বিশ্বের পণ্যের বাজার, শ্রমশক্তি ও কাঁচামালের ওপর আধিপত্য আরোপ করে বিশ্বময় পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য সারা পৃথিবী থেকে কমিউনিজমের পর সবরকমের ইসলামী আদর্শ ও আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার গালভরা নাম হচ্ছে এখন বিশ্বায়ন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার জন্য আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সারা দুনিয়ায় তথাকথিত মুক্তবাণিজ্য বা ফ্রি ট্রেডের ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। আর এ কাজে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ ও ডব্লিউটিওর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে

www.pathagar.com

ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে। এই ফ্রি ট্রেডের শর্তগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর স্বার্থের অনুকূলে এবং একই সঙ্গে গরিব দেশগুলোর স্বার্থের প্রতিকূলে। এই শর্তগুলোর মোদ্দাকথা হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামোকে সংস্কার করে সেখানে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আলগা করে দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানার মনোপলির আড়ালে ধনতন্ত্রের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করা। আবার অন্যদিকে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ওপর থেকে সব রকমের বাধা-নিষেধ তুলে দিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কাছে দেশের বাজারকে উন্মুক্ত করা।

এইভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে সুরক্ষিত করার জন্য আমদানি-রপ্তানির ওপর সব শুল্ক তুলে দিতে হবে এবং নিরংকুশ প্রতিযোগিতার জন্য সব রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে সব রকম ভর্তুকি তুলে দিতে হবে। ফল হবে ধনবাদী দেশগুলোর পণ্যে তৃতীয় দুনিয়ার বাজার ছেয়ে যাবে এবং স্থানীয় পণ্য মার খাবে।

অথচ ধনবাদী দেশগুলো নিজেদের অবস্থানকে একটুও ছাড়তে রাজি নয়। গরিব দেশগুলোর ওপর ডব্লিউটিওর মাধ্যমে নানা রকম অবৈধ শর্ত বলবৎ করা হলেও নিজেদের দেশে কিন্তু সব পণ্যের ওপর সরকারি ভর্তুকি যেমন তুলে নিচ্ছে না তেমনি শুল্ক বহির্ভূত নানা প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে গরিব দেশগুলো থেকে পণ্য আমদানিতে বাধা সৃষ্টি করছে। তথাকথিত ফ্রি ট্রেডের আর একটা বৈষম্যমূলক দিক হলো পুঁজি ও পণ্যের অবাধ আন্তর্জাতিক বিচরণের শর্ত থাকলেও শ্রমশক্তির অবাধ বিচরণের অনুমতি নেই। ধনবাদী দেশগুলো পুঁজিতে শক্তিমান, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো শ্রমশক্তিতে শক্তিমান। পুঁজি ও পণ্যের মতো শ্রমশক্তির অবাধ যাতায়াত সম্ভব হলে পৃথিবীতে ফ্রি ট্রেডের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমে আসতো আর তৃতীয় দুনিয়ার সত্যিকার অর্থনৈতিক অগ্রগতি হতে পারতো। কিন্তু ধনবাদী দেশগুলো তাতে রাজি নয়। পুঁজি ও পণ্যের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছাড়তে তারা এতোটুকুও প্রস্তুত নয়। সুতরাং এ ধরনের বৈষম্যনীতির মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের তথাকথিত ফ্রি ট্রেডের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে, এই অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন কোনোভাবেই অপশ্চিমা দেশগুলোর স্বার্থানুকূল নয়। এর ফলে ধনবাদী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য আরও বৃদ্ধি পাবে,

www.pathagar.com

গরিব দেশগুলোর পণ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে, শিল্প কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকারের সংখ্যা দিন দিনই বাড়বে। তবে কিছু আর্থিক উন্নতি হবে না এমন নয়। কিন্তু সেই উন্নতির সিংহভাগই চলে যাবে দেশীয় ধনপতি শ্রেণীর হাতে যারা কিনা আরও মুনাফার আশায় পশ্চিমের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্রেফ তল্পিবাহকে পরিণত হচ্ছে এবং ধনতন্ত্রের অন্তহীন ভোগবাদে আকৃষ্ট হয়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নকে নিজের বলে আপন করে নিচ্ছে। শেষ বিচারে তাই সমস্যাটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার তাবৎ মুক্তিকামী মানুষের লড়াইয়ে পরিণত হচ্ছে।

৫.

ইরাক, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে মার্কিন হানাদারি এবং ইরান, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশকে একতরফা আমেরিকার সামরিক হুমকি-ধমকি থেকে এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে, আমেরিকা আজ বিশ্বায়নের আড়ালে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তরকালেও ন্যাটো সামরিক জোট শুধু আগের মতোই নেই। তার পরিধিও বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু কার স্বার্থে?

প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যেই রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা। ঠাণ্ডা যুদ্ধের আগেও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়াকে গ্রাস করেছিল। সেই প্রবণতা আজও বহাল তবিয়তে আছে। ১৯৯১ সালে একবার এবং আরেকবার ২০০৩ সালে মার্কিন নেতৃত্বে কয়েকটি ন্যাটোভুক্ত দেশ সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে এবং জাতিসংঘকে রীতিমতো বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইরাক আক্রমণ করে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে এবং এই প্রাচীন দেশটির সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। এখনও সে দেশে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি ও দখলদারি যুগপৎ বহাল আছে। এই অন্যায় আগ্রাসনের মূল কারণগুলো হচ্ছে : ইসলামের প্রতি পশ্চিমের খ্রিস্টীয় সভ্যতার জাত-বিদ্বেষ, সেখানকার তেলসম্পদ দখল, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সাগরেদ ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পশ্চিমের সমরাস্ত্র ব্যবসায়ীদের মুনাফার সুযোগ বৃদ্ধি, ইরাক পুনর্নির্মাণের নামে পশ্চিমের বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফার সুযোগ করে দেয়া প্রভৃতি। একইভাবে ২০০১ সালে সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট অবৈধ আগ্রাসন চালায় এবং দেশটিকে দোজখে পরিণত করে। আজকের একমেরু বিশ্বে ঔপনিবেশিক আমলের মতো ধনতন্ত্রের

www.pathagar.com

সামরিক বিশ্বায়ন আবার স্বরূপে ধেয়ে চলেছে। আর এ কারণে আমেরিকা ঘোষণা দিয়েছে, নিজ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সন্দেহে বিনা প্ররোচনায় পৃথিবীর যে কোন দেশকে সে আক্রমণ করার অধিকার রাখে। এমনকি পারমাণবিক আঘাত হানারও। এজন্য তার জাতিসংঘেরও অনুমতি নেয়ার দরকার নেই। নেই আন্তর্জাতিক কোনো আইন তোয়াক্কা করার। এর চেয়ে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী হানাদারির নমুনা আর কী হতে পারে?

৬.

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সুযোগ নিয়ে পাশ্চাত্যের ধনবাদী গোষ্ঠী দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে এক ধনতান্ত্রিক ভোগবাদী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় নেমে পড়েছে। ধনবাদী গোষ্ঠী ও বহুজাতিক কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত প্রচার মাধ্যমগুলোর সহায়তায় নিজ দেশের জনগণের মধ্যে ভোগবাদী, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী ও রাজনীতিবিমুখ সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে অপশ্চিমা দেশগুলোতে ধনতান্ত্রিক অপসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। বহির্বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হচ্ছে সেদেশের জনগণের কাছে নিজেদের সংস্কৃতিকে গ্রহণীয় করে তোলা। এই কৌশলকে সামনে রেখেই ধনবাদী দেশগুলো তাদের সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেট, টিভি, সিনেমা, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমকে অনবরত ব্যবহার করে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা ধনবাদী গোষ্ঠী অপশ্চিমা দেশের জনগণকে ধনতন্ত্রের বাজার সংস্কৃতির মধ্যে টেনে নিয়ে ধনতন্ত্রের সমর্থক হতে উৎসাহিত করছে। মানুষ তার মেধা, নান্দনিক বোধ-বুদ্ধি এমনকি সে নিজেও একটি বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্য আর পৃথিবীর এই পণ্য বাজারে আদর্শ নিরপেক্ষ ভোগবাদের মাধ্যমে বস্তু জগতে সীমাহীন আত্মসর্বস্ব উন্নতি লাভই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—এই বিকৃত সাংস্কৃতিক তত্ত্বই বিশ্বায়নের কারবারিরা ছড়িয়ে চলেছে। এই প্রচার-প্রচারণার ফলে অপশ্চিমা দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো মুসলিম দেশের জনগণের একাংশ আদর্শবিমুখ ভোগবাদে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সবরকম রাজনৈতিক, দেশপ্রেমমূলক চিন্তা-ভাবনা এবং দেশ-বিদেশের মানবিক পরিস্থিতির প্রতি সংবেদনশীলতাকে ছুড়ে ফেলে দিশাহীন, উন্মত্ত ভোগ ও বিনোদনকে

www.pathagar.com

তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ধারক-বাহক করে তুলেছে। পাশাপাশি বিশ্বায়নের ধাক্কায় আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক ব্যবস্থা ও নৈতিক বিবেচনা রীতিমতো বিপন্ন হয়ে উঠেছে। ধনবাদী সংস্কৃতির প্রভাবেই হচ্ছে ভোগবাদী মানুষ নিজের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা-সমৃদ্ধি ছাড়া দেশ-সমাজের কথা একটুও ভাবে না। দেশ-বিদেশের দারিদ্র্য অসাম্য-অবিচারের মতো হাজারও কলুষ যা আমাদের নিত্য ঘিরে রেখেছে তার ব্যাপারে ভোগবাদী মানুষ উদাসীন ও সম্পূর্ণ বিবেচনাহীন। তাই সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন আক্রমণে ইরাক ও আফগানিস্তানের মতো দুটো দেশ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এদেশের মানুষের মনে মার্কিনপ্রীতি একটুও টলেনি। এমনকি সে দেশে পাড়ি দেবার জন্য মানুষের লাইন প্রতিনিয়ত দীর্ঘতর হচ্ছে। আর এভাবেই পশ্চিমের ধনবাদী গোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যমে আমাদের মতো দেশগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করছে এবং গুণগ্রাহী ও স্তাবকদের মাধ্যমে কলোনির নতুন এক রূপ প্রতিষ্ঠা করে চলেছে।

৭.

আজকের যে বিশ্ব ব্যবস্থা তা কার্যত আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমের ধনবাদী দেশগুলো নিজেদের মতো করে পরিচালনা করছে। এর ফলে এসব রাষ্ট্রের আধিপত্যের কারণে এক অসম আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাঠামো গড়ে উঠেছে। এক সময় লীগ অব নেশনসের সনদে অধিপতি রাষ্ট্রগুলোর কোনো ভিটো ব্যবস্থা ছিল না। তাই জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে কোনো শক্তিধর রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে বিদেশনীতি রূপায়ণের পথে প্রতিবন্ধকতা ছিল। আর এ কারণেই সে সময় আমেরিকা লীগ অব নেশনসে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। আমেরিকা তখন ভেবেছিল, সামরিক ও আর্থিক শক্তির জোরে জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে পৃথিবীতে সে আধিপত্য বিস্তার করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা আরও শক্তিশালী হয়ে যায়। তখন আমেরিকা আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরিপূরক ভিটো ব্যবস্থা জাতিসংঘ সনদে অন্তর্ভুক্ত করে তবে জাতিসংঘে যোগ দেয়। তখন থেকেই আমেরিকা জাতিসংঘকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং তার সাম্রাজ্যবাদী বিদেশনীতির সপক্ষে জাতিসংঘকে দিয়ে প্রস্তাব পাস করিয়ে

www.pathagar.com

নিচ্ছে। ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সম্পর্ক, আফগানিস্তান-ইরান-ইরাক-উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি বহুক্ষেত্রে জাতিসংঘ কার্যত আমেরিকার একটি আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য, জাতিসংঘের এই পরিণতি সাম্রাজ্যবাদের অপকীর্তিরই নমুনা মাত্র।

৮.

মানবজাতির সাম্য-মৈত্রী-ঐক্য-সমৃদ্ধির জন্য যে বিশ্বায়ন তাকে অবশ্যই স্বাগত জানানো উচিত। আর সেই লক্ষ্যে বিশ্বময় দ্রুত শিল্পায়ন, প্রাযুক্তিক অগ্রগতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সবার কাছেই কাম্য। কিন্তু বিশ্বায়নের নামে পশ্চিমা সংস্কৃতি, ধনতান্ত্রিক মতাদর্শ ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থা অপশ্চিমা দুনিয়ায় বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় যেভাবে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে তাকে কোনোমতেই প্রকৃত বিশ্বায়ন বলা চলে না। আজ দুনিয়া জুড়ে ইনসাফের বিশ্বায়ন, শোষণমুক্তির বিশ্বায়ন প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন বিশ্ব মানবের মঙ্গল সাধন না করে মূলত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ধনবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থ চরিতার্থ করছে। অপশ্চিমা দুনিয়ার কোটি কোটি দরিদ্র কাতর মানুষের জন্য এ বিশ্বায়ন কোন শুভ বার্তা নিয়ে আসেনি। এ কারণেই বিশ্বময় আজ বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যেহেতু বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদের নতুন চেহারা নিয়ে এসেছে এবং ধনবাদী পশ্চিমা সভ্যতার অমোঘ পরিণতিতেই এটি মাথা তুলেছে, সুতরাং পশ্চিমের নেতৃত্বে আজকের ধনতন্ত্রী বিশ্বব্যবস্থা বদলে ফেলা ছাড়া মানবজাতির আর কোনো বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যে সারা দুনিয়ার মজলুম মানুষের ঐক্যবদ্ধ দুর্জয় প্রতিরোধই একালে বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী অভিযানকে স্তিমিত করে দিতে পারে। এ কারণে মজলুম মানুষের সেই ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে বিকল্প মতাদর্শ চাই। কমিউনিজমের পতনের পর ধনবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে মোকাবিলা করার জন্য ইসলামই একমাত্র মতাদর্শ। এই মতাদর্শের ভিত্তিতেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযানকে এগিয়ে নিতে হবে। ওই একই আদর্শের ভিত্তিতে দেশে দেশে আদল, ইহসান ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার এক মহাসংগ্রাম শুরু করতে হবে, যাতে মানবজাতির সত্যিকার বিশ্বায়ন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

www.pathagar.com

কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদ

১.

সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন ও আগ্রাসী রূপের নাম হচ্ছে কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদের পরিচালক হচ্ছে বড় বড় কর্পোরেশন, ব্যাংক ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের চরিত্র হচ্ছে আন্তর্জাতিক। কারণ দুনিয়াজোড়া এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। এজন্য এদের বহুজাতিক কোম্পানি বলা হয়ে থাকে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একের অধিক দেশে ব্যবসা করে। নিজেদের উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করে এবং বিভিন্ন দেশে অফিস, শাখা ও কারখানা গড়ে তোলে। কিন্তু এর সদর দফতর থাকে উদ্যোক্তাদের নিজ দেশে। সেখান থেকেই সব কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কোম্পানিগুলোর আর্থিক বুনিয়াদ এতই শক্তিশালী হয় যে এর বার্ষিক বাজেট কোনো কোনো গরিব দেশের বার্ষিক বাজেটের চেয়েও বেশি। এ কারণে এরা এত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, রাজনীতি ও সম্পর্ককেও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। কোনো কোনো দেশের বহুজাতিক কোম্পানির মালিক-পরিচালকরা এতই শক্তিশালী যে, এরা দেশটির রাজনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের লোকজনই ক্ষমতাসীন হয় এবং তাদেরই স্বার্থে রাষ্ট্রের নীতি পরিচালিত হয়। এর বড় উদাহরণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় দলের নেতা ও নীতিনির্ধারকদের অনেকেই বড় বড় কর্পোরেশনের মালিক, পরিচালক কিংবা উদ্যোক্তা।

আমাদের মতো গরিব দেশগুলো এসব বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগের জন্য পথ চেয়ে থাকে। কারণ তারা মনে করে, এই বিনিয়োগের ফলে দেশে নতুন পুঁজি তৈরি হবে, বিপুল মানুষের চাকরির সংস্থান হবে, নতুন উৎপাদন কৌশল ও অধিকতর ভালো পণ্য দেশেই পাওয়া যাবে। এটি ঘটনার আংশিক চিত্র, যা দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো গরিব দেশের মানুষের চোখের সামনে একটা পর্দা ঝুলিয়ে দেয়। এই পর্দার অন্তরালে বহুজাতিকরা গরিব দেশগুলোকে ছিবড়ে খায়। তার নাগরিকদের প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য অধিকার থেকে

www.pathagar.com

বঞ্চিত করে। গরিব দেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামালকে ব্যবহার করে বিপুল অংকের অর্থনৈতিক লাভ করে, যা পাচার হয়ে যায় উদ্যোক্তাদের দেশে। বহুজাতিকদের এই বিপুল লাভ ও লোভের খেসারত দিতে গিয়ে গরিব দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। বহুজাতিক কোম্পানি কতদূর হিংস্র ও ভয়ানক হতে পারে তা বোধ হয় আমাদের চেয়ে কারও ভালো জানার কথা নয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে এদেশে বাণিজ্য করতে এসে নিজেদের তুলাদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করেছিল, সে তো বহুচর্চিত ইতিহাস। সুতরাং বহুজাতিকরা শুধু বাণিজ্য করতেই আসে না, বাণিজ্যের আড়ালে তারা দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণও নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গটি যেহেতু অর্থনীতির চর্চার সূত্র ধরে আসে তাই সরাসরি রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় কিংবা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে এর চেহারা একটু ভিন্ন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য অভিন্ন। এই সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি শাসন ক্ষমতা দখল করে না বটে, কিন্তু পৃথিবীর সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি অংশ অন্যদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দখল করে নেয়। এর মূল হচ্ছে লাভ ও লোভ। আমার চাহিদা মেটানোর জন্য সবকিছুই বৈধ–এই হচ্ছে কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শ। আর এই সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য যত রকমের কৌশল আছে–কূটনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক–সবকিছুই একে একে ব্যবহার করা হয়। এখানে সরাসরি মানুষ গুলি খেয়ে মরে না। মরে ধীরে ধীরে অনাহারে, অপুষ্টিতে, সহজেই প্রতিরোধ করা যায় এমন রোগের ওষুধ না পেয়ে, তেজস্ক্রিয়তায় অথবা দূষণের বিষে।

২.

কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদের কাজকর্ম ও ফলাফল নিয়ে অনেক আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে। বিশেষ করে বহুজাতিকের দুনিয়াজোড়া কুকীর্তি এখন অনেকের কাছেই পরিষ্কার। কিন্তু এর কাজের ধরন ও কৌশল এত ভয়ানক যে তার কাহিনী সবিস্তারে পাওয়া সম্ভব নয়। এমনি এক গা হিম করা কাহিনী লিখেছেন বহুজাতিকের এক সময়কার নির্ভরযোগ্য এজেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন পারকিনস। পারকিনস শেষ পর্যন্ত বিবেকের

www.pathagar.com

তাড়নায় তার অপকর্মের স্বীকারোক্তি করেছেন Confessions of an Economic Hit Man নামের একটি বই লিখে। এই বই এখন বেস্ট সেলার। বইটির মুখবন্ধে পারকিনস লিখেছেন : ইকোনমিক হিটম্যানরা হলো সুবিশাল বেতনভোগী পেশাদার, যারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশ থেকে শত-সহস্র কোটি ডলার নিংড়ে নেয়। তারা বিশ্বব্যাংক, ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) আর অন্য দেশের সরকারি 'দাতব্য' সংস্থা থেকে অতি বৃহৎ বাণিজ্যিক আর মুষ্টিমেয় কয়েকটা পরিবারের (যারা এই গ্রহের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে) পকেটে টাকা সরাতে সাহায্য করে। জাল আর্থিক রিপোর্ট, নির্বাচনী কারচুপি, ঘুষ, তোলাবাজি, সেক্স আর খুন হলো তাদের হাতিয়ার। প্রাচীন সাম্রাজ্যের যুগের মতোই একটা ভূমিকা তারা পালন করে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে এটা আরও মারাত্মক আকার নিয়েছে। আমার এসব ভালোই জানা। কারণ আমি নিজে যে ইকোনমিক হিটম্যান ছিলাম।

পারকিনস আরও দুটি বই লিখেছেন। একটি হচ্ছে The Secret History of the American Empire, অপরটি Hoodwinked. এখানেও তিনি কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

১৯৮২ সালের দিকে প্রথম স্বীকারোক্তি লিখতে শুরু করেন পারকিনস। এর আগে বহুজাতিক থেকে তিনি স্বেচ্ছায় বিদায় নেন। চার-চারবার তাকে ঘুষ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে লেখা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়। ২০০৪ সালে শেষ পর্যন্ত বইটি প্রকাশিত হয়। আত্মঘাতী সন্ত্রাসীদের মতো ইকোনমিক হিটম্যানদের ট্রেনিংয়ের অঙ্গ হচ্ছে নিজের কাজকর্ম নিয়ে এমনকি স্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করা যাবে না।

পৃথিবীর পাঁচ-ছয়টি দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বড় মার্কিন কোম্পানির ক্রীতদাসে পরিণত করার কাজে পারকিনসের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। ১৯৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পানামা আক্রমণ, ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক-রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, নাইন-ইলেভেনের ঘটনা–এসবের পেছনে যে বিশ্বের গুটিকতক কর্পোরেশনের ক্ষমতার দাবাখেলা, আর বাকি শত-কোটি মানুষ মূক ও বধির–এ বইটি থেকে তা স্পষ্ট বেরিয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

সাধারণত ইকোনমিক হিটম্যানদের কাজ হলো পুঁজিবাদের অধিপতি বহুজাতিকের পক্ষে জাল তথ্য ও প্রতিবেদন তৈরি করে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি প্রভৃতি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন গরিব দেশের জন্য ঋণ সুবিধা করিয়ে দেয়া। এভাবে পারকিনস ও তার সহযোগী ইকোনমিক হিটম্যানরা দুনিয়াজুড়ে বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলার জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত। এরা বিশ্বব্যাংক ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে এমনভাবে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে যেখানে দেখানো হয়, গরিব দেশের জনগণ এতে ভয়ানক উপকৃত হবে এবং দেশটির অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটবে। আসলে তা গুটিকয়েক ধনী ব্যক্তিকে আরও সমৃদ্ধিশালী করে মাত্র। এক্ষেত্রে ইকোনমিক হিটম্যানরা এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ গরিব দেশকে চিহ্নিত করে যা কিনা বহুজাতিকের কাছে খুবই প্রিয় বিষয়। হিটম্যানরা এসব দেশের জন্য বিশ্বব্যাংকের ঋণ সুবিধা করিয়ে দেয় এবং ঋণের অধিকাংশ টাকা চলে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রকৌশল ও নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত বহুজাতিকের কাছে। আর কিছু সুবিধা যায় ঋণগ্রস্ত দেশটির কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির পকেটে, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা বহুজাতিকের দেশীয় দালাল ছাড়া কিছু নয়। এরাই ঋণগ্রস্ত দেশটিতে হিটম্যানদের জাল ফেলার সুযোগ করে দেয়। অবকাঠামো উন্নয়নের নামে বহুজাতিকরা ঋণের টাকায় এসব দেশে বৈদ্যুতিক প্রকল্প, বড় বড় বাঁধ, বিমানবন্দর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলে। আখেরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দূরে থাক, এগুলো অনুৎপাদনশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়। গরিব মানুষ শেষ পর্যন্ত বিমানবন্দর, ইলেকট্রিক গ্রিডের সুবিধা পায় না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কেও তাদের যথাযথ চাকরি জোটে না। শেষ পর্যন্ত ঋণের ভারে এসব দেশ জর্জরিত হয়ে পড়ে, ঋণ শোধ করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে হিটম্যানরা এসব দেশের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়। তাদের কাছে শেক্সপিয়রের শাইলক ইহুদির মতো Pound of flesh দাবি করে বসে : সস্তায় তেল, জাতিসংঘে মার্কিনিদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভোট, সৈন্য দিয়ে মার্কিনিদের সহযোগিতা–যেমন ইরাক।

পারকিনস একটা জরুরি কথা বলেছেন। বিশ্বব্যাংক কার্যত বিশ্বব্যাংক নয়, এটা হচ্ছে U.S. Bank। যুক্তরাষ্ট্রই মূলত বিশ্বব্যাংককে চালায়। এর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিতে পারে। এর প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

নির্বাচিত করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। এভাবে রবার্ট ম্যাকনামারা ও উলফ উইটজের মতো মার্কিন প্রশাসনের স্বীকৃত সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কিন সমর্থনেই বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হন। একসময় বিশ্বব্যাংকের কাজ ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কমিউনিজমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা। এখন কাজ হচ্ছে সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বের আড়ালে যাবতীয় ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে সাহায্য করা। বইটির প্রথম যে খসড়া পারকিনস করেছিলেন, তা তিনি তার দুই 'ক্লায়েন্ট' ইকুয়েডরের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইমে রোল্ডোস এবং পানামার সাবেক প্রেসিডেন্ট ওমার তোরিহোসকে উৎসর্গ করেছিলেন। দুজনের সঙ্গেই পারকিনসের একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত পেশাদার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দুজনই বিমান 'দুর্ঘটনায়' মারা যান। দুটি বিমানেই আগুন লেগে গিয়েছিল। পারকিনস লিখেছেন : ওদের মৃত্যু দুর্ঘটনা নয়, ওদের খুন করা হয়েছিল। কারণ বিশাল কোম্পানি, ব্যাংক আর সরকার একযোগে যে বিশ্বব্যাপি সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে, তাতে তারা বাধা দিয়েছিলেন। আমরা চলে আসার পর অন্য যে হিটম্যানরা মঞ্চে ঢোকে, সেই সিআইএ'র শৃগালরাই ওদের মেরেছে। ওমারের অপরাধ ছিল তিনি পানামা খালের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করেননি। রোল্ডোসের অপরাধ ছিল তিনি তার দেশে বহুজাতিকের ক্ষুধা মেটাতে রাজি হননি। ওমারের একটা প্রিয় বচন ছিল এরকম : The missile is not invented that can kill an idea!

সিআইএ এই ঔদ্ধত্য সহ্য করবে কী করে? পারকিনস লিখেছেন–গুয়াতেমালার আরবেনজ, চিলির আলেন্দে এবং ইরানের মোসাদ্দেকের পরিণতিও তাই হয়েছিল। কারণ তারা বহুজাতিকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হননি। এই বহুজাতিকের সমর্থনেই সিআইএ এসব দেশে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের হত্যা করে নিজেদের পুতুলকে বসিয়ে দেয়, যাতে বহুজাতিক তথা মার্কিনিদের স্বার্থ পুরোদস্তুর রক্ষা পায়। এই রেজিম চেঞ্জের ব্যাপারটা আজও অব্যাহত আছে। যেমন–আফগানিস্তান ও ইরাক। এখানেও তেল-গ্যাসের স্বার্থ, বহুজাতিকের দাপাদাপি, বুশ-লাদেনের মুখোমুখি অবস্থান একাকার হয়ে আছে। আফগান মুজাহিদিনদের সঙ্গে মার্কিন শাসককুলের এক সময়কার

www.pathagar.com

সম্পর্ক, প্রেসিডেন্ট রিগান কর্তৃক মুজাহিদিনদের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মার্কিন প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের সঙ্গে তুলনা, বুশ পরিবারের সঙ্গে সৌদি রাজপরিবারের হৃদ্যতার সম্পর্ক এখন বহুল আলোচিত বিষয়। মার্কিন বহুজাতিক ইউনিকল, হ্যালিবারটন, এনরন, বেকটেল, ব্রাউন অ্যান্ড রুট, স্টোন অ্যান্ড ওয়েব স্টার প্রভৃতির প্রচ্ছন্ন অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু আজকের পৃথিবীর সঙ্কটের অন্যতম উৎস ইরাক, আফগানিস্তানের পেছনে দাহ্য পদার্থের কাজ করছে সন্দেহ নেই।

সদ্য বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পিতা প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়কার প্রেসিডেন্ট জর্জ হারবার্ট ডব্লিউ বুশ ১৯৭১ থেকে '৭৩ রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে সিআইএ প্রধান ছিলেন। ১৯৭৪ সাল থেকে সৌদি রাজপরিবার কিভাবে ধারাবাহিকভাবে তেল-রাজস্বের টাকা চুরি করে বিদেশে সরাতে শুরু করে এবং কিভাবে তা হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ পারকিনসের বইতে আছে।

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় সৌদিরা তেল অবরোধ দিয়ে মার্কিনিদের কুপোকাত করে দেয়। তারপর থেকেই মার্কিনিরা সৌদি রাজপরিবারকে পুরোমাত্রায় কবজা করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। তাদের যেমন সৌদি তেল প্রয়োজন, তেমনি রাজপরিবারকেও করায়ত্ত রাখা দরকার। অতএব পারকিনসের মতো হিটম্যানরা ঝাঁকে ঝাঁকে সৌদি আরবে ঢুকে পড়ে। তারা সৌদি শাসককুলকে বোঝাতে শুরু করে কিভাবে তারা এই 'মধ্যযুগীয়' দেশটিকে 'আধুনিক' যুগে নিয়ে আসতে চায়। অবকাঠামো উন্নয়নের নামে সৌদি পেট্রোডলার হাতিয়ে নেয়াই ছিল এর আশু লক্ষ্য। কিন্তু এর সুদূরবর্তী লক্ষ্য ছিল অন্যরকম। পারকিনস লিখেছেন : In the process Saudi Arabia would be drawn in, its economy would become increasingly intertwined with and dependent upon ours, and presumably it would grow more westernized and therefore more sympathetic with and integrated into our system.

এভাবে সৌদি আরবের 'আধুনিকায়ন' শুরু হলো। বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী মোহাম্মদ আসাদ তার মক্কার পথ বইয়ে সৌদি বেদুইনদের যে

www.pathagar.com

দিলখোলা, অনাড়ম্বর, স্বাধীন, শির উন্নত অথচ মাধুর্যময় বর্ণনা দিয়েছেন; তার সঙ্গে আজকের সৌদিদের কোনো মিল নেই। এয়ারপোর্ট, পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্কাই স্ক্রাপার, ডি-স্যালাইনেশন প্ল্যান্ট, হরেক রকমের বিলাসবহুল ভোগ্যপণ্য সৌদিদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে। পারকিনস লিখেছেন :

For Saudi Arabia, the additional oil income resulting from the price hikes was a mixed blessing. It filled the national coffers with billions of dollars; however, it also served to undermine some of the strict religious beliefs of the Wahhabis. Wealthy Saudis traveled round the world. They attended schools and universities in Europe and the United States. They bought fancy cars and furnished their houses with Western-style goods. Conservative religious beliefs were replaced by a new form of materialism – it was this materialism that presented a solution to fears of future oil crisis.

এই ভোগবাদী শেখরাই আজ মার্কিনিদের তেলের স্বার্থ রক্ষা করছে, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রে সৌদি রাজপরিবারকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। গণতন্ত্রের বিবেক বলে পরিচিত আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রটির কাছে সৌদি রাজতন্ত্র কেন এত প্রিয় তা আর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আর আমাদেরও বুঝতে বাকি নেই, হারামাইন শরিফের খাদেমদের নৈতিক অবক্ষয় কোন তলানিতে এসে ঠেকেছে।

হিটম্যান হিসেবে পারকিনস সৌদি রাজপরিবারের সঙ্গে মার্কিন শাসককুলের গাঁটছড়া বাঁধতে যেসব স্তর অতিক্রম করেছেন তার জীবন্ত বর্ণনা আছে এ বইয়ে। কিভাবে পারকিনস এক ভোগবাদী সৌদি প্রিন্সের মাধ্যমে এই কার্য সম্পাদন করেছিলেন, তারও বর্ণনা আছে এই বইয়ে। পারকিনস লিখেছেন, এই প্রিন্সই তাকে 'ঐতিহাসিক চুক্তি' সম্পাদনে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

পারকিনস কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদের এই মিশনকে ক্রুসেডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মধ্যযুগের ক্রুসেডের সঙ্গে আজকের এই ক্রুসেডের তফাৎ হচ্ছে মাত্রা ও কৌশলের, লক্ষ্য অভিন্ন। মধ্যযুগের ক্রুসেডের সময় ইউরোপীয় ক্যাথলিকরা দাবি করেছিল তারা মুসলমানদের 'শুদ্ধ' করতে চায়। কর্পোরেটোক্র্যাসি দাবি করছে, তারা সৌদিদের আধুনিক হিসেবে গড়ে তুলছে। ক্রুসেডার ও কর্পোরেটোক্র্যাট উভয়ই সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশ্বাসী।

পারকিনস তার বইয়ে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে ভ্যানিটি ফেয়ার পত্রিকায় 'Saving the Saudis' শিরোনামে একটি তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছিল : আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবারগুলোর মধ্যে অন্যতম দুটি বুশ পরিবার এবং সৌদি রাজপরিবারের মধ্যে ২০ বছরের বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পরস্পরের ব্যবসাগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে এরা উভয়েই বার বার এগিয়ে এসেছেন। নাইন-ইলেভেনের কয়েকদিনের মধ্যেই প্রভূত বিত্তশালী বেশকিছু সৌদি আরবীয়কে গোপনে ব্যক্তিগত বিমানে করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে বিন লাদেন পরিবারের লোকজনও ছিলেন। কোনো কর্তৃপক্ষ এই উড়ানগুলোর কথা স্বীকার করে না। যাত্রীদের দেশ ছাড়ার আগে কেউ জিজ্ঞাসাবাদও করেনি। বুশ পরিবারের সঙ্গে সৌদিদের দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলেই কি এটা হতে পেরেছিল?

এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পারকিনসের বক্তব্য, তথ্যগুলোতে তিনি বিস্মিত হননি। এ সবই তার জানা। তিনি অবাক হয়েছিলেন সত্যটা অবশেষে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে বলে। ইবনে সৌদ পরিবারকে এক সময় ক্ষমতায় এনেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এখন এটিকে লালন করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তামাম দুনিয়ার ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আজকের পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের যে লড়াই চলছে, সেই মেরুকরণে এদের ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে পশ্চিমাদের পক্ষে। আজকের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে সৌদি রাজপরিবারের এই অবস্থানকে ভালোভাবে চিহ্নিত করা দরকার।

www.pathagar.com

৩.

পারকিনস আমাদের কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদের যে হিংস্র চেহারা, তার কাহিনী সবিস্তারে বলেছেন। তার ভাষায় এ কহিনী হচ্ছে : ... a tragic story of debt, deception, enslavement, exploitation, and the most blatant grab in history for the hearts, minds, souls, and resources of people around the world.

পারকিনস নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত। গভীর অনুতাপ থেকে যে অশ্রু তিনি ঝরিয়েছেন তাকে আমরা মূল্য না দিয়ে পারি না। পারকিনস এই কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করার কথা ভেবেছেন। এই বইয়ে তিনি তার কিছু উপায়ের কথাও উল্লেখ করেছেন, সেগুলো ভাবার মতো বিষয়। তিনি লিখেছেন–ব্যাংক, বহুজাতিক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে এর পরিচালকদের চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে। ক্যাপিটালিজম যে নিয়ন্ত্রণহীন ভোগবাদের জন্ম দিয়েছে, সেই ভোগের জন্য বিশ্বব্যাপি শোষণের যে দুয়ার ক্যাপিটালিস্টরা খুলে দিয়েছেন এবং তারই ফলে দুনিয়াজুড়ে অনাহার, অপুষ্টি, দারিদ্র্যে মানুষের জীবন শেষ হচ্ছে–তার অবসান হওয়া জরুরি। এর জন্য দরকার পারকিনসের ভাষায় : We need a revolution in our approach to education, to empower ourselves and our children to think, to question, and to dare to act.

পারকিনস প্রশ্ন করেছেন, যদি এমন হতো নাইক শুজ, ম্যাকডোনাল্ড, কোকো-কোলার মতো কোম্পানি উচ্চ লাভের পরিবর্তে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেয়ার এবং অন্নহীনকে অন্ন দেয়ার একটা প্রোগ্রাম চালু করত। এটা কি পারকিনসের একটা স্বপ্ন অথবা ইউটোপিয়া? পারকিনস লিখেছেন, এটা সম্ভব যদি আমরা আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারি; সীমাহীন কনজুমারিজমকে আমরা পরাস্ত করতে পারি। পারকিনসকে ধন্যবাদ এমন একটা বই উপহার দেয়ার জন্য, যা কিনা পৃথিবীর অসংখ্য নর-নারীর চোখ খুলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি– এই তিনটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৃতীয় দুনিয়ার দরিদ্র দেশগুলোতে নানা রকম শর্তে ঋণ প্রদান করে এবং এরা এসব দেশের বিভিন্ন উন্নয়ননীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। আইএমএফ ও এডিবি হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের কর্মকাণ্ড পৃথিবীব্যাপি বিস্তৃত অন্যদিকে এডিবির কর্মকাণ্ড এশিয়ার মধ্যে সীমিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৪ সালে বিখ্যাত ব্রিটন উডস কনফারেন্সে তখনকার পরাশক্তিসমূহের যৌথ সম্মতিক্রমে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ আত্মপ্রকাশ করে। তবে শক্তিমান যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সক্রিয় উদ্যোগেই সেদিন প্রতিষ্ঠান দুটির জন্ম তা একভাবে বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্ব পুঁজিবাদের পাহারাদার রাষ্ট্রগুলো এসব প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয় যাতে বিশ্ব পুঁজির আধিপত্যের কাঠোমোটি তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এসব সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও পরিচালনায় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও আমলা নির্ভর। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এসব সংস্থার সদস্য হলেও পরিচালনা কাঠামোর ধরনই এই যে, যুক্তরাষ্ট্রসহ ক্ষমতাশালী কতিপয় রাষ্ট্র এটির মূল নিয়ন্ত্রক। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট সব সময়ই একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নির্বাচিত হন এবং এটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আছে ভেটো ক্ষমতা। অন্যদিকে আইএমএফের প্রধান হন একজন ইউরোপীয়। দুটি সংস্থার সদর দফতরই ওয়াশিংটনে। শেষ বিচারে পশ্চিমা স্বার্থকে দেখভাল করাই এসব সংস্থার আরাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ফ্রান্স হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের প্রথম ঋণগ্রহিতা দেশ। ঋণপ্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ফ্রান্সের তৎকালীন সরকারের ভিতর থেকে বামপন্থীদের অপসারণের শর্ত জুড়ে দেয়। ফরাসি সরকার সেই শর্ত মেনে নেয়ার সাথে সাথে বিশ্বব্যাংক তা মঞ্জুর করে। অথচ একই সাথে দরখাস্তকারী দেশ পোলান্ড ও চিলি শর্ত না মানায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না। এই হচ্ছে এই সব আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মধারা। প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার এই সব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গরিব দেশগুলোতে সব সময় 'উন্নয়ন', 'দারিদ্র বিমোচন', 'সুশাসন' শব্দগুলো ব্যবহার করে তাদের বিভিন্ন প্রকল্পকে মহিমান্বিত করে তোলে। কিন্তু তাদের মূল এজেন্ডা 'উন্নয়ন', 'দারিদ্র বিমোচন' বা 'সুশাসন' নয়। দেখা যায় তাদের অর্থ সংস্থান পদ্ধতিই এমন যে এর ফলে তৃতীয় দুনিয়ার দারিদ্র আরো স্থায়ী হয়, উন্নয়ন

www.pathagar.com

সম্ভাবনা বিপর্যস্থ হয় এবং বহুজাতিক সংস্থা ও বিশ্বপুঁজির আধিপত্য আরো সক্রিয় হয়। এই সব প্রতারণা ঢাকার জন্য তাদের সকল প্রকল্পের বিস্তারিত শর্ত ও আর্থিক দিকগুলো সব সময় অস্বচ্ছ থাকে। এ সব সংস্থা ঋণ মঞ্জুর করার সময় ক্রমাগতভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কথা বললেও নিজেদের প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও সমঝোতা গোপন রাখার পক্ষে সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য আমলা, মন্ত্রী, বিশেষজ্ঞ ও নীতি নির্ধারকদের বিদেশ সফর, কনসালটেন্সি, অবসর পরবর্তী উচ্চ বেতনে চাকরি ইত্যাদি বন্দোবস্ত রেখে ঘুষ ও দুর্ণীতির এক নতুন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটায়। ঋণের টাকা থেকেই এসব ব্যয়ের ফলে দেশের ঋণের বোঝা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ফলে দেশে দেশে তৈরি হয় দুর্নীতিগ্রস্ত একটি সমর্থক গোষ্ঠী। দুর্নীতিগ্রস্ত করবার মাধ্যমে দেশের মেধা ও মনন কলুষিত হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব সংস্থা প্রত্যক্ষভাবে দুর্নীতিবাজ বিদেশি কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। এই সংস্থাগুলোর মাধ্যমে গরিব দেশগুলো প্রচুর উন্নয়ণ প্রকল্প পায়। আবার এই উন্নয়ন করতে গিয়ে প্রচুর ঋণভার জমা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বহু সংখ্যক কনসালটিং ফার্ম, থিংক ট্যাংক, এনজিওর উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ উপযোগী অনেক বিশেষজ্ঞের জন্ম হয়।

এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত প্রকল্পগুলোর সুবাদে দেশি বিদেশি কনসালটেন্ট, আমলা, এনজিও মালিক, গবেষকদের যথেষ্ট আর্থিক ও বস্তুগত সমৃদ্ধি হয়। কৃষি, শিল্প, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, কনসালটেন্ট এবং কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিত করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রচুর ব্যবসা ও মুনাফা পাওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি না হয়ে উপর্যুপরি অবনতি হতে থাকে। 'বিদেশি সাহায্য', 'টেকনিক্যাল এসিসটেন্স', 'ফিজিবিলিটি স্টাডি', 'রুটিন এডভাইজ' ইত্যাদি এক একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এই সব আর্থিক সংস্থা তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোর সাধারণ সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং জাতীয় সম্পদকে বহুজাতিক পুঁজির দখলে নিয়ে যায়। বিশ্বে এমন একটি দেশের উদাহরণ দেয়া যাবে না যারা দিনের পর দিন এদের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করে নিজ দেশের উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এসব দেশে নেয়া বিশ্বব্যাংকের জ্বালানি প্রকল্পগুলোর কারণে দেশের মানুষের সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং জ্বালানি হয়ে গেছে অধিকতর ব্যয় বহুল। এই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গরিব দেশগুলোর কৃষি, শিল্প, পরিবেশ, পেশা, পানিপ্রবাহ এবং এমনকি তথাকথিত সিভিল সোসাইটির

www.pathagar.com

মন মানসিকতা থেকে শুরু করে অর্থনীতি ও সমাজের সব কিছুর উপর একচেটিয়া পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাহু বিস্তার করে চলেছে। এটা ঘটেছে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অধঃস্থন করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক মৌলিক নীতিমালা এখন নির্ধারণ করে আমলাতন্ত্রিক চরিত্রধারী বিশ্বসংস্থাগুলো যাদের কর্তৃত্ব আছে কিন্তু পরিণতির জন্য দায়দায়িত্ব কিংবা জবাবদিহিতা নেই। তৃতীয় দুনিয়ার শাসকশ্রেণীর একটা বৃহৎ অংশ এই প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরা নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা বিশ্বসংস্থাগুলোর কাছে সপে দিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা ও বিত্তকে নির্বিঘ্ন করে। এ সব দেশের মন্ত্রণালয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব আর্থিক সংস্থার স্থানীয় শাখা। উল্টো রাষ্ট্র দায়িত্ব নিয়েছে এই ব্যবস্থা রক্ষার। যেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায় রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুঁজিবাদের পাহারাদার রাষ্ট্রগুলো এভাবে তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোকে তাদের সাঙ্গাতে পরিণত করেছে।

এটা বলা অত্যুক্তি হবে না তৃতীয় দুনিয়ার এই সব দেশের ক্ষমতাসীন সরকার এক অর্থে বিদেশি। দেশের লোক দিয়েই সরকার গঠিত হয় বটে। কিন্তু তাদের কাজ হচ্ছে সমস্ত দেশ মন্থন করে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সেবা করা। তাদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে দেশের প্রশাসন, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, সংস্কৃতি, অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি করা। এই কাজ করতে গিয়ে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোতে সরকার নিজের দেশের জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশকে সংঘবদ্ধ করে থাকে। যে অংশটি দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। জনগণের এই অংশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল, কিন্তু আপন দেশের জনগণের প্রভু। সাম্রাজ্যবাদের মহাপরিকল্পনার ভিতরে থেকে যে কমিশন জোটে তা থেকেই তারা দেশের মধ্যে প্রধান শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠে। এশিয়া-আফ্রিকার দেশে দেশে আজ দেখতে পাই কমিশন ও উচ্ছিষ্টপ্রাপ্ত এই প্রধান শ্রেণীই সরকার তৈরি করে এবং সরকার এই প্রধান শ্রেণীকেই সংঘবদ্ধ করে। সরকারের বারবার পতন ঘটলেও দেশের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন কেন যে ঘটে না, এ রহস্যের সুরাহা কোথায়? সুরাহা এখানেই যে ঐ প্রধান শ্রেণীর কখনো পতন হয় না। ঐ প্রধান শ্রেণী সরকারি দলেও থাকে, বিরোধী দলেও থাকে এবং সর্বত্রই ঐ শ্রেণীকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠান। যার পিছনে ওঁৎ পেতে থাকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো।

বাংলাদেশের প্রধান রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের ভিতরে হচ্ছে আইএমএফের অফিস। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে, না আইএমএফ(?)–এটা একটা প্রশ্ন। প্রতীকি অর্থে হলেও বাংলাদেশের প্রধান রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের ভিতরে

www.pathagar.com

আইএমএফের অফিস দেশটির অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার গরিব দেশগুলোর পানি, জমি, মানুষ, প্রকৃতি ও খনিজ সম্পদ কোন কিছুই এখানকার মানুষের কাজে লাগবে না বরং তার বোঝা টানতে হবে। আর এর ফলে উন্নয়ন সম্ভাবনার অধিকাংশ বিনাশ ঘটবে। দারিদ্র, নিপীড়ন, বৈষম্যমূলক অবস্থা আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে।

এই সব আর্থিক সংস্থাগুলোর প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড ও সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠবে নিম্নোক্ত ঘটনায় ঃ

১৯৯০-এর দশকে দক্ষিণ এশিয়ার আসিয়ানভূক্ত দেশগুলো হঠাৎ করে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে যায়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের বিনিয়োগকৃত টাকা দ্রুততার সাথে তুলে নিয়ে গেলে এ সব দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এই কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়। এই দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী ফাঁদে ফেলবার জন্য বহুজাতিকরা এই সংকট তৈরি করে। বিশ্বব্যাংক এই সুযোগ গ্রহণ করে দ্রুত বিকাশশীল মুসলিম রাষ্ট্র মালায়েশিয়াকে ফাঁদে আটকানোর চেষ্টা করে এবং প্রকল্পের নামে এক লোভনীয় ঋণ সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে আসে। মালায়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ এ ঋণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যা বলেন তা ভাববার মতো ঃ এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত কোন দেশ দারিদ্র্য বিমোচন কিংবা সুশাসন নিশ্চিত করতে পারেনি। উপরন্তু এই ঋণের বিনিময়ে এ সব দেশের উপর নানা রকম বিপর্যয় নেমে এসেছে। আমাদের সমস্যা আমরা মোকাবিলা না করতে পারলে বাইরে থেকে এসে কেউ এ সবের সমাধান করতে পারবে না। তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বব্যাংকের ফাঁদ থেকে মালায়েশিয়া অব্যাহতি পেলেও ষড়যন্ত্র থেমে থাকে না। বিশ্বব্যাংক ও তার ছায়া প্রচ্ছায়ারা মালায়েশিয়ার তৎকালীন উপপ্রধান মন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমকে কোনোভাবে বুঝাতে সক্ষম হয় বিশ্বব্যাংকের ঋণ মালায়েশিয়ার জন্য মঙ্গলকর হবে। আনোয়ার সাহেবও সেই মত ঘটনার দূরবর্তী পরিণতি চিন্তা না করে প্রধান মন্ত্রী মাহাথিরকে এই ঋণ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। প্রধান মন্ত্রী মাহাথির আনোয়ার ইব্রাহীমের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং পরবর্তী কালে মাহাথির–আনোয়ারের মধ্যে যে নোংরা রাজনৈতিক বিরোধ ও সংকটের শুরু হয় তার পিছনে বিশ্বব্যাংকের ভূত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই প্রতিষ্ঠানগুলো এমনিভাবে দেশে দেশে রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিরতার জন্য যেমন দায়ী তেমনি কৃত্রিমভাবে অর্থনৈতিক সংকট ও বিপর্যয় সৃষ্টি করাও তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। এ সব তৎপরতা সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সাম্রাজ্যবাদের অভিসন্ধি পূরণ করা। এ

www.pathagar.com

সব প্রতিষ্ঠানের ঋণের ফাঁদে আটকে এবং নানা রকম অপমানজনক শর্তের বেড়াজালে বন্দী হয়ে শেষ পর্যন্ত গরিব দেশগুলোকে সবরকমের স্বাধীনতাকে সাম্রাজ্যবাদের হাতে সমর্পণ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। তখন আমেরিকার নির্দেশ মতো এসব দেশ ও সরকারকে সৈন্য সরবরাহ, জাতিসংঘে ভোট, নানা রকম অসম চুক্তি সম্পাদন, বহুজাতিকের কাছে দেশের সম্পদ হস্তান্তর এবং আজকালকার বহুচর্চিত মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আড়ালে ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রাখতে হয়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা যায় এসব সংস্থার আমলনামা মোটেও সুখকর নয়। এরা বিভিন্ন প্রকল্প ছাড়াও নিয়মিতভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ছাড়াও তারা প্রকাশ্যে নীতিমালা নির্ধারণ করে।

তাদের এসব কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের তেল গ্যাসক্ষেত্রগুলো এখন বিদেশি কোম্পানির দখলে। নিজেদের গ্যাস এখন বেশিদামে কিনতে হচ্ছে। দেশীয় সংস্থা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প দিয়ে বহু অঞ্চল এখন জলাবদ্ধতার শিকার। পাটখাত উন্নয়নের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পাটশিল্প এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে নানা প্রকল্পের প্রভাবে এই খাতগুলো ছিন্নভিন্ন এবং জনগণের প্রবেশাধিকার সেখানে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। সামষ্টিক অর্থনীতির নানা কর্মসূচির কারণে অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে আমদানি মুখী হয়ে ওঠায় অর্থনীতির ভিত্তি নড়বড়ে। এসব সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন কৌশল দাঁড় করানোর কারণে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও জ্বালানি নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

বিশ্বব্যাংক ও তার সহযোগীরা এক সময় আমাদের সীমিত গ্যাস সম্পদকে বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে ভারতে রপ্তানি করার সুপারিশ করেছিল। তারপরে এরাই ২৩টি ব্লকে বাংলাদেশকে ভাগ করে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে ব্লকগুলো তুলে দেয়ার সুপারিশ করে। ফলে গ্যাস সম্পদ চলে যায় বিদেশি কোম্পনীর হাতে। গোপন, প্রতারণামূলক ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তির মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ গ্যাস সম্পদের মালিকানা লাভ করে। একদিকে দেশীয় অনুসন্ধান সংস্থাকে অলসভাবে বসিয়ে রাখা হয় অন্যদিকে দেশীয় সংস্থার তুলনায় ২৫ গুণ বেশি দামে ও বৈদেশিক মুদ্রায় গ্যাস ক্রয় শুরু হয়। এই কারণে প্রতি বছর পেট্রোবাংলার লোকসানের পরিমাণ বাড়ছে অন্যদিকে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

www.pathagar.com

দক্ষতা ও উন্নত প্রযুক্তির কথা বলেই বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এদের হাতেই ঘটে বাংলাদেশের দুটো গ্যাস ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। ১৯৯৭ সালে অক্সিডেন্টালের দায়িত্বে মাগুরছড়া এবং ২০০৫ সালে নাইকোর দায়িত্বে টেংরিটেলায় এই দুর্ঘটনাগুলো হয়। এতে দেশের ক্ষতির পরিমাণ ১৫ হাজার কোটির বেশি। বিশ্বব্যাংক ও এডিবি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পাওনা পরিশোধের জন্য সরকারকে চাপ দিলেও যে সংস্থার অদক্ষতার কারণে দুর্ঘটনার মত ক্ষতি বাংলাদেশকে হজম করতে হয়েছে তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো বরাবর নীরব।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাংকসহ এই সংস্থাগুলোর মূল মনোযোগ ছিল একদিকে ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণ ও অন্যদিকে তাদের নীতির ফলে সৃষ্ট লোকসানের বোঝা পিডিবির উপর চাপিয়ে দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে এই খাত তুলে দেয়া, যার ফল অধিকতর অনিশ্চয়তা ও ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি। একই ধারায় ফুলবাড়িয়া কয়লা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কয়লা উত্তোলনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এশিয়া এনার্জি নামে এক বিদেশি কোম্পানির হাতে দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ কয়লা খনি তুলে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এশিয়া এনার্জি মাত্র ৬ ভাগ রয়ালিটির বিনিময়ে এই কয়লা সম্পদ বিদেশে পাচার করতে উদ্যত হয়। বিশ্বব্যাংক সমর্থিত আইআইএফসি টাটার জন্য বড় পুকুরিয়া ও এশিয়া এনার্জির জন্য ফুলবাড়ী খনি বরাদ্দ করে কয়লা নীতিও প্রণয়ন করেছিল। যদিও এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি।

উপরের ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় ঃ

১. এ সব সংস্থা মূলতঃ বহুজাতিক কোম্পানির পক্ষে কাজ করে যাকে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে ব্যাখ্যা করা চলে।

২. এ সব সংস্থা কোন জবাবদিহিতা ছাড়া বাংলাদেশের মত দেশে অবারিত ক্ষমতা ভোগ করে।

৩. এ সব সংস্থা পাশ্চাত্যের ধনী ও ক্ষমতাবান দেশ ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর লবিং ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

৪. স্থানীয় শাসক ও এলিটশ্রেণী এদের প্রধান শরীক হিসেবে অবস্থান করে।

তাই বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবিসহ অভিন্ন ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত সকল সংস্থার রাহু থেকে বাংলাদেশসহ সকল গরিব ও অপশ্চিমা দেশগুলোকে মুক্ত করবার জন্য এবং এ যাবৎ কাল এসব সংস্থার নির্দেশ, অর্থায়ন ও সুপারিশে বাস্তবায়িত প্রকল্প ও নীতিমালার অনুসরণে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার বিরুদ্ধে দেশে দেশে বিপ্লবী জনতার রুখে দাঁড়ানো ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদ

১.

সাম্রাজ্যবাদ মানে হচ্ছে একটি জাতি বা রাষ্ট্রের স্বার্থে এক বা একাধিক জাতি বা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার মতবাদ এবং এই মতবাদের অনুসারীকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী। কিন্তু এই মতটি স্থান-কাল-পাত্র বিচারে অন্যের ওপর প্রয়োগের জন্য সাম্রাজ্যবাদীকে নানারকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়, যা সাম্রাজ্যবাদকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে থাকে। যেমন : সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে স্থূল রূপটি হলো এর সামরিক ও রাজনৈতিক কৌশল। এই প্রক্রিয়ায় পররাজ্যকে দখল ও করতলগত রাখতে সাম্রাজ্যবাদীকে নানারকম ধকল সহ্য করতে হয়। আইন, আদালত, আর্মি, সিপাই পুষতে হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হয় এবং প্রাণ ক্ষয়, সম্পদ ক্ষয়, সবশেষে পরাজয়ের গ্লানিও বহন করা লাগতে পারে।

অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ নামক ভিন্ন সংস্করণে যদিও আধিপত্য আরোপিত হয় অর্থনীতির সূত্রে, তথাপি এটি সামরিক সহায়তা ছাড়া সচরাচর টিকতে পারে না। আজকে কর্পোরেট পুঁজির বহুজাতিক সাম্রাজ্যবাদকে নিরাপদ রাখতে দেশে দেশে কিভাবে মার্কিন বাহিনী হামলে পড়েছে, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাম্রাজ্যবাদের সূক্ষ্ম রূপটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদ। দুটোই পরস্পরের অনুঘটক। এই প্রক্রিয়ায় পূর্বতন মডেলগুলোর অস্বস্তিকর পরিস্থিতিগুলোর গুণগত উন্নতি ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা স্বস্তির সঙ্গে পররাজ্য লুণ্ঠন ও শোষণের ক্ষেত্র তৈরি করে। সাংস্কৃতিক মডেলটিতে সাংস্কৃতিক দীক্ষার মাধ্যমে একদল সুবিধাভোগী শ্রেণীকে সাঙ্গাত বানানো হয় এবং তাদের হাতে পোশাকি স্বাধীনতাটুকু ন্যস্ত করে সাম্রাজ্যবাদীরা স্বীয় রাষ্ট্রে বসে কলকাঠি নাড়ে। মেকলের ভাষায়, 'কালা সাহেব'রূপী এই সুবিধাভোগী শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে অভিন্ন রুচি ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। এরাই সাম্রাজ্যবাদের সব রকমের স্বার্থ দেখভাল করে।

এই প্রক্রিয়াটি স্থায়ী করার জন্য এবং উপনিবেশিত জনগণ যাতে তার আপন সাংস্কৃতিক সত্তাটি খুঁজে না পায় সেজন্যই প্রবর্তিত হয়েছে মিডিয়া

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ। এটি উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন রকম গণপ্রচার মাধ্যমের সাহায্যে বিভ্রান্তি, আকথা-কুকথা ছড়িয়ে উপনিবেশিত জনগণের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং নানা রকম মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফেরমেশন সৃষ্টি করে এক ধূম্রজাল তৈরি করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উপনিবেশিত জনগণকে এমনভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাতে সে আত্মআবিষ্কারের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদীদের মুখাপেক্ষিতার জাল কেটে বেরিয়ে না আসতে পারে। আগের দিনের সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করত White Men's Burden-সাদা মানুষের দায়। মানে সাম্রাজ্যবাদীরা হতভাগ্য জাতিটিকে বড়ই দয়াপরবশ হয়ে তার অসভ্যতার অন্ধকার থেকে রাষ্ট্রের সভ্যতার আলোতে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করছে। সেজন্য সাম্রাজ্যবাদ দরকার, কারণ এটি এক মহতী মিশন অর্জনের চেষ্টা করছে। এখন সাম্রাজ্যবাদীরা বলছে ফ্রিডম, ডেমোক্রেসির কথা। এর জন্য ইরাকে, আফগানিস্তানে খুন-গণহত্যা সব জায়েজ হয়ে গেছে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মুক্তির সংগ্রামে নেটিভদের একটু রক্তপাত তো হবেই।

উপরোক্ত পটভূমিতে মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদকে আমাদের বুঝতে হবে, যার কাজ হচ্ছে গণবশীকরণ। সোভিয়েত ঔপন্যাসিক আলেক্সান্ডার সোলঝেনিৎসিন পশ্চিমে নির্বাসিত জীবনে থাকার সময় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতাটি পরে হার্ভার্ড ম্যাগাজিনে The Exhausted West শিরোনামে বেরিয়েছিল। এখানে তিনি সভ্যতার ভেকধারী পশ্চিমা বিশ্বের উদ্দেশে কিছু অসাধারণ কথা বলেছিলেন। সবকিছুর মধ্যে সোলঝেনিৎসিন সেখানকার সবচেয়ে শক্তিধর ও ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন পশ্চিমের স্বাধীনতার চরম অসদ্ব্যবহারকারী মিডিয়া নামের দৈত্যটিকে। লেজিসলেচার, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের চেয়েও পশ্চিমের এই শক্তিশালী মিডিয়াকে তিনি নিজ দেশের চরম স্বৈরতন্ত্রী স্ট্যালিনের তুলনায় অধিক ভয়ঙ্কর ডিক্টেটর হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

গুলাগ আরকিপেলাগো ও ফাস্ট সার্কেলের স্রষ্টা এই ঔপন্যাসিক তখন প্রশ্ন করেছিলেন : পশ্চিমা সাংবাদিকটি কোন আইনের বলে নির্বাচিত হন, তিনি কার কাছে দায়বদ্ধ, কে তাকে ক্ষমতা দান করে, কতটুকু অধিকারসহ এবং কত সময়ের জন্য!

www.pathagar.com

সোলঝেনিৎসিন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, যদি এই সাংবাদিক নামের বিশেষ মানুষটির ক্ষমতার উৎস হয় পশ্চিমের ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি বস্তু; তাহলে আসল সত্যটা হলো পশ্চিমা সাংবাদিকের আর যা কিছু থাকুক স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। পশ্চিমা মাসমিডিয়া মানে চলতি ফ্যাশন, উঠতি হুজুগ এবং ব্যবসায়িক চাহিদার দাসানুদাস। সেখানকার কর্পোরেট পুঁজিপতিরা সবরকমের মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের রুচি, গরজ ও মুনাফার প্রয়োজনে এসব গণমাধ্যম গণচাহিদার সৃষ্টি করে। একটা কথা বোঝা দরকার, পশ্চিমে মিডিয়ার স্বাধীনতা কথাটা সেখানকার পুঁজিপতিদের বাণিজ্যিক ও ক্ষমতাদর্শিক স্বার্থকে রক্ষা করেই কার্যকর হয়।

পশ্চিমের আর একজন পণ্ডিত নোয়াম চমস্কি তার Manufacturing Consent বইতেও সেখানকার মিডিয়াকে স্রেফ মুনাফানির্ভর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার কথা হচ্ছে, পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো সেখানকার বড় বড় পুঁজিপতিরা নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর দ্বারা তারা বিপুল পরিমাণ মুনাফা হাতিয়ে নেয়। তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাই এসব গণমাধ্যম যথার্থতা রাখতে পারে না। তথ্যের ধরন, গুণাগুণ, পরিবেশন কৌশল সবটাই মুনাফার প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হয় এবং তাতে জনস্বার্থ বিপন্ন হয়। ফলে যারা তথ্যের ক্ষেত্রে যথার্থতা রাখতে চায় তারা এসব কর্পোরেট টাইকুনদের সামনে টিকে থাকতে পারে না। এর ফল হচ্ছে, গণমতের প্রতিনিধিত্বকারী বলে পরিচিত এসব গণমাধ্যমে জনমত উচ্চারিত হয় না। বরং বিশেষ কায়দা ও কৌশলে এসব তথাকথিত গণকণ্ঠ থেকে উচ্চারিত মতামতই জনমত হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রকৃত জনমত রুদ্ধ হয়ে যায়, উচ্চারিত ও প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। যোগ্য ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজে ভূমিকা রাখতে পারে না। কারণ সমাজ রূপান্তরের সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মিডিয়া তাকে স্থান দেয় না। এই কারণে দেশও তাকে শুনতে পায় না। তার পণ্যটি মূল্যবান হলেও মিডিয়া সামাজিক, বাণিজ্যিক ও মতাদর্শিক স্বার্থে যে গণচাহিদার সৃষ্টি করে, সেই খাদ্য তালিকায় তার পণ্যটির কোনো বিক্রয়মূল্য থাকে না। জনমতের ভান ধরে মিডিয়া প্রকৃতপক্ষে জনমতকে বিভ্রান্ত করে। সে খুনিকে বানায় নায়ক, নায়ককে বানায় খুনি। প্রচার মাধ্যমই নির্ধারণ করে দেয় কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। পণ্যের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যটি হয়ে পড়ে মূল্যহীন।

www.pathagar.com

আপনার-আমার প্রয়োজন আমি বা আপনি নির্ধারণ করতে পারি না। ওটা মিডিয়াই করে দেয়। তেমনি কে গায়ক, কে নায়ক, কে লেখক, কে নেতা, কে বরণীয়, কে উপেক্ষণীয়–তাও ঠিক করে দিচ্ছে গণমাধ্যম নামক ভয়ানক বস্তুটি। আপনাকে কেবল ডাক্তারের পরামর্শ মতো চোখ বুজে ওষুধ খেতে হবে এবং মন্ত্রজ্ঞানে নিদানগুলো মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে। মিডিয়ার এই মজেজার কারণ হলো প্রযুক্তির অসাধারণ বিকাশ। এই প্রযুক্তির ওপর ভর করে পুরো পাশ্চাত্য সভ্যতা (তাদের অনুকরণে আমরাও) এখন পণ্যভোজী সমাজ থেকে তথ্যভোজী সমাজে পরিণত হয়েছে। তথ্যভোজনও এক ধরনের ভোজন–যেমন বিনোদন, কালক্ষেপণ ইত্যাদি। পাঠ মাধ্যম- শ্রুতি মাধ্যমের (Textual and Audio Media) চেয়ে এখন দৃষ্টি মাধ্যম (Visual Media) বহুগুণে শক্তিশালী।

ডিশ অ্যান্টিনার কল্যাণে এখন বেশুমার টিভি চ্যানেল, কেবল টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর ইত্যাদি ছাড়াও আরও কত কী আমাদের স্নায়ুকে অষ্টপ্রহর উত্তেজিত করে চলেছে। এসব তথাকথিত মাসমিডিয়া নামের ঝুঁড়িতে আছে কমিক স্ট্রিপ, সোপ অপেরা, ওয়েস্টার্ন, মালটিমিডিয়া সমর্থিত লাভ সং আর হরর মুভি। এসব দেখতে দেখতে এখন পশ্চিমা মানুষের মতো আমাদের এখানকার কারও কারও অবস্থা ফাঁপা বেলুনে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার অবাধ চর্চার ঠেলায় এখন সমাজই রীতিমত অসহায়। মানবাধিকার চর্চার শেষ নেই। অথচ মানবিক মূল্যবোধ বলে যা কিছু তা কিন্তু উবে যাচ্ছে। পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প সভ্যতা তাদের মাসমিডিয়া নামক শিল্প-কারখানায় যেসব গল্প, কাহিনী, অপেরা, সিনেমা, নাটক, থিয়েটার তৈরি করে; তাই কিন্তু একালের মানুষের মন-মনন-বুদ্ধিমত্তার প্রাথমিক বুনিয়াদ তৈরি করে। এসব কিছুর গণসম্প্রচার একালের নৈতিক দারিদ্র্য, লঘু চরিত্র ও আত্মস্বার্থপরতার জন্য দায়ী। এসব বিনোদনের নামে চালু মাসপ্রডাক্টগুলো কিন্তু এক ধরনের গোপন দীক্ষাদান কর্মসূচিও বটে। কমিক স্ট্রিপ, টিভি মুভি, ম্যাগাজিন, ভিসিপি, ভিসিআর, কম্পিউটার গেমস প্রভৃতি শুধু বাইরে থেকে অভিনব ফ্যাশন, সহিংসতা, যৌন উদ্ভাবনই শেখাচ্ছে না–এর মাধ্যমে শেখাচ্ছে গভীরতর বিষয়। যেমন–কিভাবে অতীত ইতিহাসকে হারিয়ে ফেলতে হয়, কিভাবে ভবিষ্যৎকে দাবিয়ে রাখতে হয়, কিভাবে বর্তমানটাকেই মানিয়ে নিতে হয়

www.pathagar.com

আর কিভাবে বিদ্রোহ-বিপ্লবের কথা না বলে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী কায়েমি স্বার্থের সেবায় জনগণের স্থিতিবস্থাটা অক্ষুণ্ন রাখতে হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের মাসমিডিয়া নামের ভয়ানক যন্ত্রটির কলাকৌশলে এখন মুসলিম দুনিয়া তথা অপশ্চিমা জগতের মানুষদের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তারা তাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও উন্নততর জীবনবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে পশ্চিমানুসারী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছে। এই আত্মঘাতী প্রক্রিয়াটি অনুকরণ ছাড়া মাসমিডিয়া আমাদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছে, আমরা সাবালক হয়ে উঠতে পারব না। এই প্রক্রিয়ায় অলক্ষ্যে পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প সভ্যতাও এক গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেছে। একদিকে পশ্চিমা নাগরিকরা তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আর কনজুমারিজমের সীমাহীন উচ্চতায় আরোহণ করেছে; অন্যদিকে অপুঁজিবাদী দুনিয়ার মানুষেরা নিছক অনুকরণের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু এসবের সর্বগ্রাসী পশ্চাদ্ধাবন মানুষকে ভুলিয়ে দিয়েছে তার আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি। সে ভুলে যাচ্ছে উচ্চতর মূল্যবোধ, আত্মত্যাগ ও বিশ্বাসের শক্তির কথাটা। এই আত্মঘাতী আত্মসর্বস্বতা পশ্চিমের মানুষকে পরিণত করেছে স্রেফ ত্বকে ঢাকা মাংসসর্বস্ব একটি দেহপিণ্ডে। সেজন্যই গণতন্ত্র ও সভ্যতার রাজধানী বলে কথিত পশ্চিমা জগতে অল্প সময়ের জন্য বাইরের আলো না থাকলে ভেতরের অন্ধকারের দাপাদাপিতে মুহূর্তের মধ্যে লুটতরাজ, খুন-জখম, নারী ধর্ষণের মতো তাণ্ডবলীলায় যে দোজখের আজাব নেমে আসে তাতেই প্রমাণ হয়, 'সমৃদ্ধতম' ও 'আলোকিত' এ সভ্যতার মানুষ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতেও জরাজীর্ণ।

পশ্চিমা সভ্যতার সমস্যাটা তাহলে কোথায়? সেটা সোলঝেনিৎসিন তার বক্তৃতায় ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার মতে, রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের যে ইউরোপীয় ঘটনা; তা-ই সেখানকার মানুষকে আত্মাহীন দেহচর্চায় ডুবিয়ে দিয়েছে। উচ্চতর কোনো মূল্যবোধের কাছে কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় তারা মনে করেছে, দেহসর্বস্ব মানুষটি হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাদের সেবায় গোটা দুনিয়ার সবকিছুই নতজানু হয়ে থাকবে।

সোলঝেনিৎসিন প্রশ্ন করেছেন : এ জগতে মানুষ যদি সুখের জন্যই জন্মে তাহলে সে মরে কেন? অন্তত পশ্চিমের মানুষেরা, সুখ যার ক্রমবর্ধমান, প্রাচুর্য যার ফল্গুধারার মতো প্রবাহমান?

www.pathagar.com

২.

পশ্চিমের মানুষেরা নিজের বোধ-বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রচারযন্ত্রের নাচের পুতুলে পরিণত হয়েছে। প্রচারযন্ত্রের প্রচারণার নিরিখেই তারা জীবনের সবকিছু মাপতে চায়, তারা বুঝতে চায় কে কতখানি উন্নত বা অনুন্নত। প্রচারযন্ত্রই সাম্রাজ্যিক স্বার্থে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে রেখেছে, অপশ্চিমা বিশ্বের মানুষেরা নিজেদের ভালোমন্দ বুঝতে পারে না। সুতরাং এদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পশ্চিমের উন্নত মানুষদের সহায়তা জরুরি।

একটু উদাহরণ দেয়া যাক : চিলিতে সালভেদর আলেন্দের জনপ্রিয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর বহুজাতিক কোম্পানি ও তার পাহারাদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথা খারাপ হয়ে যায় এবং আলেন্দের সরকারকে উৎখাতের জন্য তারা সর্বস্ব পণ করে। চিলিতে মার্কিন হস্তক্ষেপের সপক্ষে নিক্সন সরকারের ভূমিকাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির তৎকালীন 'গুডবয়' হেনরি কিসিঞ্জারের উক্তিটি 'কিংবদন্তি' হয়ে আছে :

I do not see why we need to stand by and watch a country go communist due to the irresponsibility of its own people.

এরপর ১৯৭০ থেকে '৭৩ পর্যন্ত চিলিতে যা ঘটেছে তা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছক অনুযায়ী। আলেন্দে সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এক মিডিয়াযুদ্ধ শুরু করে এবং সেই অপপ্রচারের তোড়ে আলেন্দে সরকার উৎখাতের জন্য চিলির মানুষের মনোগঠন সম্পন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত মিলিটারি ক্যু'র মাধ্যমে আলেন্দে সরকারের অপমৃত্যু ঘটে। সমস্ত প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়নে যুক্ত হয়েছিল বহুজাতিক পুঁজির অধিপতিরা, যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সাংস্কৃতিক ও মিডিয়ার যন্ত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যু পৃথিবীর কোথাও বিদেশি স্বার্থ ও এলিট শ্রেণীর স্বার্থের নামে হয় না। তা হয়ে থাকে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, ঐতিহ্য, জাতিসত্তা এমনকি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদের শ্লোগান দিয়ে। এরকম উদাহরণ আমাদের দেশেও আছে। চিলিতেও সেরকম ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, আলেন্দের লোকজন কমিউনিজমের নামে দেশটিকে এক অপসংস্কৃতির দিকে নিয়ে গেছে। বিশেষ করে আলেন্দের দল ক্ষমতায় থাকলে প্রথমে দেশে ঘটবে গৃহদাহ, রক্তস্নান, তারপর দেশটির সুপ্রাচীন সভ্যতারই বিনাশ ঘটে যাবে। এ অবস্থায় চিলির গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষা করতে মিলিটারি

www.pathagar.com

ক্যু'র কোনো বিকল্প আছে কি? এই প্রক্রিয়ায় যখন ক্যু ঘটেই যায় তখন সেটিকে কেউ প্রতিবিপ্লব বা মার্কিনি ষড়যন্ত্র বলবে না। সবাই মনে করবে, এ ধরনের ঘটনা অবধারিতই ছিল কিংবা এ হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ! আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি এমন কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা হচ্ছে ইরাক ও আফগানিস্তান। সাদ্দামকে খলনায়ক নির্মাণের আগে গণমারণাস্ত্র ভাণ্ডারের গল্পকাহিনী নিয়ে বুশ-ব্লেয়ার ও তাদের অনুগত মিডিয়া যেভাবে লাফিয়ে বেড়িয়েছে, তা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। গণধ্বংসের অস্ত্র জমা করার জন্য সাদ্দামের ইরাক বিপজ্জনক রাষ্ট্র হয়ে ওঠার গল্পটা যে কতখানি অন্তঃসারশূন্য তা এতদিনে সবাই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। ওটা যে আগাগোড়াই মিথ্যা প্রচার ছিল, ইরাক আগ্রাসনের ছল বা অজুহাত ছিল–সেসব কথা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। অথচ এই গল্পকাহিনীই আমাদের পশ্চিমা মিডিয়া বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে। আবার কমিউনিস্ট শয়তানদের সাম্রাজ্য থেকে মুক্তি দেয়ার পর ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের মূর্খের স্বর্গটিকে রসাতলে পাঠিয়ে এ বিশ্বকে আমেরিকার শিশুদের বাসযোগ্য করে তোলার অঙ্গীকার পালন চলছে, চলবে। এখানেও সাম্রাজ্যবাদীদের মিডিয়ার 'কর্তব্যপরায়ণতা'য় কোনো ভুল নেই।

স্পেকটার অব কমিউনিজমের পর পশ্চিমা মিডিয়া স্পেকটার অব ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। নোয়াম চমস্কি ঠিকই বলেছেন। কমিউনিজমের পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আড়ালে ইসলামবিরোধিতাকে পশ্চিমা জগত আজ জাতীয় ধর্মে পরিণত করে ফেলেছে। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমের প্রযুক্তি শাসিত শক্তিশালী মিডিয়া পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের একান্ত অনুগত খেদমতগার হিসেবে ইসলামকেই এই মুহূর্তে তার বড় শত্রু হিসেবে নিশানা করেছে।

কমিউনিজমের পতনের পর ইসলামকে এই নিশানা করা কেন? কারণ এটি একটি সুগঠিত মতাদর্শ। এটি কর্পোরেট পুঁজিকে সমর্থন করে না। সমর্থন করে না বাজার অর্থনীতি, বিশ্বায়নের নামে নতুন কালের অর্থনৈতিক শোষণের দাপাদাপি। পশ্চিমের অবাধ কনজুমারিজম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্মস্বার্থপরতা ইসলামের কাম্য নয়। ইসলাম চায় না একজনের শোষণে আর একজনের অগ্রগতি; ইসলাম চায় আদল, ইহসান ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে শোষণ ও বঞ্চনা থাকবে না। সাম্রাজ্যবাদীদের পথের কাঁটা এই মতাদর্শকে Pre emptive war-এর জয়ধ্বজা উড়িয়ে মার্কিন

www.pathagar.com

গলিয়াথ খতম করার চেষ্টা করবে, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তথ্যপ্রযুক্তিকে তাদের স্বার্থে Catalytic converter-এর মতো ব্যবহার করে। এজন্য পুঁজিবাদী মিডিয়া ইসলামকে বর্বর, সন্ত্রাসী, জঙ্গি ধর্ম হিসেবে অনবরত প্রচার করে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে তাকে অবিরত নিন্দিত হতে হয়। উদ্দেশ্য, কোনো কিছুকে নিন্দিত না বানাতে পারলে তাকে ধরাশায়ী করা যাবে কেমন করে! কেবল শক্তিশালী মিডিয়ার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামের সঙ্গে শত্রুতাকে আজ জায়েয করে নিচ্ছে।

ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠী নিয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি ভালোভাবে বোঝা দরকার। হামিদ আবদুল করিম তার প্রবন্ধ 'দি হিপোক্রেসি অব ওয়েস্টার্ন মিডিয়া'তে লিখেছেন :

লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি খবরের কিছু অংশ দেখা যাক, 'একদল আমেরিকান উগ্রপন্থী হিজ ম্যাজেস্টির শান্তিরক্ষী বাহিনীকে আক্রমণ করে অনেক ব্রিটিশ সৈন্যকে হত্যা করেছে। সাম্প্রতিকতম এই সন্ত্রাসী হামলার খবরে প্রধানমন্ত্রী সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং মহামান্য রাজাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন–যতদিন পর্যন্ত না আমেরিকান সন্ত্রাসীরা তাদের দুষ্কর্ম বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করছে, ততদিন তিনি শান্তিতে বিশ্রাম নেবেন না।' এই খবর একটু অদ্ভুত শোনাতে পারে; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী প্রভু ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে হোয়াইট হল থেকে এরকম খবরই পরিবেশন করা হতো। স্বাভাবিকভাবেই এ খবর শুনে সেই সময়ের আমেরিকাবাসীরা হেসেছিল। কিন্তু আজকে তারা হুবহু একই ধাঁচে ইসলামী সন্ত্রাসবাদ ও মুসলিম চরমপন্থী নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং বিশ্বকে তা বিশ্বাসও করাতে চাচ্ছে।

প্রচারণার এই ধরনটা চিরকাল একই রকম। হয় আমাদের সঙ্গে থাক না হলে ভাগাড়ে গিয়ে মরো। পেন্টাগন, হোয়াইট হাউস এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের পছন্দসই হলে টিকবে, নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বাধীনতা সংগ্রামী, মতাদর্শিক যোদ্ধা এতে কিছু আসে যায় না। আমেরিকার জিঘাংসার বিরুদ্ধে, ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে, বিশ্বায়ন-বাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে যে-ই দাঁড়াবে, মোকাবিলা করার কথা বলবে, সে-ই রাতারাতি সভ্যতার শত্রু, জঙ্গি, বর্বর, সন্ত্রাসী বনে যাবে। আমেরিকার মোসাহেবি

www.pathagar.com

করলে, তার শোষণ-শাসন-ত্রাসন-লুটপাটতন্ত্রকে জায়েয করে দিলে রাতারাতি সভ্যতার বরপুত্রও বনে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। অর্থাৎ পছন্দ হলে রাখবেন তিনি, মারার হলে মারবেনও তিনি। অনেকের মতে তাই আমেরিকান প্রভুত্ববাদ, একুশ শতকের এই হিটলার-মুসোলিনিকে বুখতে বিশ্বব্যাপি মজলুম জনতার নতুন এক ফ্রন্ট খোলা ছাড়া উপায় নেই।

৩.

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, মুসলিম রাষ্ট্র ও জনগণ আজও পাশ্চাত্যের পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার ওপর ভয়ানকভাবে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের অবস্থানকে প্রতিনিয়ত দুর্বল করে দিচ্ছে।

পুঁজিপতি মিডিয়াগুলোর অবিরত প্রচারণা মুসলিম জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে নৈরাজ্য উৎপাদন করে। এসবের ফলে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ধারণাগুলোর অবলুপ্তি ঘটে। এগুলো ধীরে ধীরে ভিনদেশি ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে মিডিয়াকে ব্যবহার করা। মিডিয়ার প্রচারণাকে মিডিয়া দিয়েই প্রতিহত করতে হবে। এই কৌশল আজ মুসলমানদের আয়ত্ত করতে হবে। পাশ্চাত্যের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম বিষয়ক পণ্ডিত 'Muhammad : The Biography of a Prophet'-এর নন্দিত রচয়িতা কারেন আর্মস্ট্রংয়ের একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই যা মিডিয়ার জগতে একালের মুসলমানদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়। একুশ শতকে মুসলমানরা এরকম একটা স্ট্রাটেজি ছাড়া পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার যুদ্ধকে মোকাবিলা করতে পারবে না:

মুসলমানদের মিডিয়াকে ব্যবহার করা উচিত। ইহুদিদের মতো মুসলমানদের লবিং করতে জানতে হবে এবং তাদের একটি মুসলিম লবির সৃষ্টি করতে হবে। আপনি যদি চান এটাকে জিহাদ বলতে পারেন। এটা এমন এক প্রচেষ্টা, এমন এক সংগ্রাম—যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি মিডিয়াকে পরিবর্তন করতে চান, তাহলে মানুষকে আপনার বোঝাতে হবে—ইসলাম রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও একটি শক্তি। কিভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে এবং মিডিয়াতে নিজেদের কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে তা মুসলমানদের জানতে হবে। মুসলিম উম্মাহকে একালের এই নবতর চ্যালেঞ্জ মেকাবিলা করার বিকল্প কোনো পথ নেই।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ

কোকাকোলা হচ্ছে একটি মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি, যা কি না দুনিয়ার প্রায় সবদেশে তার পণ্যের বিপণনে সফল হয়েছে। এ কোম্পানির পানীয় এখন সবাই মুগ্ধ হয়ে পান করে। বড় বড় হোটেল, বিয়ে-শাদী, পার্টি, গানের কনসার্ট, ফুটবল, ক্রিকেট ম্যাচ ইত্যাদি যেন এই কোমল পানীয় ছাড়া আজকাল কল্পনা করা যায় না। শুধু তাই নয়, শহরের লোক গ্রামে গেলে এখন ডাব বা তবক দেয়া পান দিয়ে মেহমানদারি না করে কোক-পেপসি দেয় এই মনে করে যে, এটা তাদের সম্মান করা হচ্ছে। কোকের বিজ্ঞাপন নামিদামি নায়ক-নায়িকাদের দিয়ে করা হয়। তারা পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে কোক খায়, শক্তি আর আনন্দের প্রাচুর্যে ভেসে যায়। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বুশ-ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে মিছিল করে, শ্লোগান দিয়ে গলা শুকিয়ে গেলেও মিছিলকারীদের অনেকেই ঢক ঢক করে কোক পান করতে থাকে, এ দৃশ্যও বিরল নয়। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় কী! সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার কোকের চেয়ে আর বেশি কী হতে পারে– এ মুহূর্তে যা মানুষের শরীরে, রক্তে মিশে আছে? এ কোকাকোলার ভেতর দিয়ে আমেরিকার জীবন ধারার বৈশ্বিক উপস্থিতিকে আমাদের প্রতিক্ষণ মনে করিয়ে দেয়। অনেকের মতে আর কোনো বাণিজ্যিক পণ্যই এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেনি। কোকাকোলা এখন হয়ে গেছে একটা বৈশ্বিক পানীয়। এ কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসি বামপন্থীরা কোকাকোলাকে সে দেশের জন্য একটা মার্কিন সাংস্কৃতিক হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং এটির আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সমাজ বিজ্ঞানীরা এখন একটি নতুন পরিভাষা চালু করেছেন –Coca-colonization। শব্দটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর গভীরতর তাৎপর্য হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে এক বিশাল মেরুদণ্ডহীন মানসিকতার জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা হচ্ছে। একই সঙ্গে একটি একক সংস্কৃতি ও বাজার তৈরির চেষ্টা চলছে। মানবসমাজের এ Homogenization-সমসত্তকরণ (কারো কারো মতে Americanization) প্রক্রিয়ায় তৃতীয় দুনিয়ায় এক নতুন মনস্তাত্ত্বিক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, যাতে করে এসব এলাকার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দ্রুত অবলুপ্তি ঘটে এবং সেখানে

www.pathagar.com

পশ্চিমা মূল্যবোধের বংশবিস্তার হয়। প্রত্যক্ষ উপনিবেশ এখন হয়তো নেই; কিন্তু মননে-সংস্কৃতিতে-অর্থনীতিতে উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী থাবার বিস্তার রয়ে গেছে একই রকম।

এই চেতনাগত সাম্রাজ্যবাদের সূত্রেই সমাজবিজ্ঞানীরা আরও একটা শব্দ চালু করেছেন : Mcdonaldization. ম্যাকডোনাল্ড হচ্ছে বিখ্যাত ফাস্টফুডের দোকান, যার ব্যবসা দুনিয়াজুড়ে। কিন্তু ওই শব্দটা দিয়ে আজকাল বোঝানো হয় ঐতিহ্যকে পেছনে ফেলে এসে মানুষ আধুনিক দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে। আমাদের অনেক তরুণ-তরুণীকে হাপিত্যেশ করতে শুনেছি–এখনও ঢাকায় কেন ম্যাকডোনাল্ড তার পসরা সাজিয়ে বসেনি? ভাবটা এমন–ওই ম্যাকডোনাল্ড ছাড়া আধুনিকতা, প্রগতি ও রুচি রক্ষা বেজায় মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে! ক্লাসিকাল সাম্রাজ্যবাদ বলতে আমরা শক্তিশালী একটি দেশ কর্তৃক ভৌগোলিকভাবে অন্য একটি দুর্বল দেশকে দখল করে নেয়া বুঝাই। কিন্তু সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ঠিক অর্থনৈতিক শোষণ বা সামরিক আধিপত্যের আঙ্গিকে ঘটে না। এ প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীরা সাংস্কৃতিক দীক্ষার মাধ্যমে একদল সাঙ্গাত তৈরি করে তাদের মাধ্যমেই স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। একসময় উপনিবেশিত দেশগুলোয় সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজ দেশের আদলে সেখানকার শিক্ষা ও গণমাধ্যমকে গড়ে তুলেছিল এবং তাদের মূল্যবোধকেই উপনিবেশিত দেশে প্রবেশ করিয়েছিল। আজকেও সাম্রাজ্যবাদীরা একইভাবে মাসমিডিয়াকে ব্যবহার করছে মগজধোলাইয়ে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তৃতীয় দুনিয়ার মানুষের চেতনায় এটা ভালো করে ঢুকিয়ে দেয়া যে, পশ্চিমা সংস্কৃতিই হচ্ছে উন্নত। সুতরাং এর কাছে বশ্যতা না স্বীকার করাই অসভ্যতা, বর্বরতা, মধ্যযুগীয়তা। এই সাংস্কৃতিক দীক্ষার মাধ্যমে যে গোলাম শ্রেণী তৈরি হয় তারাই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এক পেয়ালার সাংস্কৃতিক বন্ধুত্বের সূত্রে পরস্পরের স্বার্থকে জোরদার করে তোলে।

তাই একালে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই বলতে শুধু বামপন্থীদের মতো পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই কিংবা কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই বলে চালানো যাবে না। একই সঙ্গে এ লড়াইকে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের সব ধরন বা ফর্মের বিরুদ্ধে যদি লড়াই চালানো না যায় তবে সেটা প্রকৃত

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই হয়ে উঠবে না। পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুঁজির আগ্রাসন। কিন্তু এটাই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। ওই সভ্যতার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তথাকথিত এনলাইটেনমেন্টের উপাদান যুক্তি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারনীতি প্রভৃতি; যাকে আমরা প্রগতিশীলতা বলে গণ্য করি। কিন্তু এই প্রগতিশীলতাকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের হানাদারি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পৃথক করে দেখার সুযোগ নেই। প্রগতিশীলতা ও পুঁজির আগ্রাসন একে অপরের পরিপূরক। তাই আমাদের দেশে যেসব প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, সংস্কৃতিক কর্মী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেও পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণমুগ্ধ, তারা একটা ভুলের মধ্যে বসবাস করছেন। মনে রাখা দরকার, পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প-সভ্যতার সঙ্গে লড়াইয়ে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণ হচ্ছে বামপন্থীরা পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করলেও পশ্চিমের হানাদারি সভ্যতার বিকল্প মডেল তৈরি করতে পারেনি।

ওই হানাদারি সভ্যতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কনজ্যুমারিজম। মাসমিডিয়ার বিজ্ঞাপনের কারিশমায় আজকাল ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সবাই কনজ্যুমারিজমের শিকারে পরিণত হচ্ছে। এরই প্রক্রিয়ায় কোক, পেপসি, ভিডিও, মিউজিক সিস্টেম, টি-শার্ট, জিনস, ফাস্ট ফুড, মোবাইল কালচার কৌশলে গড়ে তোলা হচ্ছে। ব্র্যান্ড নামের তলানিতে ঢেকে দেয়া হচ্ছে সবকিছুকে। বিশ্ব ব্র্যান্ডের সৃষ্টি করা হচ্ছে সচেতনভাবেই। দেশি ও বিদেশি পুঁজিপতিদের পণ্য সংস্কৃতির দাপটে আমরা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছি। আমাদের মনোজগতে উপনিবেশ ঘাঁটি গেড়ে বসছে। এ কারণেই বহুজাতিক মোবাইল কোম্পানিগুলো মাসমিডিয়ার সহযোগে আমাদের আজ দেশপ্রেম শেখাচ্ছে। অথচ এই বহুজাতিকরাই হাতিয়ে নিচ্ছে আমাদের কোটি কোটি টাকা। সাবেক এক অর্থমন্ত্রীর ভাষায়—ব্যাংকগুলো খালি করে দিচ্ছে মোবাইল কোম্পানিগুলো। আফ্রিকার ঔপনিবেশিক প্রভুদের সোনা হরণের কাহিনী আমরা শুনেছি। এখন বিশ্বায়নের কালে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মাসমিডিয়াকে কব্জা করে আমাদের নিঃস্ব করে দিচ্ছে।

পণ্য সংস্কৃতির আরো দু-একটি উদাহরণ দেই : রাধুনি নারী দিবস, প্রশিকা মধু, আড়ং, গ্রামীণ চেক, হালাল সাবান, ’২১-এর ফ্যাশনেবল টি-শার্ট, শাড়ি, সানসিল্ক বৈশাখী সাজ, বৈশাখী ঝড়ো অফার, হুলস্থুল অফার,

www.pathagar.com

ফাটাফাটি মূল্য হ্রাস, স্টার সার্চ, মেরিল-প্রথম আলো তারকা জরিপ, প্রতিভার খোঁজে, লাইফ স্টাইল লোন, যায়যায়দিন ভালোবাসা সংখ্যা, সিটি সেল সংবাদ শিরোনাম, গ্রামীণ ফোন তৃতীয় মাত্রা ... আরো কত কী? সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের এই ভোগবাদী সংস্কৃতি মানুষকে আজ করে তুলছে আত্মকেন্দ্রিক, একা, নিঃসঙ্গ, চিন্তাশূন্য। রাজনৈতিকভাবে সচেতনতা শূন্য ও সমাজ পরিবর্তনের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের। সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্যও তাই। কারণ সচেতনতাহীন জনগণই সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হাসিলে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে মনে হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মনন, চিন্তা এই পণ্য বিপণনকারী পুঁজিবাদী সংস্কৃতির কাছে বন্ধক দিয়ে ফেলেছি! না হলে একটি মুসলিম সমাজে নেসলে মা দিবস, বাবা দিবস পালিত হয় কী করে! পবিত্র কোরআনের শাশ্বত বাণী, 'তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি সদয় হও' অথবা রাসুল (সা.)-এর সেই বিখ্যাত হাদিস, 'মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত'-এসব কথার গভীর তাৎপর্য বাদ দিয়ে আমরা এখন পণ্য সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের কাছে আদব-কায়দার সবক নিচ্ছি! পণ্য সভ্যতার পীঠস্থান পশ্চিমা দেশগুলোয় বৃদ্ধ মা-বাবার অবস্থা কী হয় আমরা অনেকেই জানি। এদের শেষ পর্যন্ত ঠিকানা হয় বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে। ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে মা দিবস, বাবা দিবস, ক্রিস মাসে দয়া করে শুভেচ্ছা জানায়। এ দেশের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পরিবার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে শেষ পর্যন্ত আমরা কি এই পণ্য সংস্কৃতিকেই আবাহন করতে চলেছি? অন্যদিকে বাণিজ্যের প্রয়োজনে, নানারকম প্রগতিশীলতার আড়ালে এবং মাসমিডিয়ার অপকৌশলে যথেচ্ছভাবে নারী দেহ প্রদর্শিত হচ্ছে। ভোগ্যপণ্যে পরিণত হচ্ছে মানুষ। মানুষকে পরিণত করা হচ্ছে যন্ত্রে। ভোগবাদিতার সঙ্গে মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ছে পণ্য সভ্যতার নানা কায়দা-কানুন। বিশ্বায়নের যুগে মানুষ তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে পরিণত হচ্ছে পণ্য সভ্যতার দাসে। হরেকরকমের এনজিও, বহুজাতিক ও ভোগবাদী ধনিক শ্রেণীর টাকায় পরিচালিত ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্টিং মিডিয়া আমাদের প্রতিনিয়ত মস্তিষ্ক ধোলাইয়ে নেমেছে। আমরা প্রভাবিত হচ্ছি তাদের প্রদর্শিত পথে চলতে। এ যেন এক আসুরিক বর্বরতা।

www.pathagar.com

গ্রামীণফোনের মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন আর ব্যবসা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। এখন তারা দেশের শাসনব্যবস্থা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে নিজেদের পছন্দমতো চালনা করার দুঃসাহসও অর্জন করে ফেলেছে। রকসঙ্গীত নামে বিজাতীয় এক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে ডিজুস। তারা এ খাতে ব্যয় করছে কোটি কোটি টাকা। তারা কি এখন আমাদের সংস্কৃতির ভূগোল পরিবর্তন করে দিতে এগিয়ে আসছে না? আর কে না জানে, সাংস্কৃতিক ভূগোল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ভূগোলও পরিবর্তন হয়ে যায়। বহুজাতিকের আগ্রাসন, স্বেচ্ছাচারিতা এখন রীতিমত ঔদ্ধত্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে। অন্যদিকে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থাকে কলুষিত করে তুলেছে এই বহুজাতিক আর ভোগবাদী পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত হরেক রকমের মিডিয়া। এখানে আপনাকে শেখানো হচ্ছে জীবনযাপনের কৌশল, স্মার্ট হওয়ার কায়দা। নীতি-নৈতিকতার কোনো বালাই নেই। টিভিতে, সিনেমায় নিরন্তর দীক্ষা দেয়া হচ্ছে পরকিয়া, কিভাবে সন্তানরা বাবা-মার অবাধ্য হতে পারে তার কৌশল। আর সেটাকেই এখন বলা হচ্ছে আধুনিকতা, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে লড়াই। যখন গ্রামীণফোনের বিজ্ঞাপনে বন্ধুর টাকা মেরে দেয়ার কৌশল শেখানো হয় তখন একবারও ভেবে দেখা হয় না আমাদের সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক ঐতিহ্যের ব্যাপারগুলো। নব্য উপনিবেশবাদ উপগ্রহ প্রযুক্তিকে কব্জা করে ধেয়ে আসছে। দেশি-বিদেশি টিভি চ্যানেলগুলোতে আজ বিকৃত রুচির আমোদ ও মাদকের সমারোহ। মোবাইল ও ইন্টারনেট চ্যাটিংয়ের অপব্যবহার এক ধরনের বিকৃতিই এনে দিচ্ছে। পর্নো সাইটগুলোয় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে লাখ লাখ লোক। আমাদের সামাজিক ও নান্দনিক স্বকীয়তা এভাবে কতদিন ধরে রাখা যাবে? সাধারণত একটি সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীই নিজেদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের লালন করে থাকে। কিন্তু পণ্য সংস্কৃতির দাপটে সেই মধ্যবিত্ত এখন মূল্যবোধের জায়গা থেকে সরে এসে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাচ্ছে। মধ্যবিত্তের এই বিচ্যুতির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী অপ-সংস্কৃতিবাদীদের আওতা ও পরিধি প্রতিদিন বাড়ছে। এ মুহূর্তে মধ্যবিত্তের আলোচনায় অধিকাংশজুড়ে থাকে অধিক উপার্জনের প্রতিশ্রুতি বা প্রলোভন, ফ্লাট বাড়ি অথবা শেয়ার বাজার। কেন এরকম হলো? সবই কি অনিবার্য বিশ্বায়ন–পণ্য সংস্কৃতির

www.pathagar.com

ঢেউ? মধ্যবিত্তের ভাবনাচিন্তায় এখন সমাজ পরিবর্তন, মানুষের মুক্তি কিংবা মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের কোনো জায়গা অবশিষ্ট নেই।

বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম-প্রধান সমাজে ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই এই সামাজিক দূষণ ও অবক্ষয় প্রতিরোধের একমাত্র ওষুধ। পণ্য সংস্কৃতির কিংকররা তাই স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষা, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এক পরিকল্পিত ঘৃণা ছড়িয়ে চলেছে। আমাদের দেশে এখন এ প্রশ্নও উঠেছে, স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া সঙ্গত হবে কি না!

সেকুলারিজমের আড়ালে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করতে যাওয়ার পরিণামও আজ হাতে হাতে ফলতে শুরু করেছে। ভোগবাদী সংস্কৃতির যে রূপ আমরা দেখছি তা রীতিমত গা শিউরে দেয়ার মতো। দেশে এখন মানুষ হত্যা একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে গেছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক আর থাকছে না। পারিবারিক বন্ধনে শৈথিল্য, সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার উদাসীনতা, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের নেতিবাচক মূল্যায়ন, তরুণ-তরুণীদের বিকৃত সম্পর্ক, জ্ঞানার্জনের চেয়ে অর্থের পেছনে ছুটে চলার মানসিকতা আজ এক মহাদুর্যোগের অশনি সংকেত হয়ে দেখা দিয়েছে। পণ্য সংস্কৃতির রথী-মহারথীরা তাদের সাংস্কৃতিক হোমোজেনাইজেশন তত্ত্বের আড়ালে বিশ্বজুড়ে পশ্চিমা মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে চায়। কারণ এই সংস্কৃতি প্রসারের সঙ্গে বাণিজ্য বিস্তার, লুণ্ঠন ও আধিপত্যের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম হচ্ছে এই হোমোজেনাইজেশনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ ইসলাম করপোরেট পুঁজির সমর্থক নয়। পণ্য সংস্কৃতির আড়ালে ভোগবাদকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে মেনে নেয়ারও সে বিরোধী। এ কারণেই ইসলামকে মধ্যযুগীয়, বর্বর, জঙ্গি, সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে পশ্চিমা সভ্যতা আজ মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে একতরফা লড়াই শুরু করে দিয়েছে। এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তৃতীয় দুনিয়া থেকে নির্বাচিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালালরা, যারা পণ্য সংস্কৃতির দাপটে স্বকীয়তা জিনিসটা আগেই বিসর্জন দিয়ে ফেলেছে। বহুজাতিক পণ্যায়ন, আগ্রাসন, সাম্রাজ্যবাদের নীল থাবায় ক্ষত-বিক্ষত আত্মবিনাশক জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আজ ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। নিজস্বতা, আমিত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধকেন্দ্রিক জনসম্পৃক্ত এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনই এই মহাবিপর্যয়কে রুখে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

www.pathagar.com

পরিবেশগত সাম্রাজ্যবাদ

১.

দুনিয়াজুড়ে এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের অনভিপ্রেত কাজকর্ম ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে চলেছে। এ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির (Global Warming) প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে, বিভিন্ন স্থানে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পর্বত ও সমুদ্রের হিমবাহ গলতে শুরু করেছে এবং আবহাওয়ার মধ্যে চরম ভাবাপন্নতা দৃশ্যমান হচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান তলিয়ে যাবে। খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড় ও বন্যায় বিপর্যস্ত হবে আমাদের গ্রহ। ফসল উৎপাদন বিঘ্নিত হবে। পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের সঙ্কটসমূহ সম্ভাবনা হিসেবে হাজির হবে।

এসব কিছুই হচ্ছে গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য। গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন প্রভৃতি গ্যাসের নিঃসরণ বেশি মাত্রায় হয়, যা কিনা আবহাওয়ার পরিবর্তন ও ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ক্ষতির জন্য দায়ী। এই ওজোন স্তর আবার ভূ-পৃষ্ঠকে মহাকাশের বহু রকমের ক্ষতিকর রশ্মি ও কণা থেকে পৃথিবীকে ছাতার মতো রক্ষা করছে। অন্যথায় প্রাণের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠত।

জাতিসংঘের Intergovernmental Panel on Climate Change স্বীকার করেছে এ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী মূলত জীবাশ্মভিত্তিক জ্বালানি (Fossil Fuel)- তেল, গ্যাস ও কয়লার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এবং নির্বিচারে বনজঙ্গল খতম (Deforestation)। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন শিল্প বিপ্লবের আগে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। আজকের পশ্চিমা দেশগুলোকে কেন্দ্র করে যে শিল্পসভ্যতার পত্তন হয়েছে তার মূলে আছে এ জীবাশ্মভিত্তিক জ্বালানি। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে এবং গত শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এ তাপমাত্রা বৃদ্ধি বিজ্ঞানীদের চোখে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। পরিবেশের উপরে হাত দিলে কিংবা পরিবেশের প্রাকৃতিক নিয়মের

www.pathagar.com

কোনো ব্যতিক্রম ঘটলে মানুষের অস্তিত্ব যে সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠতে পারে এসব কথা প্রথম আন্দাজ করেছিলেন মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা। আল কিন্দি, কুসতা ইবনে লুকা, মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া রাজি, ইবন আল জাজ্জার, আল তামিমি, ইবনে সিনা, ইবন আল নাফিস প্রমুখের লেখালেখি থেকে স্পষ্ট হয়েছে পরিবেশের বিপর্যয় মানে মানবজাতির বিপর্যয়। তাই তারা বাতাস, মাটি, পানি এমনকি শব্দদূষণ যাতে না হয়, তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। মুশকিল হচ্ছে, আল্লাহর ওপর খোদকারি করে প্রকৃতির ওপর হানাদারি ও দখলদারি হচ্ছে আজকের জীবাশ্মভিত্তিক আধুনিক শিল্পসভ্যতার ধর্ম। ইউরোপের শিল্প বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত প্রগতিশীল শ্রেণীর কথা ফুরোয় না।

এই পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল ইউরোপের বিখ্যাত রেনেসাঁর ঘটনার ভেতর দিয়ে। তখন বলা হয়েছিল রেনেসাঁর ভেতর দিয়ে মানুষ আরও যুক্তিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক ও সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠবে। পশ্চিমের সেই সংস্কারমুক্ত মানুষের কর্মকাণ্ড আজ পৃথিবীকে এক মহাবিপর্যয়ের দিকে টেনে নিয়ে এসেছে। পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার কাছে লাভ ও লোভই হচ্ছে শেষ কথা। এদের মুনাফার তাগিদ এত বেশি যে তাদের কাছে আপাত বর্তমানই চূড়ান্ত। এরা ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। মানবজাতি যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাতেও এদের কিছু আসে যায় না। বহুজাতিক পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফার প্রয়োজনে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এ কারণেই তারা তেল, গ্যাস ও কয়লার নির্বিচার ব্যবহার করে প্রকৃতিতে যেমন মহাবিপর্যয় ডেকে আনছে, তেমনি তেল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দখলদারি নিয়ে দুনিয়াজুড়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ-হিংসা-রক্তপাতের মহড়া দিয়ে যাচ্ছে।

মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। খলিফা হিসেবে সৃষ্টি জগতের রক্ষা ও বিকাশের দায়িত্ব মানুষের। সেই রক্ষা ও বিকাশের দায় না নিয়ে একে ধ্বংস ও বিনাশ করার সঙ্গে যে বিরোধ আজ ঘটছে, সেখানে এসে মানবজাতির তাবৎ নীতি-নৈতিকতা থমকে দাঁড়িয়েছে। জীবাশ্মভিত্তিক এ হানাদারি পশ্চিমা সভ্যতা টিকিয়ে রেখে মানুষ ও প্রকৃতির মুক্তি আদৌ

www.pathagar.com

সম্ভব নয়। প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের দায় অপরিসীম। সে কারণে জীবাশ্মভিত্তিক পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার বিপরীতে নতুন এক প্রাণবান সভ্যতার উত্থান এ মুহূর্তে জরুরি হয়ে উঠেছে।

২.

জীবাশ্মভিত্তিক শিল্পসভ্যতা জেগে উঠেছে তেল, গ্যাস ও কয়লার বিভিন্ন রকম ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। তেল, গ্যাস, কয়লার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বড়-বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট, তেল শোধনাগার, পিভিসি ফ্যাক্টরি, প্লাসটিক ফ্যাক্টরি ও নানা রকম মেটাল ফ্যাক্টরি। এসব শিল্প স্থাপনাগুলো আজ বিশ্বজুড়ে একত্রে বাতাস, পানি, মাটি দূষণের জন্য দায়ী। এ ছাড়া মোটরগাড়ি থেকে নিঃসরিত গ্যাস অবিরত বায়ু দূষণ করছে। শিল্প কলকারখানা থেকে নিঃসরিত হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার-ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের মতো বিষাক্ত গ্যাস। এসব গ্যাস যেমন গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য দায়ী, তেমনি দায়ী এসিড ক্ষরণের জন্য। বিষাক্ত গ্যাসগুলো বাতাসের জলীয়বাষ্পের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অম্লজাত পদার্থ তৈরি করে, যা ভূপৃষ্ঠে নেমে এসে বৃক্ষ, জলজ প্রাণী ও মানুষের নানা অবকাঠামোর অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন করে তোলার ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে শিল্প কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যগুলো পানি ও মাটিকে দূষিত করে দিচ্ছে। এর ফলেও জলজ প্রাণী ও মাটির উর্বরতা হুমকির মুখে পড়ছে। এ মুহূর্তে পৃথিবীতে ৪০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন শিল্প বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই তৈরি করে ২৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। তেমনিভাবে পৃথিবীতে যতো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে তার এক-চতুর্থাংশের জন্য দায়ী যুক্তরাষ্ট্র, যার জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের বেশি হবে না। আবার এর সঙ্গে যদি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা দেশগুলোকে যুক্ত করি তাহলে দেখা যাবে উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থ ও নিঃসরিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য এরাই দায়ী। অন্যদিকে সবচেয়ে গরিব এক-পঞ্চমাংশ জনসংখ্যা যাদের আছে তাদের কাজের জন্য বাতাসে ছড়াচ্ছে

www.pathagar.com

মাত্র দুই-শতাংশ গ্যাস। সুতরাং পুঁজিবাদী দেশগুলোকেই এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দায় নিতে হবে এবং শিল্প কলকারখানার নিঃসরিত বর্জ্য ও গ্যাসের পরিমাণ কমাতে হবে।

কিন্তু শিল্পসভ্যতার অধিপতিরা তাতে রাজি নয়। কারণ কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে মানবজাতির কল্যাণে পরিবেশ দূষণ থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য তাদের একটুও আগ্রহ নেই। কারণ শিল্পসভ্যতা যে অবাধ কনজুমারিজমকে উস্কে দিচ্ছে, তাতে সেখানকার মানুষ এক উদ্দেশ্যবিহীন, নিষ্ঠুর ও অমানবিক ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ ভোগবাদের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার মানসিক বলটুকু আজ তাদের অবশিষ্ট নেই। এ আরামদায়ক জীবনের উপকরণ সরবরাহকারী শিল্পকারখানা যেমন তারাও বন্ধ হতে দিতে রাজি নয়, তেমনি পুঁজিপতিরাও তাদের উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করতে রাজি হবে না। মনে রাখতে হবে, শিল্পসভ্যতার সুবিধা ভোগকারী সংখ্যালঘু মানুষের আরাম-আয়েসের জন্য সংখ্যাগুরু মানুষের বাসস্থান, পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না। কর্পোরেট পুঁজির পাহারাদার আজকের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা হচ্ছে গোটা মানবজাতির শত্রু। এ শত্রুকে পরাস্ত করা ছাড়া মানবজাতির কোনো বিকল্প নেই।

কর্পোরেট পুঁজির অধিপতিদের নিষ্ঠুরতার এসব কথা আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। মুনাফার লালসায় এরা ইন্দোনেশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার আমাজান ও আফ্রিকার বনাঞ্চল ধ্বংস করে কাঠ বিক্রি করছে এবং পরিবেশের ওপর আঘাত হানছে। এসব এলাকার রেন ফরেস্টগুলো পৃথিবীর আবহাওয়া স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। মুনাফার জন্য এরা শুধু বনাঞ্চল ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, পৃথিবীর প্রাণবৈচিত্র্যের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে ফেলেছে। উচ্চফলনশীলতার নামে পুঁজিপতিরা এখন হাইব্রিড বীজ ও বিষাক্ত সার উদ্ভাবন করেছে। আগে আমাদের দেশেই প্রায় পনেরো হাজার রকমের ধান ছিল। এখন সেটা কমতে কমতে সাত/আটটায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফল হয়েছে দুটো। হাইব্রিড দিয়ে মুনাফাখোর কোম্পানিগুলো

www.pathagar.com

যেমন একদিকে প্রচুর বাণিজ্য করে নিচ্ছে, তেমনি কৃষককে পুরোপুরি কোম্পানিনির্ভর করে তুলেছে। আবার অন্যদিকে হাইব্রিড ও বিষাক্ত সার প্রয়োগে জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। এভাবে পুঁজিবাদীরা এমন এক টেকনোলজি নিয়ে এসেছে যেখানে আমাদের কৃষক, জনগণ ও রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্যদিকে এ টেকনোলজি আমাদের পরিবেশ নষ্ট করছে, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়াচ্ছে এবং বিষাক্ত সার প্রয়োগে মাছ মরে যাচ্ছে। তাই আমাদের প্রাণবৈচিত্র্যভিত্তিক এমন উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে হবে, যার ফলে সত্যিকারের ফলন বাড়বে। মাছও মরবে না, আবার কৃষকও পুঁজিপতিদের কৃপাধন্য হয়ে থাকবে না। পরিবেশ দূষণের অন্যতম আরেকটি কারণ হচ্ছে পরমাণু বর্জ্য। চেরনোবিল ও থ্রি-আইল্যান্ডের পারমাণবিক দুর্ঘটনা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে এর প্রতিক্রিয়া কত ভয়ানক হতে পারে। হিরোশিমা ও নাগাসাকির উদাহরণ তো আমাদের চোখের সামনেই আছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় পরাশক্তিগুলো প্রতিযোগিতামূলকভাবে পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পরও পুঁজিবাদী বিশ্ব পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা তো কমায়ইনি, বরং উত্তরোত্তর এর প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটিয়ে চলেছে। এর একটাই উদ্দেশ্য, পারমাণবিক অস্ত্রকে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকারে রেখে সারা পৃথিবীর মানুষের ওপর ছড়ি ঘুরানো, অন্যদিকে পৃথিবীর সম্পদ নির্বিচারে লুণ্ঠন। এদের অপরাধের মাত্রা এতদূর গড়িয়েছে ইদানীংকালের সব যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র ও গুলিগোলায় নিঃশেষিত ইউরোনিয়ামের (Depleted Uranium) ব্যবহার করছে। এর সুদূরপ্রসারি প্রভাব হলো বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র, গুলিগোলা যেখানে পড়েছে সেখানকার পরিবেশ বিপর্যয় তো ঘটছেই, আবার সেখানে বসবাসকারী মানুষ ভবিষ্যতে তেজষ্ক্রিয়তাজনিত দূরারোগ্য ব্যাধিতেও ভুগবে। আজকে ইরাকের সাধারণ মানুষ এরই প্রভাবে নানা রকম ক্যান্সারে ভুগতে শুরু করেছে। ভাবটা এমন–মিসাইলে মরো বা ক্যান্সারে তাতে কিছু আসে যায় না। এই হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা, যুক্তিবাদী সভ্যতার আসল চেহারা।

www.pathagar.com

৩.

পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার আগ্রাসী ক্ষুধা মেটাতে আজ পৃথিবীর মানুষ নতুন এক কেয়ামতের মুখোমুখি হয়েছে। এ সভ্যতার মহারথীরাই আজ পৃথিবীকে চালাচ্ছে। তাদের কারণেই আজ পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এই দূষণ জৈবিক ও নৈতিক উভয় অর্থেই। একদিকে নিজেদের অপকর্মের কারণে পশ্চিমের মহারথীরা পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের গুরুতর সংকট তৈরি করে ফেলেছে, অন্যদিকে সব রকমের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বর্জনকারী প্রকট মিথ্যুক এ সভ্যতা মানুষের এতকালের সব অর্জনকে পণ্ড করে দেয়ার জন্য উন্মাদের মতো হামলে পড়েছে। এদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ও স্বার্থপরতার জন্য পৃথিবীর মানুষ যেমন ডুবতে বসেছে, তেমনি তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমের এক গভীর ধর্ম বিশ্বাসী কবি টি এস এলিয়ট এ পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার সঙ্কটের দিকে ইঙ্গিত করে তার কবিতায় একে নামাঙ্কিত করেছিলেন Waste Land-নিষ্ফলা জমি। তার কাছে মনে হয়েছিল, এ সভ্যতা অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাচ্ছে। এর ভেতরে কিছু থাকছে না। এর থেকে উত্তরণের জন্য তিনি ধর্মের শাশ্বত মূল্যবোধগুলোর পুনরুজ্জীবনের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

পশ্চিমের যুক্তিশীল মানুষ এসব কথাবার্তাকে এতকাল হেঁয়ালি বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও আজ তার মূল্যকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না। পরিবেশ রক্ষার্থে, মানবজাতিকে বাঁচাতে, সভ্যতাকে ধরে রাখতে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করার কোনো বিকল্প নেই। এই ভোগবাদী, আত্মস্বার্থপর সভ্যতার বদলে এক ত্যাগশীল, সহানুভূতিপ্রবণ, মানবিক সভ্যতার উত্থানের প্রয়োজন। ধর্মের শাশ্বত মূল্যবোধগুলোকে মানুষের জীবনে ফিরিয়ে আনা গেলে সেটা সম্ভব হতে পারে। পশ্চিমের যুক্তিবাদী মানুষ ধর্মের শাশ্বত সত্যের চেয়ে আপাত সত্যের ওপর নজর দিতে গিয়ে মানবজাতিকে ধ্বংসের কিনারে এনে ঠেকিয়েছেন। মানবজাতির স্বার্থে আজ তাই পৃথিবীর তাবৎ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার লড়াইয়ে শরিক হতে হবে।

www.pathagar.com

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

১

আজকের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জগতজোড়া অত্যাচার ও আধিপত্যের মূল সূত্র খুঁজতে হলে যেতে হবে মার্কিন অতীতে। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মও সাম্রাজ্যবাদের উদরে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা এক সময় ইউরোপ থেকে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। কলম্বাস দিয়ে যার যাত্রা শুরু। কলম্বাসকে বলা হয় আমেরিকার আবিষ্কারক। ইতিহাসের অনেক সত্যই চাপা পড়ে গেছে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারণার তাণ্ডবে। কলম্বাসের আমেরিকা বিজয়ের কাহিনী এরকমই একটা অতিকথা – মীথ। আমেরিকা কখনোই জনশূন্য ছিল না। সেখানকার ভূমিপুত্র ছিল রেড ইন্ডিয়ানরা। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কুইনসি এ্যাডামসের ভাষায় তারা ছিল, 'essentially inferior to the anglo-saxon race' অতএব, 'as a race, not worth preserving' অতএব, 'their disappearance from the human family would be no great loss.'

অতএব, তারা আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। ইউরোপের 'সভ্য' ঔপনিবেশিকরা 'অসভ্য', 'বর্বর', রেড ইন্ডিয়ানদের গরু ছাগলের মতো মেরে খতম করে দিয়েছে।

আমেরিকার প্রথম দিককার প্রেসিডেন্ট জন কুইনসি এ্যাডামসের কণ্ঠস্বরের সাথে হালজামানার প্রেসিডেন্ট বুশের কথা-বার্তার একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় বৈকি। যিনি 'যীশুর প্রেরণায়' 'অসভ্য', 'বর্বর' ইসলামী জঙ্গিদের দমন করতে এক বিশ্বজোড়া 'অনন্ত যুদ্ধ' শুরু করে দিয়েছেন। আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষা সব সময় একই রকম।

আজকের যে মার্কিন সভ্যতা তার শুরুটা কিন্তু এভাবেই। তাই গণতন্ত্র, স্বাধীনতার বুলি মার্কিন নীতি বিশারদরা যত বেশি আউড়ানই না কেন, এমন জিনিসের প্রতি তাদের আন্তরিকতা আসলেই কতদূর সেটা একটা বড় প্রশ্ন। বিশেষ করে আজ জগতজোড়া মার্কিন আধিপত্যের যে চেহারা তা কিন্তু গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ব্যাপারে আমাদের মোটেই আশাবাদী করে না।

আমরা দেখেছি ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারীরা দাস ব্যবস্থা রক্ষা করতে যুদ্ধ করতেও পিছপা হয়নি। আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ কালো মানুষকে ধরে এনে ঔপনিবেশিকরা আমেরিকার মাটিতে ক্রীতদাস বানিয়ে দিয়েছে। আজও কালো মানুষদের অধিকার সেখানে সুরক্ষিত নয়। এতকাল পরে মার্কিনীরা একজন কৃষ্ণাঙ্গ

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে সত্য কিন্তু সেটা শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের অপরাধ আড়াল করার জন্য। শ্বেতাঙ্গদের সাম্প্রদায়িক পলিসির বাইরে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। মনে পড়ে সেই বিখ্যাত নিগ্রো কবির কবিতাঃ 'আমেরিকা, যেখানে স্বাধীনতা শুধুই স্ট্যাচু।'

ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক আগ্রাসন কিছুটা সোভিয়েট ইউনিয়নের কারণে বিরোধিতার মুখে পড়তো। কমিউনিজমের পতনের পর মার্কিন সামরিক কার্যকলাপ ও যুদ্ধাপরাধগুলো প্রায় নিরঙ্কুশ আধিপত্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এসব যুদ্ধাপরাধের তালিকা অনেক দীর্ঘ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হানাদারির কয়েকটি উদাহরণ ঃ চীন (১৯৪৪–৪৬), কোরিয়া (১৯৫০–৫৩), গুয়াতেমালা (১৯৫৪), ইন্দোনেশিয়া (১৯৫৮), কিউবা (১৯৫৬–৬০), গুয়াতেমালা (১৯৬০), কঙ্গো (১৯৬৪), পেরু (১৯৬৫), লাওস (১৯৬৪-৭৩), ভিয়েতনাম (১৯৬১–৭৩), কম্বোডিয়া (১৯৬৯–৭০), গুয়াতেমালা (১৯৬৭–৬৯), গ্রানাডা (১৯৮০), লেবানন (১৯৮৪), লিবিয়া (১৯৮৬), এল সালভাদর (১৯৮০), নিকারাগুয়া (আশির দশক), পানামা (১৯৮৯), ইরাক (১৯৯১–২০১১), আফগানিস্তান (২০০১–২০১১)।

এখানে উল্লেখ্য ১৮৯০ থেকে আজ অবধি আমেরিকা ১৩০ বার অন্যদেশে আগ্রাসন চালিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত ৬৫ বার অন্যদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে। এই সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে আমেরিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদে। কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যার জন্য দায়ী তাদের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। এই যাদের খতিয়ান তারাই আজ দুনিয়ার বুক থেকে 'ইসলামী সন্ত্রাসকে' মুছে ফেলবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু করেছে বলে বড় গলায় চেচিয়ে বেড়াচ্ছে।

কমিউনিজমের পতনের পর 'অনন্ত যুদ্ধ', 'প্যাক্স আমেরিকানা', 'বুশ ডকট্রিন', 'গ্লোবাল ওয়ার অন টেরর' প্রভৃতি যে সব কথা বার্তা আমরা শুনেছি তা হচ্ছে আমেরিকার উপনিবেশ দখলের নতুন সামরিক–রাজনৈতিক মতবাদ। ১৯ ও ২০ শতকে ব্রিটিশ, ফরাসি, স্পেনীয় বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক– সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ৫০, ১০০ বা ২০০ বছর ধরে আজাদী সংগ্রাম করে যে সব দেশ ও রাষ্ট্র পূর্ণ ও অর্ধ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাদের আজ আমেরিকা ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকাভূক্ত করে প্রি এমটিভ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে। যুদ্ধ, আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালিয়ে ঐ সমস্ত দেশে মার্কিন অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে মার্কিনীকরণের চেষ্টা চলছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন শাসককুল তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে নতুন কল্পিত শক্তি খাড়া করার বিষয়ে সচেতন হয়।

www.pathagar.com

'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র', 'অকার্যকর রাষ্ট্রের' ধারণা এরপরই তৈরি হয়। ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশকে মার্কিন বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যাতে এই সব দেশে আক্রমণের জন্য বিশ্বাসযোগ্য ভিত প্রস্তুত করা যায়। ইরাক, আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক আগ্রাসন বুঝিয়ে দিয়েছে যে কোন 'অবাধ্য' দেশেই এই পদক্ষেপ নেয়া হতে পারে। এসব দেশে আমেরিকার সামরিক আগ্রাসনের কারণ শুধু যে সেখানকার সম্পদ লুণ্ঠন তাই নয়, আমেরিকা চায় একটা পুতুল বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে। সেই ব্যবস্থায় নিজের স্বার্থে ও নিজের ইচ্ছে মতো যে কোন দেশ আক্রমণ করা, দখল করা ও পুণর্গঠন করার অধিকার আমেরিকার থাকবে। মার্কিন শাসককুলের গোপন অভিসন্ধি হচ্ছে, Christian people will rule the world.

সাম্রাজ্যবাদ এক অর্থে সাম্প্রদায়িকতাও এবং বর্তমান মার্কিন শাসককুল এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পুরোপুরি চালিত। এই কারণেই তারা সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব ফেরি করেছে এবং কমিউনিজমের পতনের পর ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিশানা করেছে। সবাই জানে সামরিক শক্তিতে মুসলিম দেশগুলো মার্কিন সামরিক শক্তির ধারে কাছেও নয়। তবুও ইসলামী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলছে অস্ত্র শান দেয়া। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় যেমন মার্কিন মতানুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল 'It is not Russian military power which is threatening us, it is Russian political power.' তেমন আজকের দিনে মুসলিম রাষ্ট্র নয়, মুসলিম ভাবাদর্শই হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্কিন শাসককুলের চিন্তার বিষয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের উত্তেজনার একটা বড় অংশ ছিল মার্কিন সরকার ও প্রচার মাধ্যম কর্তৃক সৃষ্ট। যেমনটি হান্টিংটন বলেছেনঃ You have to sell in a such way to create the misimpression that it is the Soviet Union that you are fighting. That is what the United States has done ever since Truman doctrine. ঠাণ্ডা যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরও এই প্রচারাভিযান কমেনি বরং বেড়েছে। এখন সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব ফেরি করে ইসলামের চরিত্র হনন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একটা পলিসি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২

১৯৪৫-এর ৬ আগস্ট হিরোশিমায় আণবিক বোমা ফেলে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করার পরও গভীর আত্মপ্রসাদে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুমান মন্তব্য করেছিলেন, অসামরিক লোকদের মৃত্যু এড়াবার জন্য আমরা অন্যত্র বোমা না ফেলে হিরোশিমার সামরিক ঘাঁটিতে বোমা ফেলেছি।

www.pathagar.com

হিরোশিমায় সেদিন আসলেই কি হয়েছিল এখন তা আর কারও অজানা নেই। আজ এতদিন পরও হিরোশিমার অবোধ শিশুরা কেন বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে অথবা ক্যান্সারের বীজ নিয়ে পৃথিবীতে আসে তাকি আর বেশি বুঝিয়ে বলার দরকার আছে।

তারপর হিরোশিমা থেকে ভিয়েতনাম ঘুরে আজকের আফগানিস্তান ও ইরাক। নাপাম বোমা, ক্লাস্টার বোমা, আরও কত নাম না জানা বোমার অভিঘাতে এই সব জনপদ বিধ্বস্ত হয়েছে কে বলবে।

আমেরিকার 'উজ্জ্বলতম' কুকীর্তিগুলোর মধ্যে এগুলো সামান্যমাত্র হিমশৈলের উপরিভাগ এবং এর সবটাই ঐ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী মানসিকতা সম্পন্ন– এ কথা বলে বোঝানোর দরকার নেই। এক সময় এদেশের মার্কিন ভক্তজনের মুখে শোনা যেত ১৮ ও ১৯ শতকের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের মতো আমেরিকা কখনো উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেনি। ব্যতিক্রম ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও পোর্ডোরিকা। তখনকার মতো হয়তো কথাটা কিছু সত্য ছিল কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে এখন মনে হচ্ছে আমেরিকা আবার ১৮ ও ১৯ শতকের সাম্রাজ্যবাদ নতুন করে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। উদাহরণ আফগানিস্তান ও ইরাক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে উপনিবেশ বিরোধী আজাদী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গতানুগতিক রাজনৈতিক ঔপনিবেশিকতার দিন শেষ হলেও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের ধারণা তখন থেকেই ভালো মতো উঠে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তখন থেকে এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবেই ধরা হয়। নানাবিধ কারণে মার্কিন প্রেমে যারা অন্ধ তারা মানতে না চাইলেও এই আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক আধিপত্যবাদের জিঘাংসায় সাম্প্রতিক ইতিহাসে সারা পৃথিবীর এত মানুষকে এত বেশি মূল্য দিতে হয়েছে তার কথা বোধ হয় লিখে শেষ করা যাবে না। হাইতি, সোমালিয়া, সুদান, নাইজেরিয়া, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডাসহ আফ্রিকার দেশগুলো, এল সালভেদর, গুয়াতেমালা, চিলি, নিকারাগুয়াসহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর ইতিহাস এখনও তাজা রয়েছে। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার অনেক দেশেই আজ চলছে সন্ত্রাস ও হত্যার উৎসব। নেতৃত্বে আছে কোথাও প্রত্যক্ষ মার্কিন সেনা, কোথাও মার্কিন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সামরিক শাসক, আবার কোথাও মার্কিন মদদপুষ্ট 'গণতান্ত্রিক' উপায়ে নির্বাচিত শাসকদল। কোথাও, কোথাও নির্বাচিত সরকারকে মার্কিন স্নেহধন্য সামরিক বাহিনীর সাহায্যে বল প্রয়োগ করে ভেঙে দেয়া হয়েছে যেখানে ঐ সরকারের গৃহীত নীতি মার্কিন শাসককুলের মর্জি মত হয়নি। আবার কোথাও কোথাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অদম্য তাগিদে মার্কিন প্রভাবে অনুষ্ঠিত হয় 'অবাধ

www.pathagar.com

নির্বাচন'। যেমন পানামা, এল সালভেদর, ইরাক, আফগানিস্তান। বিরোধী নেতা ও কর্মীদের বৃহদংশই ভোটের আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। আতঙ্কগ্রস্ত সাধারণ মানুষ অনেকাংশেই ভোট দেয়ার সুযোগ পান না।

মার্কিন গণতন্ত্র প্রিয়তার নজীর আরো দেখা যাবে চিলিতে CIA'র প্রত্যক্ষ মদদে খুন হন সালভেদর আলেন্দে। খুন করা হয় আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বাকে। এমনকি বিপদজনক মনে হলে CIA নিজের মিত্রকেও খুন করতে পিছপা হয় না। উদাহরণ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক। মার্কিন গণতন্ত্রপ্রিয়তা ও সন্ত্রাসবিরোধিতার পিছনে তার নিজস্ব স্বার্থের তাগিদই প্রবল। বহুচর্চিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ একটি নজির: ইসরাইল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও গণবিধ্বংসী অস্ত্রসজ্জা দুই নিরিখেই, ইসরাইলের তুলনা নেই। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের তকমা দেওয়া দূরে থাক, ইসরাইল বরাবরই ওয়াশিংটনের নয়নের মণি। সেই সব রাষ্ট্রই সন্ত্রাসী তকমায় ভূষিত হয়, যারা মার্কিন স্বার্থের বিরোধী বা বিরোধী হয়ে উঠতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার গরিব দেশগুলোর উপর বহুকাল থেকে শোষণ নির্যাতন চালিয়ে আসছে। তথাকথিত উন্নত বিশ্বের যে জৌলুস তার পিছনে কিন্তু এই সব গরিব দেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠনের দীর্ঘ বেদনাজড়িত ইতিহাস লুকিয়ে আছে। মার্কিনী বা তথাকথিত উন্নতবিশ্বের যে উদারহস্ত সাহায্য যা গণমাধ্যমে বিপুলভাবে প্রচারিত হয় তার অধিকাংশই কিন্তু নীলকরদের দাদন দেয়ার মতো। সাহায্যের বিনিময়ে অধিকাংশ কেনাকাটাই বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয় আমেরিকার কাছ থেকে। মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সেই সূত্রে পেয়ে যায় বিশ্বব্যাপি বাজার। বহুল প্রচারিত মার্কিনীদের Food for Peace Programme এর লক্ষ্যও একই রকম। পরিশেষে অবস্থাটা দাঁড়ায় 'সাহায্যপ্রাপ্ত' দেশগুলো খাদ্যের জন্য পুরোপুরি আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে যায় এবং দেশটির অর্থনীতি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

একটি কথা আছে: আমেরিকা যার বন্ধু হয়, তার শত্রুর প্রয়োজন হয় না। যারাই বন্ধু ভেবে আমেরিকার হাত ধরেছে তাদেরকে আমেরিকার নির্দেশ মতো খেলতে হয়েছে। একটা উদাহরণ দেই: ব্রাজিল বৃহৎ দেশ। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ– যার অনেক কিছুই লুণ্ঠন করেছে আমেরিকা। এই দেশটি আমেরিকার হাত ধরেছিল। এখানকার অধিকাংশ মানুষ আজ হতদরিদ্র। ক্রমাগত আমেরিকান সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে করে জমিগুলো উর্বরতা হারিয়েছে। দুর্ভিক্ষের অবস্থা বহুদিন ধরে চলছে ব্রাজিলে। ক্রমাগত অপুষ্টির কারণে নতুন ধরনের কিছু মানুষ পাওয়া যাচ্ছে যাদের মস্তিষ্কের আয়তন ছোট হয়ে গেছে। শিশুরা অপুষ্টির শিকার।

www.pathagar.com

খবরের কাগজে পড়েছিলাম সামরিক বাহিনী শয়ে শয়ে শিশুকে হত্যা করেছে। অনেকেরই দেহযন্ত্র মৃত্যুর আগেই খুলে চালান হয়ে যায়। দেহযন্ত্রের ব্যবসা ওখানে রমরমা। ক্ষুধার্ত শিশুরা ধরেছে নতুন নেশা- আঁটা শোকা-Glue Sniffing- এতে কিছুক্ষণ ক্ষিধে আটকে রাখা যায়। দেশের নামগুলো বদলে নিলেই হলো। পানামা, নিকারাগুয়া, গুয়াতেমালা, এল সালভেদর, নাইজেরিয়া। পাকিস্তানও আমেরিকার হাত ধরেছিল। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় ভারত-পাকিস্তানের কার্ড ব্যবহার করে আমেরিকা পাকিস্তানকে ভালোমতো ব্যবহার করেছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির পর পাকিস্তানের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে আমেরিকার কাছে। আজকের পাকিস্তানে যে সন্ত্রাস ও সহিংসতার রমরমা তা কি আমেরিকার সখ্যে পরিণত হওয়ার কিছুটা কর্মফল নয়?

অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র দেশগুলো কখনোই আমেরিকার হাত ধরে এগুতে পারেনি। আর আমেরিকার হাত ধরা মানে মার্কিন অর্থনৈতিক নীতি শিরোধার্য করা। আমেরিকা গ্যাটচুক্তিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক শর্তাবলী বার বার লংঘন করেছে। পাশাপাশি সেই সব বাণিজ্য নীতিগুলো যার অধিকাংশই প্রথম বিশ্বের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরিকল্পিত হয়েছে তা জোর করে বলবৎ করার জন্য গরিব দেশগুলোর উপর আমেরিকা ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। মার্কিন বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্যটা বুঝার জন্য ক্লিনটন জামানার Treasury Secretary লয়েড বেন্টসেনের মন্তব্যটি যথেষ্ট বলে মনে হয়: I'm tired of a lavel playing field. We should till the playing field for US business.

আমেরিকার বাণিজ্যিক মহলের কথা হচ্ছে এখন আমেরিকার উচিত দুনিয়াব্যাপি একটা Security Market তৈরি করা, যেখানে সব দেশ চড়া অর্থের বদলে আমেরিকার কাছ থেকে 'নিরাপত্তা' কিনতে বাধ্য হবে। এসব কথা শুনলে ভাড়াটে গুণ্ডার মত শুনাবে।

দুনিয়ার একচ্ছত্র নিয়ন্তা (?) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের দেশের বাতিল প্রযুক্তি, দ্বিতীয় শ্রেণীর সমরাস্ত্র, নিষিদ্ধ ওষুধ ও রাসায়নিক দ্রব্য তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোতে যেভাবে বেচে যাচ্ছে সেতো বহুচর্চিত প্রসংগ। আবার এখন দুনিয়াব্যাপি যেভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে ও পরিবেশ বৈচিত্র্যের সংকট দেখা দিচ্ছে তার পিছনে আমেরিকা তথা ধনবাদী দেশগুলোর অবদানই বেশি, তাও তো বহুল আলোচিত বিষয়।

এমতাবস্থায় আমেরিকার দুহাত জড়িয়ে ধরার আগে একটু ভাবার দরকার আছে। বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার রাজনীতিকরা যারা আমেরিকার শাসককুলের 'গুড

www.pathagar.com

বয়' সার্টিফিকেট নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর তাদের ঘুম ভাঙবার দরকার আছে বৈকি।

৩

বুশ প্রশাসন ক্ষমতায় থাকাকালে পেন্টাগনে 'জয়েন্ট ভিশন ২০২০' নামে এক দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশল নেয়া হয়েছিল। এই কৌশল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজও ফিরে আসেনি। এই কৌশলের নাম দেয়া হয়েছিল, –Full Spectrum Dominance– দিগন্তব্যাপি প্রাধান্য। এর অর্থ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে বা অন্যান্য বহুজাতিক সংস্থা বা এজেন্সির সাহায্যে যে কোন প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে ও যে কোন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সব রকমের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে। এই দলিলে আরো আছে: বিশ্ব জুড়ে আমাদের স্বার্থরক্ষা ও দায়িত্ব পালনের পরিধিকে স্মরণ রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই বিদেশের মাটিতে তার ফৌজকে উপস্থিত রাখতে হবে এবং অত্যন্ত দ্রুত বিশ্ব জুড়ে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এর মাধ্যমেই দিগন্তব্যাপি প্রাধান্যের তত্ত্ব কার্যকরী হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই জঙ্গি রূপটি আজকে আমাদের কাছে পরিষ্কার। সাম্রাজ্যবাদী ঐ হিংসার আগুনে আজ চারদিক জ্বলে উঠেছে। মার্কিন আধিপত্যবাদের যে চেহারা এখন দেখা যাচ্ছে তাতে বিশ্বসমাজের বহুত্ব, বৈচিত্র্য ও একমডেশন বলে কিছু থাকবে কি? ২০০১ সালের ২০ সেপটেম্বর মার্কিন কংগ্রেসের যুগ্ম অধিবেশনে দেয়া বুশের সেই ঘোষণা বহুচর্চিত ও বহুনিন্দিত হলেও আজও স্মরণীয়: Every nation, in every region, now has a dicision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.

এই ঘোষণার ঔদ্ধত্য, নির্বুদ্ধিতা ও অন্যায় নিয়ে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। কিন্তু ঘোষণাটির আসল তাৎপর্য এইখানে, এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ভয়ংকর বিপদকে ডেকে আনছে, বস্তুতঃ অবশ্যম্ভাবী করে তুলছে। সর্বগ্রাসী আধিপত্যের বিরোধিতা সব সময় প্রকাশ্য ও সুস্থ না হয়ে গোপন, কুটিল ও সর্বনাশা সন্ত্রাসের দিকে ধাবিত হয়। আজকের বিশ্বব্যবস্থা কি সেরকমই ইংগিত দিচ্ছে না। মার্কিন নীতির এই উত্তরোত্তর প্রকট হতে থাকা আধিপত্যবাদের অনৈতিকতা বা অন্যায় নিয়ে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। জাত পাত সংস্কৃতি নির্বিশেষে তামাম দুনিয়ার বিবেকবান মানুষেরা এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে মানুষের এতকালের অর্জন ধরে রাখা যাবে না। মানব প্রজাতির সুস্থ ভবিষ্যতের জন্যই আজ মার্কিন নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

চীনা সাম্রাজ্যবাদ

১

আমার এক পরিচিত উইঘুরের নাম হচ্ছে কুলসুম। তার সাথে দেখা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। এতদিন হয়ে গেছে তাকে ভুলতে পারিনি। সন্ত্রাস, অরাজকতা, মৃত্যু আর ধ্বংসের মাঝে সে কি বেঁচে আছে? বেঁচে আছে তো? তার গর্বের, সৌন্দর্যের মাতৃভূমি পূর্ব তুর্কিস্তান আজ পদানত– নিরাপত্তাহীনতা, আতংক আর ক্রোধে ফুসছে এই দেশ।

কুলসুম ছিল সিনকিয়াং ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপিকা। সে মেলবোর্নের ভিকটোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট ডক করতে এসেছিল। সে আমাকে নিজ হাতে উইঘুরদের প্রিয় খাবার গুইশনান আর লেহেরমান পাক করে খাইয়েছিল। সে কি তার স্বাদ, ভুলবার নয় মোটেই। এই কুলসুমের মুখ থেকেই প্রথম শুনেছিলাম উইঘুরদের আজাদী সংগ্রামের কথা, স্বাধীন পূর্ব তুর্কিস্তানের কথা আর মজলুম উইঘুরদের উপর চীনাদের জুলুমবাজীর মর্মন্তুদ সব ঘটনা। কুলসুম হচ্ছে চীনের প্রধান সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী উইঘুরদের প্রতিনিধি। তুর্কী ভাষাভাষী এই এথনিক গোষ্ঠীর সবাই হচ্ছে মুসলমান। চীনের পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া বরাবর বিরল বসতি পাহাড়ী এলাকায় প্রায় ১২ মিলিয়ন উইঘুরদের বাস। এ ছাড়া কাজাখ ও কিরগিজসহ তুর্কী ভাষাভাষী অন্যান্য কয়েকটি এথনিক গোষ্ঠীও এখানে আছে। ধর্মে এরাও মুসলমান। এই উইঘুররা চীন থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন পূর্ব তুর্কিস্তান গঠন করতে চান। এদের যুক্তি, ধর্ম–সংস্কৃতি–ভাষা কোন দিক থেকেই চীনাদের সাথে তাদের মিল নেই। এই পৃথক হওয়ার চিন্তাটাই স্বাধীনতাকামী উইঘুরদের জন্য হয়েছে কাল। চীনা কর্তৃপক্ষ প্রাণপণে উইঘুরদের এই আন্দোলন শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করছে। স্বাধীনতাকামীদের উপর প্রাণদণ্ড থেকে কারাবাস, নানা রকমের পুলিশী হয়রানী, মধ্যরাতে দরজায় বিশেষ বাহিনীর আঘাত, তারপর লাপাত্তা হয়ে যাওয়ার কাহিনী শোনা যাবে প্রাচীন সিল্ক রুটের লাগোয়া নানা গ্রাম থেকে শহরে। সে কাশগড়ই হোক বা হোটান, বিশাল সিংকিয়াং প্রদেশের জনপদগুলোতে বিশেষতঃ সংখ্যাগুরু উইঘুরদের মহল্লায় মহল্লায় ভীতি আর অজানা অনিশ্চয়তা এখন কান পাতলেই শোনা যায়।

www.pathagar.com

উইঘুরদের দেশান্তরিত নেত্রী রাবেয়া কাদির সম্প্রতি অভিযোগ করেছেন এক রাতেই ১০,০০০ উইঘুর নিখোঁজ হয়েছে। রাবেয়া নিজে জেল খেটেছেন। তার জেল জীবনের দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে লেখা 'ম্যান্ডারিন ফাইটার' এখন পশ্চিমা জগতে রীতিমত বেস্ট সেলার।

কুলসুমই আমাকে বলেছিল সিংকিয়াং-এর আজাদীর লড়াই বহুদিন ধরে চলছে। সে 'হাজাত' শব্দটি উচ্চারণ করেছিল নিষিদ্ধ বস্তু পাচার করার ভঙ্গিতে। তুর্কী শব্দটির অর্থ জেহাদ বলে স্থানীয় মানুষেরা জানে। চীনা আধিপত্যের বিরুদ্ধে উইঘুররা প্রকৃতই এক দীর্ঘ হাজাতে জড়িয়ে পড়েছে। বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, দাঙ্গা চলছে- প্রতিনিয়ত। মানুষ প্রাণ দিচ্ছে বেশুমার। ধরে ধরে স্বাধীনতাকামী উইঘুরদের নিয়ে বিচার ছাড়াই চীনা নিরাপত্তা বাহিনী গুলী করে মেরে ফেলে। সে সব খবর আমরা পাই না। চীন সরকার পারতপক্ষে কোন সাংবাদিকদের সিংকিয়াং-এ যেতে দেয় না। নিজেরাও স্পষ্ট কিছু বলে না। উইঘুররা মুসলমান হওয়ায় চীনাদের এখন পোয়াবারো। 'মৌলবাদী', 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে তাদের নিশ্চিহ্ন করা সহজ হয়ে উঠেছে। যেখানেই মুসলমানরা আজ স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয় রক্ষার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে সেখানেই 'মৌলবাদী' ফ্যাক্টর খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে।

যে লড়াই একটা এথনিক মাইনরিটির আত্মপরিচয় রক্ষার লড়াই, যেটি কিনা একটা মজলুম জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই সেটিকে কিনা ধর্মীয় মৌলবাদ বলে চালানো হচ্ছে। ৯/১১'র ঘটনার পর থেকে বিশ্ব ব্যবস্থার যে মৌল পরিবর্তন হয়েছে তার চরিত্র হচ্ছে ইসলাম বিরোধী এবং নির্বিচারে যাবতীয় সমস্যার জন্য ইসলামকে কষে গাল দেয়া। উইঘুরদের সমস্যা ৯/১১'র ঘটনার চেয়ে বহু পুরনো। যেমন মিন্দানাওয়ের মরো মুসলিম, দক্ষিণ থাইল্যান্ডের কারেন মুসলিম, বার্মার আরাকান মুসলিম এবং ভারতের কাশ্মিরের মুসলিমদের সমস্যার সাথে ৯/১১'র ঘটনার কোন জোড় নেই। এসব সমস্যা তৈরি হয়েছে জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠীর অধিপত্যের কারণে। 'মৌলবাদী', 'প্রতিক্রিয়াশীল' ইত্যাদি আকথা-কুকথা বলে মজলুম মানুষের স্বাধীনতার আন্দোলনকে নির্মূল করার চেষ্টা হচ্ছে আর কি; যাতে উইঘুররা, কারেনরা, মরোরা আর কখনো স্বাধীনতার আওয়াজ না দিতে পারে। সিনকিয়াং-এ উইঘুররা ক্রমশ সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছেন। সিনকিয়াং-এ মূল চীনের হান জনগোষ্ঠীর মানুষ হু হু করে ঢুকে পড়ছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম-সংস্কৃতি আজ হানদের

www.pathagar.com

দাপটে বিপন্ন হয়ে উঠেছে। এ অনেকটা মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ান শ্লাভ জনগোষ্ঠীর মস্কো প্রণোদিত অভিবাসন ও রুশীয়করণের মতো। সিনকিয়াং-এ চলছে এক ধরনের চীনাকরণ। যাবতীয় কলকাঠি নাড়া হচ্ছে সুদূর বেজিং থেকে। মাও সেতুঙের শতফুল সিনকিয়াং-এ ফোটেনি। ঔপনিবেশিক জাতিদ্বেষী রাষ্ট্রের মতো সংখ্যালঘু উইঘুরদের উপর চলছে দমন পীড়ন। ফায়ারিং স্কোয়াড দিয়ে সেখানে সমাজতন্ত্র রক্ষা করা হচ্ছে।

কুলসুম আমাকে বলেছিল তালেবান জামানার আফগানিস্তান কিংবা আফ্রিকার গৃহযুদ্ধ পীড়িত দেশগুলোর কথা শুনে আমরা আতকে উঠি। কিন্তু এরকম দৃশ্য সিনকিয়াং-এ অহরহ ঘটছে। সিনকিয়াং আজ চীনের কাশ্মীর, বধ্যভূমি। সাম্রাজ্যবাদ বলতে আমরা শুধু পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদকেই বুঝি। কিন্তু উইঘুরদের জন্য চীন, আর কাশ্মীরিদের জন্য ভারতই গলার কাটা– বড় সাম্রাজ্যবাদ।

২

সিনকিয়াং হচ্ছে চীনের বৃহত্তম প্রদেশ। দেশের মোট এলাকার এক ষষ্ঠাংশ জুড়ে রয়েছে এটি। এর মাটির নিচে রয়েছে কয়লা খনিজতেলসহ বিপুল সম্পদ। প্রাচীন সিল্ক রুট বা মধ্য এশিয়ার সাথে সিনকিয়াং বা পূর্ব তুর্কিস্তানের এথনিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক আত্মীয়তা বহুদিনের। ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক কারণেই এটা হয়েছে। বিভিন্ন উপজাতীয় খানরা বিভিন্ন সময় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাঞ্চু রাজারা পূর্ব তুর্কিস্তান বা সিনকিয়াং দখল করেন। মধ্য উনিশ শতকে জেনারেল তাশো চীনা কর্তৃত্ব কার্যকরী করতে ব্যবস্থা নেন। তিনি নাম দেন সিনকিয়াং বা নতুন অঞ্চল। আমরা যাকে বলি মহাচীন তা হলো মাঞ্চু রাজত্বের ফল। মাঞ্চু রাজারা বর্তমান চীনের সীমানা গড়েছেন। সিনকিয়াং ছাড়াও তারা জয় করেছিলেন তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া। মাঞ্চুদের উদ্ভব হচ্ছে চীনের মাঞ্চুরিয়া এলাকা থেকে। এদের এক রাজা খাস চীন দখল করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং মাঞ্চু রাজারা মহাচীন শাসন করে ১৯১২ সাল পর্যন্ত। মাঞ্চু আর হান চীনারা এখন প্রায় এক হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। চীনের অধিকাংশ অধিবাসী হচ্ছে 'হান'। চীনের ইতিহাস ও সভ্যতা বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তা প্রধানত এই হান চীনাদেরই সৃষ্টি। এদের ভাষা হচ্ছে ম্যান্ডারিন। কিন্তু হান চীনাদের সাথে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সদ্ভাব সম্ভব হয়নি। যেমন তিব্বতীরা এখন দাবী করছে চীন থেকে পৃথক হওয়ার। যাই হোক মাঞ্চু রাজত্বের সময় সিনকিয়াং-এর

www.pathagar.com

মুসলিমরা স্বাধীনতার জন্য ৪২ বার বিদ্রোহ করেন। ১৮৬৩ সালে একবার মাঞ্চুদের হটিয়ে দিতেও সক্ষম হন তারা। ১৮৭৬ সালে চীনা বাহিনী ফের আক্রমণ করে এবং ১৮৮৪ সালে সিনকিয়াং পুনর্দখল করে।

ঐতিহাসিকদের হিসাবে তুর্কী ভাষাভাষী উইঘুর জনগোষ্ঠী ছাড়াও খাস চীনের হুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের প্রসার ঘটে। হুই মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা পারস্য, সিরিয়া, ইরাক, আনাতোলিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে চীনে এসেছিল নানা পেশাগত কারণে। চীনে এরা বিয়ে করে হান কন্যা। কিন্তু হানদের সাথে এরা এক হয়ে যায়নি। এরা হানদের মতো ম্যান্ডারিন বা চীনা ভাষায় কথা বললেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায়ে রেখেছে। হুইরা প্রধানত বাস করে চীনের কানসু প্রদেশে। এ ছাড়াও চীনে ছোট বড় আরো ১০টি প্রধান এথনিকগোষ্ঠী আছে যারা ইসলাম ধর্মালম্বী।

৬৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঙ বংশের রাজত্বকালে চীনে ইসলামের বিকাশ ঘটে এবং চাঙ এলাকায় প্রথম মসজিদ তৈরি হয়। রসূলের সাহাবী সাদ বিন আবি ওক্কাস চীনে যান। সেখানে তার কবর আছে। তারপর দলে দলে ইসলাম প্রচারকরা যান রসূলের সেই বিখ্যাত হাদীস অনুসরণ করে: 'জ্ঞান সাধনার জন্য প্রয়োজনে চীনেও যাও।'

ইতিহাসের একটা সময়ে চীনা শাসকদের সাথে মুসলিম শাসকদের ভালো রকমের সদ্ভাব ও বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল। ৭৫১-৭৫৪ সালে চীন সম্রাট শুয়ান-সুঙের বিরুদ্ধে দক্ষিণ পশ্চিম চীনের এক সামন্ত প্রভু বিদ্রোহ করেন। তাকে সামলাতে চীন সম্রাট বাগদাদে খলিফা আল মনসুরের কাছে সৈন্য চেয়ে পাঠান। খলিফা মঙ্গোলিয়া থেকে ৪০০০ উইঘুর যোদ্ধা এবং মধ্য এশিয়া থেকে আরব যোদ্ধাদের একটি বাহিনী পাঠান। চীন সম্রাট গদি রক্ষায় কৃতজ্ঞ হয়ে মুসলিমদের চীনা মহিলা বিবাহের অনুমতি দেন। সেই প্রক্রিয়া চলে দীর্ঘদিন ধরে।

এই সামাজিক মেলামেশার যুগে মুসলমান ও হানদের মধ্যে পোষাক, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতির সাথে একটা দেয়া নেয়ার ছবিও দেখা যায়। কয়েকজন মিঙ সম্রাট ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম অনুরক্ত হয়ে পড়েন বলে ঐতিহাসিকদের দাবী। সুঙ জামানায় চীনা আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় মুসলমানদের বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু মাঞ্চু জামানায় এই মিলনের ছবিটা বদলে যায়। রাজশক্তির সঙ্গে মুসলিমদের সংঘাত বাধে। মাঞ্চু শাসন ছিল আসলে হানদের শাসন। পরবর্তী কালে ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরও এই হান আধিপত্যের জোয়ালে আটকে আছে উইঘুররা।

www.pathagar.com

মাঝখানে ১৯৩৩ সালে সামান্য সময়ের জন্য সিনকিয়াং-এর কাশগড়ে স্বাধীন পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক রিপাবলিক গঠিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর ১৯৫৪ সালেও হোটানে এমনই একটা অভ্যুত্থান ঘটে। মাঝে কুওমিনটাং জামানায় কুলঝা ও ওয়াইলিতে আধা স্বায়ওশাসনের সুযোগ পায় উইঘুররা।

মাও সেতুঙ বলেছিলেন চীনের কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে প্রতিটি জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস চীনা কমিউনিস্টরা যেই নীতি ঘোষণা করেছিল তা কখনো মেনে চলেনি। চীনের মুসলিমদের সমস্যা সমাধান হওয়ার তুলনায় তার তীব্রতাই বেড়েছে। রুশ বিপ্লবের রূপকার লেনিনও মধ্য এশিয়ার মুসলিম জাতিসত্ত্বাগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলেছিলেন। কিন্তু কমিউনিজমের নামে সেখানে চেপে বসেছিল গ্রেট রাশিয়ান শভিনিজম। মধ্য এশিয়ার মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের তৈরি জাদিদ আন্দোলন কিংবা বাচমচি বিদ্রোহ যেভাবে কমিউনিস্টরা দমন করেছিল তা কিন্তু জার শাসিত রাশিয়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সমাজতন্ত্র যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল জাতীয় রাষ্ট্রের শৃঙ্খল ভেঙে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বাগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ করেনি। মাওয়ের জীবদ্দশাতেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় অসংখ্য মসজিদ ও বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। সিনকিয়াং এ এখন মসজিদ ও ধর্মস্থানগুলোকে সরকারিভাবে নথিভূক্ত হতে হয়। কুলসুম বলেছিল কেউ যদি নামাজ ও রোজা পালন করতে চায় তাহলেও তাকে সরকারিভাবে নথিভূক্ত হতে হয়। সরকার ইসলামিক পোষাক পরায় আপত্তি করে। মুসলিম সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যারা ঐতিহ্যে বিশ্বাসী তাদের হয়রানী ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়। সরকার বিরোধী ইমাম, মৌলভী ও আলেমদের আটক করা হয়। সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার মতই ইসলামকে আটকাতে 'দেশপ্রেমিক ইসলামের' এক তত্ত্ব খাড়া করেছে চীনা কমিউনিস্টরা। ইসলামের মত এক বিশ্বধর্মকে জাতীয় রাষ্ট্রের বা শাসকদলের প্রয়োজনে কাটাছাড়ার মতো মূর্খতা আর কি হতে পারে। আসলে বস্তুবাদী বা নাস্তিকতাবাদী চেতনা মুসলমান জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেয়ার ভ্রান্ত নীতি আখেরে সমাজতন্ত্রের জন্য যে কোন শুভ ফল বয়ে আনেনি তাতো আমরা নিকট ইতিহাস থেকেই দেখেছি।

চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সমস্যা হলো একটা বহুজাতিক, বহুভাষিক সমাজকে জাতীয় মনোলিথিক রাষ্ট্রের আধারে পুরে ফেলার চেষ্টা করছেন তারা, যা মুসলমান সংখ্যালঘুরা মানতে রাজী নন। এখানে ধর্ম ছাড়াও বিচ্ছিন্নতাবাদের ঐতিহাসিক,

www.pathagar.com

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উৎসগুলো চীনারা চেপে যেয়ে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মতো এটির একটা মৌলবাদী রং দিতে চায় তারা। এর একটাই উদ্দেশ্য উইঘুরদের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে পণ্ড করে দেয়া এবং বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা।

সিনকিয়াং-এর রাজধানী উরুমচিতে হান চীনাদের সাথে উইঘুরদের যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে এই। হানরা সিনকিয়াং দখল করে ফেলছে অর্থনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে। তারাই পাচ্ছে চাকরি। ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ। হান চীনারা হয়ে উঠেছে সিনকিয়াং-এ উপনিবেশকারী। উইঘুররা হয়ে উঠেছে নিজভূমে পরবাসী।

৩

অনেকের মনে হতে পারে উইঘুররা বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা থেকে অনেক দূরে। আর একদল ভাবতে পারেন এসব বিষয় ইসলামী লোকজনের ব্যাপার। কিন্তু নিপীড়িত জাতিসত্তার লড়াই হিসেবে উইঘুরদের অবশ্যই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কেউই প্রগতিশীল বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দাবী করতে পারবে না যদি না এইসব নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলোর আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারের লড়াইয়ের সাথে নিঃশর্ত একাত্মতা প্রকাশ না করে। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে চলা মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের লড়াইয়ের ব্যাপারে আমরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন নই। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার প্রপাগান্ডা যেভাবে ইসলামকে বর্বর ও জঙ্গি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে চলেছে তার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের কর্তব্য ঠিকমতো ধরতে পারি না। আবার উইঘুর, মরো, কারেন, আরাকান, কাশ্মীর, চেচেন, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সবাই মুসলমান হওয়ায় এখানকার একটা সাধারণ ফ্যাক্টর হচ্ছে ইসলাম। এই কারণে আজকের বিশ্বব্যবস্থার ইসলাম বিরোধী মনোযোগ ও কর্মসূচীর সাথে এসব লড়াই-সংগ্রামকে যুক্ত করে দিয়ে আধিপত্যবাদীরা যেমন সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছে তেমনি আমাদেরকেও একটা বিভ্রমের মধ্যে রেখে দিয়েছে। ফলে এই সব স্বাধীনতা সংগ্রামকে আমাদের জনগণের লড়াই সংগ্রামের জায়গা থেকে হাজীর করা সম্ভব হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা মুসলিম উম্মার বিশ্বজনীন চেহারাটাকে কিভাবে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে। উম্মা মানে হচ্ছে জাতীয় সংকীর্ণতার উর্ধে ওঠা। এরকম কোন স্বপ্ন, সম্ভাবনা আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে কি?

www.pathagar.com

ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ

ইরাকে আমেরিকার আজ যে ভূমিকা, কাশ্মীরে ভারতের ভূমিকাও হুবহু তা-ই। আমেরিকার ভূমিকার জন্য তাকে সাম্রাজ্যবাদী বলে গাল দেয়া গেলে কাশ্মীরে ভারতের ভূমিকার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বলা যাবে না কেন? আমেরিকা জোরজবরদস্তি করে শক্তির জোরে ইরাক দখল করেছে। ভারতও সেনাশক্তির সাহায্যে কাশ্মীর দখলে রেখেছে। বিশ্ব রাজনীতিতে আজকাল শান্তির নীতির কথা আওড়ানো হয় যথেষ্ট; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শক্তির নীতির ওপরই এখনও সবকিছু চলছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে বলা হলেও সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন রূপ ও মুখোশের অন্তরালে আজও বিশ্ব শাসন-শোষণ ও লুণ্ঠন অব্যাহত রেখেছে। একালের সাম্রাজ্যবাদ বরং অধিকতর হিংস্র ও ভয়ঙ্কর, কেননা এর প্রভাব হচ্ছে বহুমাত্রিক। বহু বছর হলো কাশ্মীরিরা ভারতীয় জবরদখল ও হানাদারির বিরুদ্ধে আজাদির লড়াই চালাচ্ছে। কারণ তারা মনে করে না যে তারা ভারতীয়, ভারত মাতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কাশ্মীরের লড়াইয়ের ব্যাপারটা এমন হয়ে গেছে যে, এটা এখন খুব বড় ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের গণমাধ্যমে খবর হয়ে আসে না। এর কারণ আমাদের প্রগতিবাজ বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়াকর্মীর দল কাশ্মীর প্রশ্নে নীরব থাকা পছন্দ করেন। কারণ তারা মনে করেন, ভারত হলো একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র। তাই প্রগতির স্বার্থে কাশ্মীরিদের উচিত ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকা। আমেরিকা যেমন ফ্রিডম আর ডেমোক্রেসির কথা বলে ইরাকে জবরদখল পাকাপোক্ত করেছে, তেমনি ভারতও প্রগতির স্বার্থে কাশ্মীরের পায়ে শিকল পরিয়ে রাখতে চায়। এতে যদি নেটিভদের কিছু রক্তক্ষরণ হয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়, তাহলে কিছু আসে-যায় না।

কাশ্মীর বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা প্রধানত কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত। মূল কাশ্মীর, জম্মু, গিলগিট, লাদাখ ও বালটিস্তান। এই পাঁচটির ইতিহাস, ভাষা ও ধর্মের মধ্যে আছে বিভিন্নতা। লাদাখে বাস করে লামা বৌদ্ধরা। এদের দেখতে তিব্বতিদের মতো। জম্মুর লোকদের বলা হয় ডোগরা। এরা প্রধানত হিন্দু। মূল কাশ্মীর হচ্ছে মুসলিম-প্রধান। সামান্য কিছু হিন্দু বাস করে এখানে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারিত হয়। বাংলাদেশের মতোই সুফি ও দরবেশরা এখানে নীরবে-নিভৃতে বিনাযুদ্ধে ইসলাম প্রচার করেন। একসময়ে এই

www.pathagar.com

অঞ্চলে একটি আফগান প্রভাবিত স্বাধীন মুসলিম সালতানাত গড়ে ওঠে। অনেকটা বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের মতো। পরে সম্রাট আকবর কাশ্মীর দখল করে (১৫৮৭) এটিকে নিজের সাম্রাজ্যের ভেতর নিয়ে আসেন। কাশ্মীরের নিসর্গ সম্রাট জাহাঙ্গীরকে মুগ্ধ করে। তিনি এখানে মৃগয়ায় আসতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চলে যায় পাঠান আহমদ শাহ আবদালির নিয়ন্ত্রণে। কাশ্মীর শাসিত হতে থাকে কাবুল থেকে। পরে ১৮১৯ সালে শিখরাজা রনজিত সিং জম্মু, কাশ্মীর, গিলগিট দখল করে আর এক শিখ গুলাব সিংকে এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। গুলাব লাদাখ ও বালটিস্তান দখল করেন। শিখরা পরে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়। ইংরেজরা সরাসরি জম্মু ও কাশ্মীরকে শাসন না করে বার্ষিক ৭৫ লাখ রুপির বিনিময়ে গুলাব সিংকে দেয় এই অঞ্চলের শাসনভার। তিনি মহারাজা উপাধি নিয়ে এই অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। তবে তাকে এক বিশেষ চুক্তি অনুসারে ইংরেজদের অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) মেনে নিতে হয়। সেকালে সব দেশীয় রাজাদের এ ধরনের চুক্তির অধীনে ব্রিটিশের কথা মেনে চলতে হতো।

কাশ্মীরের এই মহারাজারা ছিলেন অত্যাচারী। তারা বহুদিন ধরে নানা ছলছুঁতোয় সেখানকার মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতেন। গুলাব সিংয়ের কাছে ইংরেজ কর্তৃক কাশ্মীর রাজ্য বিক্রি করে দেয়ার দুঃখজনক ঘটনা এবং সেখানকার মুসলমানদের অধীনতামূলক অবস্থাকে ইঙ্গিত করে কবি ইকবাল একটি মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছিলেন। উল্লেখ্য, ইকবালের পূর্বপুরুষরা ছিলেন কাশ্মীরি বংশোদ্ভূত। কবিতাটি এ রকম : ভোরের বাতাস তুমি যদি জেনেভামুখী হও/তবে আমার আরজ পৌঁছে দিও জাতিপুঞ্জের কাছে/ওরা বেচে দিয়েছে কৃষককে, তার চাষের জমিকে/তীর তীর করে বয়ে চলা নদী আর উপত্যকাকে/ বেচেছে মানুষকে একেবারে পানির দরে।

যাই হোক, ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষ ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। একটি অংশ ব্রিটিশরা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করত। অন্য অংশ দেশীয় রাজাদের দিয়ে শাসন করত। এ রকম ছোটবড় বহু ভারতীয় রাজা ছিল। তখনকার ভারতবর্ষের দুই-পঞ্চমাংশ ছিল দেশীয় রাজাদের অধীনে। দেশীয় রাজাদের নিজস্ব আইনকানুন, প্রশাসন থাকলেও তাদের সবাইকে ব্রিটিশের নির্দেশ মেনে চলতে হতো। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় প্রশ্ন ওঠে এসব রাজ্যের ভবিষ্যৎ কি হবে। আলোচনার মাধ্যমে

www.pathagar.com

ঠিক হয় দেশীয় রাজারা ঠিক করবেন তারা ভারতের সঙ্গে না পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবেন। অথবা স্বাধীন থাকবেন। কাশ্মীর হচ্ছে পাকিস্তানের লাগোয়া। তার ওপরে মুসলমান অধ্যুষিত। তখনকার হিসাব অনুযায়ী (১৯৪১) কাশ্মীরের জনগণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ছিল হিন্দু, বাকি সবই মুসলমান। কিন্তু কাশ্মীরের শিখ বংশোদ্ভূত রাজা ভারতে যোগ দিতে রাজি হওয়ায় বাধে বিপত্তি। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ মুসলমান হওয়ায় তারা ভারতে যোগ দিতে চায় না। এর ফলে পাকিস্তান হয় ক্ষুব্ধ। এভাবেই শুরু হয় কাশ্মীর সঙ্কটের, যা শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গিয়ে ঠেকে। জওয়াহেরলাল নেহরু মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে কাশ্মীর সমস্যাকে নিয়ে যান জাতিসংঘে। নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করতে হবে। নেহরু প্রথমে এ প্রস্তাবে সায় দিয়ে পরে করেন অস্বীকার। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচবার কাশ্মীরে গণভোটের প্রস্তাব গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ভারত কাশ্মীরকে তার অঙ্গরাজ্য হিসেবে ঘোষণা করে। এভাবে বিশ্বজনমত আর শান্তির সব শর্ত উপেক্ষা করেই ভারত কাশ্মীরকে জবরদখল করে রেখেছে। তাই রাজনৈতিক উপায়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। এ কারণেই কাশ্মীরে আজও এক ধরনের গণযুদ্ধ চলছে। একে ফিলিস্তিনের ইন্তিফাদার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কাশ্মীরিরা চাইছে স্বাধীন হতে আর ভারত সরকার পাশবিকতা দিয়ে তা দমন করার চেষ্টা করছে।

ভারত নিজেকে দাবি করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। অথচ নেহরু ও পরবর্তী নেতৃত্ব সব সময় কাশ্মীরিদের গণভোটের দাবিকে নাকচ করে দিয়েছে। কারণ তারা জানে গণভোট দিলে কাশ্মীরিরা ঠিকই স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেবে আর তার ফলে ভারতের তথাকথিত শান্তিবাদী-গণতান্ত্রিক চেহারার মুখোশ খসে পড়বে। ভারতের কথা হলো, যেহেতু কাশ্মীরের রাজা ভারতভুক্তি চেয়েছে, সুতরাং কাশ্মীর ভারতভুক্ত হতে বাধ্য। কিন্তু ভারত এর আগে জুনাগড় দখল করে। জুনাগড়ের মুসলমান নওয়াব ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে যোগ দেন পাকিস্তানে; কিন্তু ভারত জুনাগড় দখল করে এই যুক্তিতে যে জুনাগড়ের অধিকাংশ প্রজা হচ্ছে হিন্দু আর তা পাকিস্তানসংলগ্ন নয়, ভারতসংলগ্ন।

হায়দরাবাদের নিজাম চেয়েছিলেন স্বাধীন থাকতে; কিন্তু ভারত হায়দরাবাদ দখল করে নেয় এই যুক্তিতে যে, এর অধিকাংশ প্রজা হিন্দু। এই হায়দরাবাদ এখন ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ।

www.pathagar.com

অর্থাৎ পাকিস্তান নয়, ভারতই প্রথম দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে ১৯৪৭ সালের ৩ জুনের বিভক্তিকরণ নীতি ভঙ্গ করে।

এরপর থেকেই ভারত শুরু করে পেশিশক্তির প্রদর্শনী। গায়ের জোরে আশপাশের দেশগুলোকে দাবিয়ে রাখাই হচ্ছে তার নীতি। বিভাগ-উত্তর ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সামরিক শক্তির জোরেই ভারত সব সমস্যার সমাধান করতে চায়। এ ক্ষেত্রে শক্তির পরীক্ষায় সে কেবল চীনের সঙ্গেই পেরে ওঠেনি; কিন্তু পাকিস্তান চীন নয়। পাকিস্তান যদি চীনের মতো একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হতো, তবে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান অনেক আগেই হয়ে যেত।

মনে হয় সামরিক শক্তির জোরেই কাশ্মীরকে ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় ভারত। ভারতের বিশাল সেনাবাহিনীর প্রায় অর্ধেক আজ পাহারা দিচ্ছে কাশ্মীরকে। পুরো কাশ্মীরই হয়ে পড়েছে একটি কয়েদখানা। পৃথিবীতে সামরিক শক্তির যুক্তিটাই এখনও সবচেয়ে বড় যুক্তি। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকারের শ্লোগান প্রায়শই একটা ধাপ্পা মনে হয়। কারণ শক্তিমান রাষ্ট্রগুলো এই শ্লোগানের আড়ালে তাদের অপকর্মকে জায়েজ করে। আর ভারত এই শক্তির যুক্তিটাকেই প্রয়োগ করতে চায় দক্ষিণ এশিয়ায়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরু তার বিখ্যাত Discovery of India বইতে পুরো দক্ষিণ এশিয়াব্যাপি এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ভারতীয় নেতৃত্ব আজ অবধি সেই নেহরু ডকট্রিনকে তাদের রাষ্ট্রদর্শনের মৌলিক নীতি হিসেবে মেনে চলে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতই সামরিক শক্তিতে সবচেয়ে এগিয়ে। আর এ কারণেই ভারত এ অঞ্চলের দেশগুলোকে হুমকি দেখাতে সাহসী হয়।

বাংলাদেশ সামরিক দিক দিয়ে একটা দুর্বল রাষ্ট্র। এ কারণেই ভারত সাহস পেয়েছে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে আমাদের পদ্মা নদী মেরে ফেলতে কিংবা সীমান্তে পাখির মতো বাংলাদেশিদের হত্যা করতে। শুধু বাংলাদেশ নয়, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ সবাই ভারতের পেশিশক্তির কাছে অসহায়।

ভারতের সাথে আমাদের এখন চলছে অবাধ বাণিজ্য ঘাটতি, নির্ভরশীল অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও অনুপ্রবেশের মত ব্যাপার। সেই হিসেবে টাটা, আনন্দবাজার ও বোম্বাইয়া ফিল্ম আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদ।

যাই হোক, কাশ্মীর সঙ্কট নিয়ে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর এখন আর কোনো মাথাব্যথা নেই। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় কৌশলগত কারণে পাকিস্তানের দিকে চেয়ে আমেরিকা তখন কাশ্মীর নিয়ে দুই-একটি কথা বলত। এখন ঠাণ্ডা যুদ্ধের

www.pathagar.com

অবসানে সভ্যতার সংঘাতের যুগ শুরু হয়েছে। আর এই যুগে এসে পুরনো হিসাব-কিতাবও পুরোপুরি বাতিল হয়ে গেছে। পশ্চিমারা আজ ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে নতুন লড়াই শুরু করেছে এবং মুসলমান মাত্রই 'বর্বর', 'সন্ত্রাসী', 'মৌলবাদী' বলে প্রচারণা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচারণা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধকৌশলের অংশ। একে আবার তারা বলছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

কাশ্মীর মুসলমান অধ্যুষিত হওয়ায় ভারতের নেতৃত্ব স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের 'জঙ্গি', 'বর্বর', 'মৌলবাদী' বলে তাদের ওপর নির্বিচারে ঝাঁপিয়ে পড়ার মওকা পেয়েছে। অন্যদিকে ভারত এখন পশ্চিমাদের কৌশলগত যুদ্ধের পার্টনার। সুতরাং কাশ্মীরিদের পক্ষে পশ্চিম থেকে এখন সাহায্যের বড় কোনো আশা নেই। এটা সত্য, কাশ্মীরের ভাগ্য ইস্ট তিমুরের মতো হবে না। ইস্ট তিমুর খ্রিস্টান অধ্যুষিত হওয়ায় পশ্চিমের বড় কর্তারা তাড়াতাড়ি ওটাকে স্বাধীন করে দিয়েছে। 'সেকুলার' পশ্চিমা সভ্যতা খ্রিস্টান বা ইহুদি ইস্যু নিয়ে যতখানি স্পর্শকাতর, মুসলিম ইস্যু নিয়ে ততখানি উদাসীন।

কাশ্মীরের ভাগ্য কি তাহলে বসনিয়া হবে? বসনিয়া তবু আলিয়া ইজেতবেগোভিচের মতো একজন ধীমান নেতৃত্ব পেয়েছিল। কাশ্মীরিদের তো তাও নেই। তবে কি রক্তস্নানই তাদের ললাট লেখা?

কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কাশ্মীরিদের যুদ্ধ ক্ষমতার ওপর। যুদ্ধ করে যদি ভারতকে তারা কাবু করতে পারে, তবেই তারা কেবল স্বাধীনতা পেতে পারে। কাশ্মীরিদের আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। শেখ আবদুল্লাহর মতো জনপ্রিয় নেতাও নেহরুর সেকুলারিজমের প্রলোভনে পড়ে প্রতারিত হয়েছিলেন। সেই প্রতারণার কথা তিনি শেষ বয়সে লিখে যান তার আত্মজীবনী Flaming Chinar-এ। ভারতের সেকুলারিজম হচ্ছে বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীকে প্রতারণা করার এক অপূর্ব দলিল। এই লেবেল গায়ে লাগিয়ে সে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পদদলিত করতে চায়।

কাশ্মীরে আজ শেখ আবদুল্লাহ নয়, বসনিয়ার আলিয়া ইজেতবেগোভিচের মতো নেতৃত্ব চাই। শুধু কাশ্মীর নয়, তাবৎ মুসলিম দুনিয়াই আজ নেতৃত্বের সঙ্কটে ভুগছে। মুসলিম বিশ্ব নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে অন্যেরা এসে কেউ তাদের সমস্যার সমাধান করে যাবে না। শুধু শুধু তাদের দুর্গতি বাড়বে মাত্র।

www.pathagar.com

মগজ ধোলাই

মগজ ধোলাই (Brain Washing) কথাটা বেশি বেশি শোনা যেত ঠাণ্ডাযুদ্ধের কালে। সে সময় পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট শিবিরের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মুখোমুখি অবস্থানের প্রেক্ষিতে একে অপরের বিরুদ্ধে মগজ ধোলাইয়ের অভিযোগও উঠে আসত। বিশেষ করে পুঁজিবাদী দুনিয়া তখন দেশে দেশে তরুণদের কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হওয়াকে মগজ ধোলাই হিসেবে চালাত। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এ রকম আনুষ্ঠানিক মগজ ধোলাইয়ের অভিযোগ ওঠে কোরিয়ার যুদ্ধে আটক আমেরিকার বন্দিদের ওপর চীনা কমিউনিস্টদের কার্যক্রম ও পরিকল্পনা থেকে। মগজ ধোলাই হচ্ছে কৃত্রিমভাবে একটা সাংস্কৃতিক অভিঘাত (Culture Shock) তৈরি করা। এর ফলে একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা, হুমকি কিংবা ক্ষমতার মুখে ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে যায় এবং সেই সুযোগে অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা ব্যক্তির মধ্যে শিকড় বসানোর সুযোগ পায়। সম্পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতাবিহীন এবং মুক্তির আশা ছেড়ে দেয়া মানুষের জন্য এই ধরনের ঝুঁকি অনেক বেশি। ব্যক্তির মতো জাতির ক্ষেত্রেও এটা ঘটতে পারে। নোবেলবিজয়ী রুশ কথাশিল্পী আলেক্সান্ডার সোলঝেনিৎসিন সম্পর্কে এখন অনেকেই জানেন। এই কথাশিল্পীকে ভিন্নমতের কারণে স্ট্যালিনের শ্রমশিবিরে ১১ বছর কাটাতে হয়। আটক বন্দিদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, গুপ্ত পুলিশের নির্যাতন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস–সব মিলিয়ে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার ভেতরকার অত্যাচারী চেহারা সোলঝেনিৎসিনের অসাধারণ সব উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে আছে। বিশেষ করে তার মাস্টার পিস গুলাগ আর্কিপেলাগোতে অত্যাচার-নির্বতনের পাশাপাশি ভিন্নমতালম্বী বন্দিদের মগজ ধোলাইয়ের বিচিত্র সব বর্ণনা আছে। ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় পুঁজিবাদী বিশ্ব এই কথাশিল্পীকে নিয়ে অনেক হৈচৈ করে। তার খ্যাতিকে প্রলম্বিত করার চেষ্টাও করে। এসবের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, পুঁজিবাদী বিশ্ব সোলঝেনিৎসিনের শিল্পকর্মকে পুঁজি করে রাজনৈতিকভাবে সোভিয়েত রাশিয়াকে হেনস্তা করতে চেয়েছিল। পুঁজিবাদী বিশ্বের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, সোলঝেনিৎসিনের কথায় সত্যতা ছিল। যাই হোক, মগজ ধোলাইয়ের কাজটা শুধু কমিউনিস্ট চীন বা রাশিয়া থেকে শুরু হয়েছে,

www.pathagar.com

এমন ধারণা ভুল হবে। এ কাজের আদিগুরু হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার (?) বরপুত্র পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো। তার আগে এ কাজ করেছিল রোমানরা। মগজ ধোলাইয়ের সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনার মূলে থাকে রাজনৈতিকভাবে অপরের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন ও সাংস্কৃতিকভাবে অন্য জাতি বা রাষ্ট্রকে দেউলিয়া বানিয়ে দেয়া। বলা হয়ে থাকে, কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে আগে তার সংস্কৃতি বিনাশ করে দাও। আর এ লক্ষ্যে পরিচালিত যাবতীয় ক্রিয়াকর্মকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই কাজ করার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তি ও মেধার। সাম্রাজ্যবাদীরা এ দুটোকেই সুচারুরূপে সমন্বয় করে। আমাদের মনে রাখা দরকার, আঠার-উনিশ শতকে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা যেসব দেশে কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেখানে তারা শাসন-শোষণই করেনি, শাসিত দেশের মানুষের মনোবিশ্বে স্থাপন করেছিল ইউরোপীয় আধুনিকতার এক ধারণা, যা তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলে মগজস্থ করে দেয়। যাতে করে কলোনি হাতছাড়া হয়ে গেলেও মগজের উপনিবেশিকতা কিংবা দাসত্ব যথারীতি কার্যকর থাকে। আজকের দিনের বাস্তবতায় সেই সব মতলব কিছুটা কৌশলে ও কিছুটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কার্যকর করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ঔপনিবেশিক কাল থেকেই সভ্যতা ও আধুনিকতা বলতে সাম্রাজ্যবাদীরা ইউরোপীয় সভ্যতা বা ক্রিশ্চিয়ানিটিকে বুঝিয়েছে। আর এভাবেই দখলকৃত দেশ ও জাতিসমূহের ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ধরনকে আধুনিকতা ও উন্নত শিক্ষার পাশে বিকৃত, উল্টাপাল্টা, কখনো কখনো মুছে ফেলার চেষ্টাও হয়েছে। এর ফলে উপনিবেশিত মানুষের স্থির বিশ্বাসে চিড় ধরেছে, যার পরিণতিতে তারা এক দীর্ঘ হীনমন্যতার জালে জড়িয়ে গেছে। তারা আধুনিকতার নামে ইউরোপকে উন্নত ভেবেছে, তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছে এবং শেষমেষ তারা 'সাহেব' হতে চেয়েও সাহেব হতে পারেনি। অথচ ঐতিহ্যবাদী থাকাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বাম চিন্তাবিদ ফ্রাঞ্জ ফাঁনো এ অবস্থাকে বলেছেন, Black Skin, White Masks. কালো মানুষরা সাদা মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। এরা আত্মপরিচয়হীন, অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হতে চায়। সাম্রাজ্যবাদীরা ভালো করেই জানত, উপনিবেশ তারা চিরদিন ধরে রাখতে পারবে না। ফলে তারা এক বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি করে, যারা জন্মগতভাবে দেশি

www.pathagar.com

হলেও উপনিবেশকারী রাষ্ট্রের মতবাদ ও জ্ঞানের পক্ষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। আর এই শ্রেণীকে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়, এই ধারণা সৃষ্টি করার জন্য 'আধুনিক' আর 'উন্নত' মানেই ইউরোপ বা পশ্চিমা সভ্যতা। আফ্রিকান লেখক নগগুইগি ওয়া থিংয়ো এই শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন : 'আমরা যারা সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করেছি তারা আসলে আমাদের জনগণ, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের দৈনন্দিন ভাষা ও মূল্যবোধকে ঘৃণা করার স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছি। শিখেছি অপমান করতে ও শাস্তি দিতে।'

মজার ব্যাপার হলো, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরও কলোনির এই সিলসিলা আজো প্রবল প্রতাপে চলছে। এই শিক্ষাই দেশের মানুষকে ঘৃণা করতে এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যানের দিবানিশি সবক দিয়ে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর অনাগ্রহের কারণও হচ্ছে এই। এখন আবার আমাদের দেশে পশ্চিমা আধুনিকতা ও বাঙালি সংস্কৃতির একটা খিচুড়ি তৈরি হয়েছে এবং এই আধুনিকতা ও বাঙালি সংস্কৃতির মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে, চোখ-কান বুজে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে যাওয়া। একদিকে ভাষা, অন্যদিকে ধর্মের প্রশ্নে আমাদের সমাজ কাঠামোয় যে বিভেদ-বিভাজন তৈরি হয়েছে, তা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও সংহতিকে প্রতিনিয়ত ঝাঝরা করে দিচ্ছে। সেকালের মতো একালেও সাম্রাজ্যবাদের অভীষ্ট হচ্ছে তাই।

আমাদের মনে রাখা দরকার, ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষে হানা দেয় তখন থেকেই তারা সংস্কারের নামে মগজ ধোলাইয়ের কাজে উঠে-পড়ে লাগে। কেননা তারা বুঝতে পেরেছিল, দেশীয়দের মধ্যে এক শ্রেণীর তাঁবেদার গোষ্ঠী গড়ে তোলা ছাড়া তাদের 'এম্পায়ার' শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। দেখা গেল, খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যে 'এম্পায়ারের' প্রিয়ভাজন এক দল বুদ্ধিজীবী খাড়া হয়ে গেল; যারা ইংরেজের পছন্দমত ভাষা রপ্ত করে তাদের স্বার্থে কাজ শুরু করল। এই তথাকথিত বুদ্ধিমান শ্রেণী (যারা পরবর্তীকালে বাবু বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে) ব্রিটিশের সখ্য ও সুবিধার লোভে সাম্রাজ্যের আইডিয়াকে ফেরি করে এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে অপব্যাখ্যার ধুয়া দিয়ে চেপে রাখার ব্যবস্থা করে। এর ফলেই ব্রিটিশের পক্ষে সম্ভব হয় ভারতবর্ষকে প্রায় দু'শ' বছর

www.pathagar.com

অধীনস্থ রাখা। এখানে উল্লেখ করার বিষয় হচ্ছে, সেদিন উপনিবেশিত ভারতের যারা ইউরোপমুখী ও ইউরোপমনা ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নিলেও ব্রিটিশ ভারতের সেই বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত, রাজনীতিবিদদের হাতেই রয়ে যায় বিশ্বস্ত দায়িত্বভার। যার ফলে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ ত্যাগ করলেও তারা এক বিশেষ তোতা পাখি সৃষ্টি করে যায়, যারা ইউরোপ বা পশ্চিমা সভ্যতা বলতে অন্ধ। উদাহরণস্বরূপ আমাদের ভূখণ্ডের কথা বলা যায়। এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলিম মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় আজ অনেকটাই ইউরোপ বা পাশ্চাত্যের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে এবং মুসলিম ব্যক্তিমানসের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটির সঙ্কট তীব্র হয়ে উঠেছে।

কলোনির যুগে উপনিবেশিত মানুষ নিজ দেশে থেকেও উদ্বাস্তে পরিণত হতো এবং তাদের নিজ আবাসভূমি এমন এক কল্পরাজ্যে ঠাঁই পেত যার নিচে কোনো জমিন ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশিত মানুষগুলোকে জোর করে যে জ্ঞান বা আলো বিতরণ করত তার কতটুকু ছিল প্রকৃতই কল্যাণজনক; আর কতটুকু মেকি–সেটাও ছিল অন্ধকারাবৃত। ফলে কলোনির মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিল আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির গভীরে এবং ঔপনিবেশিক শক্তির জ্ঞান ও ইতিহাস প্রকৃত জ্ঞান ও ইতিহাস বলে প্রকাশ পেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষমতার প্রতাপে এভাবে পাশ্চাত্যকে সব জ্ঞানকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। আর এই কেন্দ্রের বাইরের মানুষ চিহ্নিত হলো বহিরাগত হিসেবে। জ্ঞানের জগতে কেন্দ্র ও প্রান্তের এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা এমন সব ডিসকোর্সের পক্ষে প্রচারণা চালাল, তাতে অপাশ্চাত্য মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হলো অত্যন্ত লজ্জাজনক কায়দায়। তার মানে ইউরোপ হলো আধুনিক আর সভ্য। অইউরোপ, অপাশ্চাত্য দেশগুলো হচ্ছে অনাধুনিক, অসভ্য। এই অসভ্য মানুষগুলোর শাসিত হওয়া যেমন ন্যায়ত প্রাপ্য তেমনি তাদের সভ্য করে তোলার দায় হচ্ছে কিপলিংয়ের ভাষায় 'সাদা মানুষের বোঝা'। এই দায় মেটানোর জন্য সেকালে প্রয়োজন হয়েছিল ঔপনিবেশিকতার, একালে বিশ্বায়ন ও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার।

তাই দেখা গেল, কলোনির অবসানের পর আমাদের সমাজে, শিল্প-সাহিত্যে, জ্ঞানকাণ্ডে, প্রশাসনযন্ত্রে পাশ্চাত্য জীবন্ত দেহ-মন-চিন্তা নিয়ে অবস্থান করছে এবং নব্য কলোনিয়াল বুদ্ধিজীবীরা সেটাই প্রমোট করছে।

www.pathagar.com

উনিশ শতকে কলকাতায় ব্রিটিশরা বাবু বুদ্ধিজীবীদের এক দল খাড়া করেছিল, এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে সুশীল সমাজের আর এক দল খাড়া করেছে। সাম্রাজ্যবাদের স্তব-স্তুতিতে দুই সমাজের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এতে করে এটাই প্রমাণ হয়, অতীতের মতো সাম্রাজ্যবাদীরা আজো আধিপত্য বহাল রেখেছে। এক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু আগে তারা স্বশরীরে এসে শাসন-শোষণ করত; এখন দূরে বসে এজেন্টের মাধ্যমে করে। এ কারণেই দেখা যায়, পাশ্চাত্যমুখী গোলাম বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও সাহিত্যসেবীরা তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের সাহিত্যে লড়াইয়ের জায়গাটিকে ভরে তুলছেন যৌনতা, ভোগবাদিতা, নিরিশ্বরতা ও অনিশ্চয়তায়। আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও স্বপ্নের জায়গাগুলো ফিকে হয়ে আসছে। রাজনীতির জগতের অবস্থা আরো হতাশাজনক। ইসলামকে মধ্যযুগীয় ভাবার মধ্যে গোলামি মানসিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী তাদের ইসলামবিরোধিতার সিলসিলা পেয়েছেন পশ্চিমা শিক্ষা ও দর্শনের ভেতর দিয়ে। এই আধুনিকরাই ধর্মকে মধ্যযুগীয় ভাবধারা হিসেবে বিবেচনা করেন এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করা রীতিমত জীবনের পরম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাজনীতি ও সংস্কৃতির এই সেকুলারাইজেশন আজ মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় সঙ্কট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর সংহতি রীতিমত ফুটোফাটা করে দিয়েছে। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর হীনমন্যতা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একালে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আড়ালে যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে, সেটা বোঝার মতো ক্ষমতাটুকুও আজ আর তাদের অবশিষ্ট নেই। ‘ইসলাম’ আর ‘মুসলমান’ শব্দ কানে আসা মাত্রই তারা ‘সন্ত্রাস’-‘সন্ত্রাস’ বলে ভিমরি খেয়ে পড়েন। এই ঘোরতর ইসলামবিরোধিতা আসলে এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা এবং এই সাম্প্রদায়িকতাই এতকাল জারি রেখেছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ। আমাদের আত্মপরিচয়ের জায়গা থেকে ইসলামকে সরিয়ে নিয়ে একটা দোআঁশলা গোছের সেকুলার পরিচয় চাপিয়ে দেয়ার কারসাজিও তাদের।

আজ দুনিয়াব্যাপি মুসলমানদের অঞ্চলভেদে আরব, ইরানি কিংবা বাঙালি নামে ডাকার মজেজাটা কী? হয়তো ইউরোপের সূত্রে পাওয়া সেকুলার

www.pathagar.com

ন্যাশনালিজম। মেনে নিচ্ছি, দুনিয়াব্যাপি মুসলমানদের একটা ভাষিক কিংবা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আছে। কিন্তু সেটা তাদের শাশ্বত পরিচয় নয়। তাদের তো একটা ধর্মের ইতিহাস আছে এবং ওই ইতিহাস দিয়ে তারা তাদের সভ্যতাকে মুখর করেছিল–সেই ইতিহাসটা কেড়ে নিয়ে মুসলিম সভ্যতাকে ফিকে করাই হলো সাম্রাজ্যবাদের বড় চাল। আজ তাহলে মুসলিম সমাজ থেকে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষত ও বিভাজন চিহ্ন মুছে ফেলার উপায় কী? এতকাল সাম্রাজ্যবাদের ছড়ি ঘুরিয়ে পশ্চিমের তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং একরৈখিক ইতিহাসবিদরা মুসলিম সমাজকে অনুন্নত, অনাধুনিক, মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন বলে হেনস্তা করতে চেষ্টা করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে জ্ঞান আর ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে তারা একচ্ছত্র প্রতাপে যা ইচ্ছা তাই করেছে। মুসলিম সমাজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হলে এর নেতৃত্বকে তাই জ্ঞান ও ক্ষমতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে পুনরায় অবলোকন করতে হবে ইসলামের ওই প্রাণশক্তিকে, যাকে কিনা কেন্দ্র থেকে প্রান্তে ঠেলে ফেলা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার এই প্রত্যয়দীপ্ত ভূমিকাটা বোঝানোর জন্য আমি অরুন্ধতী রায়ের লেখা থেকে ধার করছি :

'সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ শুরু করতে পারে, কিন্তু তার নিজের চেহারা যে কতটা ভয়ঙ্কর-কুৎসিত, তা এখন প্রকাশ পেয়ে গেছে। ...আমাদের কৌশল হবে শুধু সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা নয়, বরং তাকে অবরুদ্ধ করা। তাকে অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত করতে হবে, লজ্জায় ফেলতে হবে, উপহাস করতে হবে। এগুলো আমরা করব আমাদের শিল্পকর্ম, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের সাহিত্য, আমাদের অনমনীয়তা, আমাদের আনন্দ, আমাদের প্রতিভা, আমাদের নিছক অস্থিরতা এবং আমাদের নিজস্ব গল্প বলার ক্ষমতা দিয়ে। ...যদি তারা যা বিক্রি করছে–তাদের ধ্যান-ধারণা, তাদের মতো করে রচিত ইতিহাস, তাদের যুদ্ধ, তাদের যুদ্ধাস্ত্র, তাদের ভবিষ্যতের ধারা–আমরা এগুলো কিনতে অস্বীকার করি, তবে তাদের কর্পোরেট সৌধ ধসে পড়বে। মনে রাখবেন, আমরা অসংখ্য এবং তারা মুষ্টিমেয়। তাদের কাছে আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে আমাদের কাছে তাদের প্রয়োজন অনেক বেশি।'

মুসলিম সমাজ তার মর্মবেদনা কাটিয়ে জেগে উঠুক, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার যুগে এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আর হতে পারে না।

www.pathagar.com

আধুনিকতা, সন্ত্রাস ও ইনসাফ

আধুনিকতা কথাটার উৎপত্তি ইউরোপে। সেখানকার সমাজের এক বিশেষ মুহূর্তে নানা রকম আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে চিন্তা ও জগৎ বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে এই ভাবনার জন্ম। এটি আমরা পেয়েছি ঔপনিবেশিকতার সূত্রে। এই ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সকে বিচার-বিবেচনা ছাড়াই উন্নতির পবিত্র ধারা হিসেবে গ্রহণ করার সুবাদে পশ্চিমকে আমরা দুনিয়ার সবচেয়ে অগ্রসর সমাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি। আমাদের দেশে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাল থেকে। এখন আমরা আধুনিক, সভ্য, অগ্রসর, যুক্তিবাদী বলতেই পশ্চিমা সভ্যতাকে বুঝে থাকি। এর বিপরীতে অনাধুনিক, অসভ্য, অনগ্রসর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিসেবে অপশ্চিমা সভ্যতাকে চিহ্নিত করি। আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বলে দাবিদার লোকরা এই সমাজকে সেকুলার বলে ভাবতে ভালোবাসেন এবং এই সমাজের সহমর্মী হওয়াকে গৌরবের কাজ বলে মনে করেন। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল বিচার-বিবেচনার মূলে আছে ক্ষমতাশালী পশ্চিমা সভ্যতার প্রতাপ ও আমাদের মনোজগতে আধুনিকতা নামক জ্ঞানকাণ্ডের উপনিবেশ। এই উপনিবেশিত মানসিকতার কারণেই আমাদের প্রগতিশীল শিক্ষিত শ্রেণী পশ্চিমা শিক্ষাকে গোলামির শিক্ষা না বলে আধুনিক শিক্ষা বলে বড়াই করে আর ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা শিক্ষাকে সন্ত্রাস ও মধ্যযুগীয়তার সঙ্গে একাকার করে দেখে। এই শ্রেণীর পশ্চিমের ইতিহাস নকল করার দিকটি যতদিন অব্যাহত থাকছে এবং পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ ও জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাটা আঁকড়ে ধরার ব্যাপারটা না কাটছে, ততদিন আমাদের আত্মপরিচয়ের জায়গাটা খোলাসা হবে না। কোনো সন্দেহ নেই, পুরনো উপনিবেশগুলো থেকে যে রাষ্ট্র নির্মিত হয়েছে, তা আসলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও আধিপত্য বজায় রাখার নতুন যন্ত্র। আর এর ফলে দেশের মধ্যে তৈরি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের এক ধরনের সুবিধাবাদী নিকৃষ্ট দালাল শ্রেণী, যারা ঔপনিবেশিকতাকেই ভিন্ন এক আদলে লালন করে চলে।

www.pathagar.com

স্মরণ করা যাক কামাল পাশা, রেজা শাহ ও আমানুল্লাহ খানের কথা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এদের আধুনিকতার প্রতি ঝোঁক ছিল। আধুনিকতা বলতে এরা ইউরোপ বা পশ্চিমকে বুঝেছিলেন এবং নিজেদের সমাজকে 'আধুনিক' করতে গিয়ে পশ্চিমাকরণে মত্ত হয়েছিলেন। আধুনিকতার মানে যদি যুগোপযোগিতা হয়, তাতে মুসলিম সমাজের আপত্তি থাকার কথা নয়; কিন্তু এরা আধুনিকতা বলতে বুঝেছিলেন পশ্চিমা সংস্কৃতিকে এবং ওই পশ্চিমের ঠুলিপরা চোখ দিয়ে তারা তাদের জগৎ ও মানুষকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তারা যখন মেয়েদের নেকাব ছাড়তে বললেন, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছেড়ে পুরুষদের পরতে বললেন পশ্চিমা স্যুটকোট, সমাজে প্রচলন করতে চাইলেন পশ্চিমা আইন-কানুন; তখন মুসলিম সমাজ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কোনো আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ছাড়া এই উপরিতলের আরোপিত আধুনিকতা মুসলিম সমাজকে প্রতিবাদী করে তুলল। প্রতিবাদের এই ধরনকে পশ্চিমারা বলল সন্ত্রাস। মুসলিম সমাজে আজকে যে সন্ত্রাসের কথা বলা হচ্ছে, তা আসলে আধুনিকতারই এক ধরনের প্রতিক্রিয়া-পরিণাম। আধুনিকতা আসার আগে এই ধরনের সন্ত্রাসের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মুসলিম সমাজ বিজ্ঞান চায়, নগরায়ন চায়, শিল্পায়ন চায়, মানব উন্নয়ন চায় এবং এসব ব্যাপারে ইসলামের এক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। আধুনিকায়নের নামে মুসলিম সমাজ পশ্চিমাকরণ চায় না। জগৎ বিচারের এই দৃষ্টিভঙ্গির তফাতের কারণে সন্ত্রাস ও ইনসাফ ব্যাপারটা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কাকে বলব সন্ত্রাস, কাকে বলব ইনসাফ; তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে রীতিমত বাকযুদ্ধ, কলমযুদ্ধের শেষ নেই। আধুনিকতা যুক্তির কথা বলে, বিজ্ঞানের কথা বলে, সেকুলারিজমের কথা বলে; কিন্তু সন্ত্রাস, হিংসা ও সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার কথা গোপন করে। অথচ এগুলো দিয়েই তো আধুনিকতার শরীর তৈরি। এগুলো দিয়েই এর সর্বত্র বিজয় বৈজয়ন্তী ওড়ানো হয়েছে। গত কয়েকশ' বছর ধরে বিশ্বযুদ্ধ, উপনিবেশ দখল, গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব–এগুলো আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এর বড় উদাহরণ হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব। এই বিপ্লবের পর থেকে সন্ত্রাস ও হিংসাকে ইতিহাসের অগ্রগতির সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর বহির্দেশে লটকানো ছিল 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র শ্লোগান। আদতে এটি উপহার

www.pathagar.com

দিয়েছিল সন্ত্রাস ও জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনী। নেপোলিয়নের বিজয়ের কারণ ছিল জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সেনারা শত্রু সেনা সংহারে নেমেছিল এবং এটাকে আমরা জাতীয়তাবাদের উচ্চতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। এই উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিণতি দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে, হিংসা ও রক্তপাতে আধুনিক মন মোটেই কুপিত হয় না। একইভাবে এই আধুনিক মনই বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও হিংসাকে বৈধতা দিয়েছিল। স্টুয়ার্ট মিলের মতো দার্শনিক মনে করতেন, সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশে বসবাসকারী মানুষদের জন্য গণতন্ত্রের হাতেখড়ি। সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করেই ইউরোপীয় শাসকরা উপনিবেশের মানুষদের সভ্য করে তোলে এবং তাদের সংস্পর্শে এসে এসব মানুষ সভ্য হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিকাশকে মিল এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মিল বড় দার্শনিক ছিলেন; কিন্তু তিনি তার চোখে সাম্রাজ্যবাদের ঠুলি পরে নিয়েছিলেন। সভ্য ও অসভ্যের এই প্রতিক্রিয়াশীল বিভাজন ইউরোপ ক্রুসেডের জামানা থেকেই লালন করে আসছে। মিল তার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। না হলে সভ্যতার এই বিচিত্র ব্যাখ্যা আমাদের শুনতে হবে কেন? আধুনিকতার সূত্রপাত ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কাল থেকে। আধুনিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থারও যাত্রা রেনেসাঁর পথ ধরে। বলা হয়ে থাকে, কলম্বাসের নতুন বিশ্ব অভিযানের বছর থেকেই আধুনিকতার শুরু। স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানী ইসাবেলার নেতৃত্বে ওই বছর সেখানকার শেষ মুসলিম ঘাঁটি গ্রানাডার পতন হয়। এভাবে একাধিক রাষ্ট্রের একত্রীকরণ ও বিশ্বজয়ের ভেতর দিয়ে জাতি-রাষ্ট্রের বিকাশ শুরু হয়। ম্যাক্স ওয়েবার লক্ষ্য করেছিলেন, রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ ও হিংসার ওপর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েমের ওপর নির্ভর করছে আধুনিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। জাতি-রাষ্ট্র সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হিংসার বিভিন্ন প্রকাশকে একত্র করে একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়, যা রাষ্ট্রের শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারে। এই আধুনিকতার সূচনা করে রানী ইসাবেলার স্পেন, যা ইউরোপকে দেখতে চেয়েছিল সংস্কৃতির মাপকাঠিতে। আধুনিক স্পেন সেখানকার মুসলিম ও ইহুদিদের সামনে দুটো বিকল্পই তুলে ধরল। হয় ধর্মান্তরিত হও, নতুবা দেশ ছাড়—অন্যথা মৃত্যু অবধারিত। স্পেনের ইনকুইজিশনের দণ্ডের ইতিহাস বিস্মৃত হওয়ার নয়। মুসলমানদের জন্য

www.pathagar.com

'এপ্রিল ফুলে'র কাহিনীও ভোলার মতো ঘটনা নয়। তাই আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাসকে সাম্রাজ্যবাদ ও গণহত্যার ইতিহাস হিসেবেও চিত্রিত করা যায়। আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসী, নিউজিল্যান্ডের মাওরি, আফ্রিকার বান্টুভাষী হেরেরোদের যেভাবে হত্যা, রোগ ও উচ্ছেদের সম্মিলিত আক্রমণে নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছিল তা কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থারই ফল।

উনিশ শতকের ইউরোপের চিন্তা জগতে এই ধারণা ভালোভাবে জাঁকিয়ে বসেছিল, সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বুক থেকে দুর্বল জাতিদের মুছে দিয়ে সভ্যতার উপকারই করেছিল। এই যুক্তির অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে পশ্চিমারা অসংখ্য অপশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত লোকজনকে ঝাড়েবংশে নির্মূল করে দিয়েছিল। এই নির্মূল অভিযানে নিষ্ঠুরতার সব রকম দৃষ্টান্তও তারা স্থাপন করেছিল। শ্যেন লিন্ডকিস্ট তার 'আ হিস্ট্রি, অব বম্বিং' বইয়ে দেখিয়েছেন, শুধু 'অসভ্য' শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গ হিসেবে প্রথমবার আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল। এ কাজটি করেছিল ইতালি। সেদিন উত্তর আফ্রিকার ত্রিপোলি শহরের অদূরে একটি মরুদ্যানে উপনিবেশবাদী ইতালির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সানুসি মুসলমানদের ওপর ধারাবাহিকভাবে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল। আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এশিয়দের ওপরই পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল, ইউরোপীয়দের ওপর নয়। এসব কিছুর ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপনিবেশের বুদ্ধিজীবীদের চোখ এড়ায়নি। এমে সেজ্যার (Aime Cesaire) তার 'ডিসকোর্স অন কলোনিয়ালিজম' বইয়ে লিখেছিলেন :

বিংশ শতাব্দীর প্রতিটি মানবতাবাদী ও খ্রিস্ট ধর্ম মনোভাবাপন্ন বুর্জোয়ার মনের মধ্যেই একজন করে হিটলার ঘুমিয়ে আছে। তা সত্ত্বেও ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা হিটলারকে ক্ষমা করতে পারেনি, কারণ হিটলার ইউরোপে উপনিবেশের সেই নীতি প্রয়োগ করে বসেছিল, যা তার আগে শুধু আলজিরিয়ার আরব জনগণ, ভারতের কুলি সম্প্রদায় ও আফ্রিকার নিগ্রোদের ওপরই প্রয়োগ করা হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে উপনিবেশে গণহত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম ও শোষণের প্রতিক্রিয়ায় উপনিবেশের মানুষরাও এক সময় পাল্টা সন্ত্রাসে প্ররোচিত হয়েছিল। বিপ্লবী তাত্ত্বিক ফ্রানৎস ফাঁনঁ (Franz Fanon) সে কথা

www.pathagar.com

আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সৈনিক হিসেবে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের ও একই সঙ্গে অত্যাচারিত উপনিবেশিত মানুষের মানসিক তাগিদকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন। ফানঁর পশ্চিমা সমালোচকরা তাকে হিংসার তাত্ত্বিক হিসেবে অভিহিত করেছে; যদিও তিনি আমৃত্যু ছিলেন মানবতাবাদী দার্শনিক। ফানঁর সমালোচকরা তাকে তার বহু পঠিত 'দি রেচেড অব দ্য আর্থ' (The Wretched of the Earth) বইয়ের একটি মাত্র লাইনের ভেতর দিয়ে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে : উপনিবেশের মানুষ নিজেকে হিংসার মধ্যে দিয়ে এবং হিংসার সাহায্যেই মুক্ত করেছে। এর ভেতর দিয়ে ফানঁ বোঝাতে চেয়েছেন, উপনিবেশের নির্যাতিত মানুষরা হিংসাকে বেছে নেয় আত্মরক্ষার জন্য। উপনিবেশিকতাবিরোধী লড়াইয়ে হিংসার যে প্রকাশ, তা মোটেই অযৌক্তিক নয়; তা বরং আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতারই পরিচয় বাহক। ফানঁর মতে, নেটিভদের যে হিংসা, তা অতীতে নিপীড়িতদের প্রতিহিংসার প্রকাশ। এটা তাদের নিজেদের নিপীড়নের ইতিহাসকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আত্মপরিচয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রয়াস। ফানঁ লিখেছেন:

এতদিন যার সম্পর্কে বলা হচ্ছিল যে, একমাত্র বলপ্রয়োগের ভাষাই সে বুঝতে পারে, আজ সে বলপ্রয়োগেরই আশ্রয় নিল... উপনিবেশবাদীরা এতদিন যে যুক্তি দিচ্ছিল, এবার সেই যুক্তিটি সে ঘুরিয়ে দিল তাদের দিকে। নেটিভকে ওই যুক্তি উপনিবেশবাদীরাই সরবরাহ করেছে, এবার ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে, নেটিভরা পাশার দান উল্টে দিয়ে দাবি করল, ঔপনিবেশিকরা কেবল বলপ্রয়োগের ভাষারই মর্ম বুঝতে পারে।

ফানঁর লেখা পড়লে আর একটা জিনিস বোঝা যায় কতটা আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। আজকের ইরাক, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনের মানুষ যে জবরদস্তি মূলক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তাকে কি তাহলে খুব বেশি অসঙ্গত বলা চলে? অথচ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই নেটিভদের প্রতিরোধকে অতীতের মতো 'সভ্যতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস' হিসেবে চোলাই করে চলেছে। ফানঁকে হিংসার প্রবক্তা হিসেবে অভিহিত করার কারণ, তার অপরাধ হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতার আড়ালে থাকা সন্ত্রাসকে তিনি নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং নিপীড়িতের প্রতিরোধকে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন

www.pathagar.com

করতে চেয়েছেন। চিন্তার দিক দিয়ে ভিন্ন পথের হলেও ফানঁর ট্রাজেডিকে একইভাবে বরণ করতে হয়েছিল মিসরের তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবী সাইয়েদ কুতুবকে। ঔপনিবেশিকতা ও উপনিবেশ-উত্তর সেকুলার জাতি-রাষ্ট্রের বর্বরোচিত দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সাইয়েদ কুতুব প্রতিরোধের কথা বলতে গিয়ে জিহাদের এক নতুন তাৎপর্য আরোপ করেন। এই জিহাদকে ঘিরেই আধুনিক সভ্যতার প্রতিভূদের আজ যত বিতর্ক। একই কারণে সাইয়েদ কুতুবের মতো পণ্ডিতকেও পশ্চিমারা আজ সন্ত্রাসের দার্শনিক হিসেবে অভিহিত করে। সাইয়েদ কুতুবের মতে, মুসলিম সমাজের স্বার্থরক্ষা করতে হবে। কোরআনের নির্দেশ হলো, মুসলমানের প্রথম কর্তব্য ন্যায় ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমাজ গড়া, যেখানে দরিদ্ররাও মুক্তির দিশা পাবে। এর পথে প্রধান বাধা হলো ঔপনিবেশিক শক্তি, তাদের প্রতিভূ সরকার এবং নানা রকম কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠী। তাই কুতুবের মতে জিহাদ প্রয়োজন। জিহাদ আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত–সর্বস্তরেই চলবে। ইসলামী ঐতিহ্যে জিহাদকে দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে। একটি জিহাদ আল আকবর–বড় জিহাদ, অপরটি জিহাদ আল আসগর–ছোট জিহাদ। বড় জিহাদ হচ্ছে, নিজের প্রবৃত্তিগত দুর্বলতাকে জয় করার লড়াই। সেই তুলনায় ছোট জিহাদ হচ্ছে আক্রমণকারী বহির্শত্রু ও দুরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আক্রান্তের লড়াই।

কুতুবের মতে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জিহাদের পথ বেছে নেয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। কুতুবের কথা, ইসলামে শুধু এই অধিকারই দেয়া হয়নি বরং দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করা মানুষের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তার কথায় :

অপর মানুষের দাসত্ব থেকে প্রতিটি পুরুষ ও নারীর মুক্তির ঘোষণাই ইসলাম। যেসব সমাজব্যবস্থা বা সরকার অধিকাংশের ওপর অল্পসংখ্যক মানুষের শাসনের নীতির ওপর দাঁড়িয়ে, ইসলাম তারই অবসান চায়। এই বাহ্যিক চাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করে ইসলাম যখন তার নিজস্ব আধ্যাত্মিক বাণীর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন সে তাদের যুক্তিবোধের কাছেই আবেদন জানায়। ইসলামের বাণী গ্রহণ বা বর্জন করার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

দুই দার্শনিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও আধুনিকতার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ফানঁ ও কুতুবের চিন্তার সাদৃশ্যটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের চিন্তার প্রাসঙ্গিকতাও ফেলনা নয়।

www.pathagar.com

তবে একটা জিনিস ভালো করে বোঝা দরকার, ফানঁ ও কুতুবের সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবিরোধী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সঙ্গে জর্জ বুশ, টনি ব্লেয়ার বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের যুদ্ধবাজ নীতির অস্ত্র হিসেবে শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করে, তার সঙ্গে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের জায়গাটা চিহ্নিত করতে না পারলে প্রপাগান্ডার এই যুগে বুশ-ব্লেয়ারদের সন্ত্রাসের খপ্পরে পড়ে আমাদের আত্মহননের পথ বেছে নেয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। সেদিক থেকে আজকের বিদ্যমান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার অসাম্য, অন্যায়, বেইনসাফী, বেঈমানী, শোষণ, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদির বিরুদ্ধে দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের সন্ত্রাসকে কিভাবে বিবেচনা করব, তা অবশ্যই ভাবার বিষয়।

সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণী সব সময়ই মজলুমের লড়াই-সংগ্রামকে 'সন্ত্রাসী', 'উগ্রপন্থা', 'হঠকারী' বলে প্রচারণা চালায়। কারণ প্রতিপক্ষকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা না দিতে পারলে তাকে হত্যা করার কিংবা নির্মূল করার কোনো নৈতিক বৈধতা মিলবে না। মানুষ হত্যা অপরাধ–এই বোধ সবার মধ্যে আছে। কিন্তু সন্ত্রাসী হত্যা করা অপরাধ নয়, কারণ সন্ত্রাসী মানুষ নয়। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে ১৪ লাখ 'সন্ত্রাসী' ইরাকিকে হত্যা করেও পৃথিবীর সবচেয়ে 'সভ্যতম' দেশ। আজকের বিশ্বব্যবস্থায় কোন শ্রেণী কিভাবে 'সন্ত্রাস' ও 'সন্ত্রাসী' শব্দটা ব্যবহার করে এবং কার বিরুদ্ধে ও কোন শ্রেণীর পক্ষে তা খুব ভালো করে বুঝে দেখতে হবে। বিশেষত সন্ত্রাস মাত্রই ইসলামী ব্যাপার–এই বয়ানটা গড়ে ওঠার পেছনে ক্ষমতাধর পশ্চিমের ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থটা কিভাবে কাজ করছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার জরুরি। কে, কখন, কিভাবে সন্ত্রাসী হয়ে যায় আবার মুক্তিযোদ্ধা বনে–তার নানান কাহিনী সব দেশেই আছে। সন্ত্রাসী বদলায়। গতকালের সন্ত্রাসী আজকের দেশপ্রেমিক। আজকের হিরো আগামীকালের টেররিস্ট। আমাদের তিতুমীর, সূর্যসেনকে ব্রিটিশরা বলত টেররিস্ট। আজকে তারা সূর্যসন্তান। আমাদের চোখের সামনে তালেবানদের মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মানিত করেছেন। আজ তারা বিশ্বসন্ত্রাসী। ষাটের দশকে ভিয়েতনামের কমিউনিস্টদের আমেরিকা টেররিস্ট বলত। আজ তারা দেশপ্রেমিক শাসক। সুতরাং আমাদের চোখ, নাক, কান, মুখ সিধা করে ভাবতে হবে,

www.pathagar.com

কাকে সন্ত্রাস বলে, আর কাকে নয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কেন এটা ঘটে এবং কী করে আমরা তা বন্ধ করব। সন্ত্রাসের নানান ধরন আছে। রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অপরাধমূলক সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস–এই সব ধরনের সন্ত্রাসেই জানমালের প্রচুর ক্ষতি হয়। তবু রাজনৈতিক সন্ত্রাস নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় এবং আজকের দুনিয়ায় যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এটি। এই ধরনের সন্ত্রাসের একটাই কারণ আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার অভ্যন্তরে কোনো ইনসাফের জায়গা নেই। একজন পণ্ডিতের কথা মনে পড়ছে : Peace is not the absence of armed conflict, rather it is the establishment of social justice. শান্তির জন্য এই সামাজিক ন্যায়ের কথাটাই হচ্ছে গোড়ার কথা। আজকের বিশ্বব্যবস্থায় সহিংসতা, সশস্ত্রতা, জবরদস্তি, বলপ্রয়োগ, বৈষম্য, পরদেশ লুণ্ঠন, পুঁজিবাদী শোষণ ও প্রাণের সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে খুব বড় জিনিস। এখানে ইনসাফকে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে। দেশ, কাল, সংস্কৃতি নির্বিশেষে এই ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানবমুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, ফ্যাসিবাদের মতো প্রান্তিক বিশ্বাসগুলো, যা এক অর্থে আধুনিকতার পরিণাম, এই ইনসাফের গলায় ফাঁসির রশি ঝুলিয়ে দিতে চায়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বাম বুদ্ধিজীবী একবাল আহমদের একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই, যেখানে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন ন্যায়ের অধিকার অস্বীকার করলে সন্ত্রাস জন্ম নেয়। ফিলিস্তিনিদের উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের আজকের যে আলোচিত সন্ত্রাস, তা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক অধিকার অস্বীকারের পরিণাম ছাড়া কিছু নয় : তাই মনোযোগের কেন্দ্র এক জায়গায়, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, পিএলও ও বিন লাদেন যাকে আপনি বেছে নেন। কেন তারা এটা করে? আমি তাদের আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

প্রথমত, তারা তাদের কথা শোনাতে চায়। ধরুন, আমরা সংখ্যালঘু রাজনৈতিক কোনো সন্ত্রাসবাদীদের কথা বলছি। প্রথমে তারা অন্যদের চোখে পড়তে চায়। সাধারণত কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও তারা চেষ্টা করে নিজেদের দুর্দশার কথা শোনাতে। তারা তা শোনে না। আমাদের সময়ের মহাসন্ত্রাসী ফিলিস্তিনিরা ঘর ছাড়া হলো '৪৮ সালে। '৪৮ থেকে '৬৮

www.pathagar.com

পর্যন্ত তারা বিশ্বের সব বিচারালয়ে গেছে। প্রতিটি দরজায় টোকা দিয়েছে, তাদের বলা হলো–এক আরব রেডিওর প্রচারে–এখন চলে যেতে হবে, সব ছেড়ে; কারণ তারা এখন ঘরছাড়া। এসব কিছুই আর তাদের না–যা ছিল মিথ্যা ঘোষণা। কেউ সত্যে কান পাতল না, শেষে তারা এক নতুন সন্ত্রাসের জন্ম দিল। এটা তাদের আবিষ্কার–বিমান ছিনতাই। '৬৮ থেকে '৭৫ পর্যন্ত তারা গোটা বিশ্বকে কানে ধরে টেনে তুলেছে। আমাদের জাপটে ধরে বলেছে, শোন, শোন। আমরা শুনেছিলাম। সমস্যার কোনো রাহা হয়নি, তবে নিদেনপক্ষে এখন আমরা জানি। এমনকি ইসরাইলিরাও স্বীকার করে। মনে আছে গোল্ডা মেয়ার, ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী '৭০-এ বলেছিলেন, 'কোথাও ফিলিস্তিনিরা নেই। তাদের অস্তিত্ব নেই। অবশ্য তারা এখন আছে, ভালোভাবেই আছে। আমরা তাদের অসলোতে ঠকিয়েছি। নিদেনপক্ষে ঠকার মতো কিছু মানুষ আছে। ফেলে দিতে পারিনি। শ্রুত হওয়ার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। একটা উদ্দেশ্য কাজ করে। মিশ্র রাগ আর অসহায়ত্ব আঘাত করার প্রেরণা জোগায়। আপনি ক্রুদ্ধ, আপনি অসহায়, আপনি এখন প্রতিশোধপরায়ণ, শোষণকে প্রতিশোধ দিয়ে ভেঙে ফেলতে চান। শক্তিশালী দলের বলপ্রয়োগ, রক্তপাতের শিকার যারা, তাদের অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিকভাবে তাদের সন্ত্রাসী করে তোলে। অত্যাচারিত শিশুরা অত্যাচারী পিতামাতা এবং নৃশংস বয়স্ক মানুষে পরিণত হয়। আপনারা জানেন, মানুষ আর জাতির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ ঘটে, অত্যাচারিত হলে প্রত্যাঘাত করে।

যে কণ্ঠস্বর আমরা মুছে ফেলতে চাই, যাদের কথা আমরা শুনতে চাই না, যাদের অস্তিত্ব আমাদের চক্ষুশূল–তারা তাদের হাজিরা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, তাদের কথা বলার নতুন ডিসকোর্স আবিষ্কার করে–তারা কথা শোনানোর নতুন নতুন পথ বের করে। সন্ত্রাস হচ্ছে ভাষা। নিপীড়িতের ভাষা। ফাঁনঁ ও কুতুব যে ভাষার অর্থ উদ্ধার করেছিলেন। আমাদের আজকের কর্তব্য তাই যাদের কণ্ঠস্বর আমরা দাবিয়ে রেখেছি, যাদের মুখ আমরা মুছে ফেলেছি, তাদের মুখ দৃশ্যমান করে তোলা। যদি কথা বলার সুযোগ হয়, সহাবস্থানের সুযোগ মেলে, সমানাধিকারের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, তাহলে তার মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত ও সহিংস সন্ত্রাসের অনেকটাই মোকাবিলা করা সম্ভব।

www.pathagar.com

সিভিল সোসাইটি

১.

ধারণা হিসেবে সিভিল সোসাইটির গুরুত্ব ও ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা আমাদের দেশে সাম্প্রতিক ঘটনা। একাডেমিক স্তরে সমাজবিজ্ঞানে সিভিল সোসাইটি একটি প্রতিষ্ঠিত প্রত্যয় হলেও পত্রপত্রিকা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বুদ্ধিজীবী-ভাবুকদের ডিসকোর্সে সিভিল সোসাইটি বিষয়ক আলোচনা অতীতে এত গুরুত্ব পায়নি। কমিউনিজমের পতন, বিশ্বরাজনীতিতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর একচেটিয়া আধিপত্য, বিশেষ করে আশির দশকে পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠানগত বিরোধিতা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম প্রবল আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সিভিল সোসাইটি বিষয়ক আলোচনা দেশে দেশে মূল্যবান হয়ে ওঠে। এমনি অবস্থায় সমাজের রাজনীতি-সচেতন অংশকে সিভিল সোসাইটি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করার প্রবণতা দেখা যায়। এরপর নব্বইর দশক থেকে বিশ্বব্যাপি নানারকম বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও সামাজিক আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটে, যা কিনা সিভিল সোসাইটিকে একটি তৃতীয় শক্তি হিসেবে উত্থানের ইঙ্গিত দেয় এবং বিকল্প সমাজ ও বিশ্বব্যবস্থা (an alternative social and world order) নির্মাণের সঙ্গে এটিকে যুক্ত করে পশ্চিমা বিশ্বে প্রচার চালানো হয়। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটি নিয়ে বিদ্বৎসমাজে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি প্রতিটি বিষয়ে আজকের এক-মেরু বিশ্বের অধীশ্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাঙ্গাতদের হস্তক্ষেপ বাড়ছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপি মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের আড়ালে মার্কিনিরা আজ যে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে সেটিকে বাংলাদেশেও প্রসারিত করার অভিপ্রায় থেকে সিভিল সোসাইটি নিয়ে আমাদের দেশের 'প্রগতিশীল' ও 'অসাম্প্রদায়িক' বলে কথিত মানুষদের বিশেষ আগ্রহ দেখার মতো। কারণ এরাই হচ্ছে বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির প্রাণভোমরা হিসেবে চিহ্নিত এবং একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সহযোগী-সহমর্মী শক্তি হিসেবে পরিচিত।

যতই আমরা সিভিল সোসাইটি নিয়ে কথা বলি না কেন, এর বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে প্রচুর মতপার্থক্য বিদ্যমান। এর কারণ হচ্ছে, পশ্চিমা

www.pathagar.com

সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এই প্রত্যয়টির উত্থান। যেমন করে পশ্চিমা সমাজ বিবর্তনের ভেতর দিয়ে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি প্রত্যয় বেরিয়ে এসেছে। এক সমাজের জন্য যা লাগসই, অন্য সমাজের জন্য তা ক্ষতিকর। পশ্চিমা সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস দিয়ে আমাদের সমাজ বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা নিরর্থক। সিভিল সোসাইটি তাই পশ্চিমে এক রূপ পেয়েছে, বাংলাদেশের মতো 'অনুন্নত' দেশগুলোতে তার তাৎপর্য ভিন্ন রকম দাঁড়িয়েছে।

কেউ কেউ সিভিল সোসাইটির বাংলা তরজমা করেছেন সুশীল সমাজ, কেউ কেউ নাগরিক সমাজ, আবার কেউ কেউ সিভিল সমাজ। পশ্চিমা সমাজে সিভিল সোসাইটির বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করলে এসব প্রতিশব্দের কোনোটিই আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যথার্থ বিবেচিত হয় না।

সিভিল সোসাইটি প্রত্যয়টি বুঝতে হলে আমাদের আরও দুটো প্রত্যয় বিবেচনা করতে হবে। এ দুটো প্রত্যয় হচ্ছে : সমাজ ও রাষ্ট্র। সিভিল সোসাইটি, সমাজ ও রাষ্ট্র–এ তিনটি প্রত্যয় পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দার্শনিক-সমাজবিজ্ঞানীরা সিভিল সোসাইটিকে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে পৃথক হিসেবে বিবেচনা করলেও এটাও সত্য, সমাজ ও রাষ্ট্র ছাড়া সিভিল সোসাইটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সমাজবিজ্ঞানে সমাজকে 'মানুষের সমাজ', রাষ্ট্রকে 'রাজনৈতিক সমাজ' আর সিভিল সোসাইটিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামগ্রিক রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সিভিল সোসাইটিকে বলা যায় ক্ষমতাচালিত রাষ্ট্র ও বাজারি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সেইসব স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক ও সামাজিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক রূপ যা কিনা একটা কার্যক্ষম গতিশীল সমাজের বুনিয়াদ প্রস্তুত করে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও রাজনৈতিক প্রচারণার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে সিভিল সোসাইটির মূল্য বিবেচিত হয়। আগেই বলেছি, সিভিল সোসাইটির প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সংঘসূচক ও প্রতিনিধিত্বমূলক। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পড়ে স্বাধীন সংবাদপত্র, গণমাধ্যম এবং সব ধরনের সামাজিক সংগঠন। সিভিল সোসাইটিকে আরও ভালোমত বোঝার জন্য লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সের দেয়া একটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করছি :

Civil society refers to the arena of uncoerced collective action around shared interests, purposes

www.pathagar.com

and values. In theory, its institutional forms are distinct from those of the state, family and market, though in practice, the boundaries between state, civil society, family and market are often complex, blurred and negotiated. Civil society commonly embraces a diversity of spaces, actors and institutional forms, varying in their degree of formality, autonomy and power. Civil societies are often populated by organizations such as registered charities, development non-governmental organizations, community groups, women's organizations, faith based organizations, professional associations, trade unions, self-help groups, social movements, business associations, coalitions and advocacy groups.

এসব সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সিভিল সোসাইটি সমাজে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা, মতপার্থক্যের স্বাধীনতা এবং জনমত সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায়। আর এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এই অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে, যারা সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রে নাগরিক বলে গণ্য।

এসব অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলে সিভিল সোসাইটি শক্তিশালী হয় এবং সমাজের মধ্যে এটি যুক্তিশীল ভাবনা-চিন্তার আকর হিসেবে পরিগণিত হয়। মানবাধিকার, আইনের শাসন, স্বাধীনতা ও নাগরিকতা যথার্থরূপে অর্জিত ও প্রতিষ্ঠিত হলে সিভিল সোসাইটি রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি অর্জন করে। এজন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সিভিল সোসাইটি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে এবং কর্তৃত্ববাদী, স্বৈরতন্ত্রী, অগণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলো সিভিল সোসাইটিকে ভয় পায় ও তাকে দুর্বল করার অপপ্রয়াস চালায়। সেই দিক দিয়ে বলা যায়, সিভিল সোসাইটি রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার পথ সুগম করে এবং গণতান্ত্রিকতার প্রাতিষ্ঠানিকতার জন্য অপরিহার্য, তা একরকম বলা চলে। সিভিল সোসাইটি নিয়ে পশ্চিমা ভাবুকদের এই প্রস্তাবনা সেখানকার সমাজের জন্য আকর্ষণীয় ব্যাপার এবং সিভিল সোসাইটি সেখানে জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

সহযোগী শক্তি। কিন্তু বাংলাদেশের মতো 'উন্নয়নশীল' দেশে সিভিল সোসাইটি রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা বিকাশের জন্য ততটা নয়, যতটা পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য। সিভিল সোসাইটি নিয়ে আলোচনার শুরুতে এই মৌলিক বিষয়টি মনে রাখা ভালো।

২.

সিভিল সোসাইটির ইতিহাস বহু পুরনো। সমাজে ইনসাফ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যদি হয় সিভিল সোসাইটির গোড়ার কথা, তাহলে মানুষের সেটা হচ্ছে চিরদিনের আরাধ্য কামনা। তাই মানুষের পক্ষে এর প্রাপ্তি ও অর্জনের ইতিহাসও সভ্যতার মতোই প্রাচীন ঘটনা। সিভিল সোসাইটি বিকাশের প্রথম লক্ষণ ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলোতে। দাস প্রথাভিত্তিক সেই সমাজে জন্মেছিলেন সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতো প্রতিভা। এসব ভাবুক ও দার্শনিক রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্যকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারলেও এটা তারা বুঝেছিলেন, সামাজিক কল্যাণের জন্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা জরুরি। প্লেটো ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন : প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য প্রদান করার নামই ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা হিসেবে এটা অসাধারণ। কারণ এর কোনো আইনগত ভিত্তি না থাকলেও আছে নৈতিক ভিত্তি, যার প্রতিষ্ঠাই পারে মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধন করতে। প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্র বলতে বুঝেছিলেন ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ। যে কারণে এই ভাবুক তৎকালীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক কলহ-বিবাদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনীতিকদের বদলে একজন দার্শনিক রাজা কামনা করেছিলেন, যিনি সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। প্লেটোর গুরু সক্রেটিস বলতেন, সামাজিক সমস্যা ও দ্বন্দ্বকে যুক্তিশীলতার সঙ্গে সমাধান করা দরকার। অন্যদিকে প্লেটোর ছাত্র এরিস্টটল গুরুর মতো নিখুঁত ন্যায়বিচারের অনুসন্ধান করেননি বটে, তবে তিনি মনে করতেন, 'পলিটি' হচ্ছে সর্বোত্তম রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে সংযম, মিতাচার ও সমপ্রমাণের নীতি বিদ্যমান থাকবে।

উল্লেখ্য, এরিস্টটেলই প্রথম 'রাজনৈতিক সম্প্রদায়' শব্দটি ব্যবহার করেন যা পরবর্তীকালে ল্যাটিন ভাষায় সিভিল সোসাইটি রূপে অনূদিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। রোমান শব্দ Societas Civilis প্রথম ব্যবহার

www.pathagar.com

করেন দার্শনিক সিসেরো। যাই হোক এসব গ্রিক ভাবুকের চিন্তাভাবনা পুরো মধ্যযুগজুড়ে ইউরোপের জ্ঞানজগৎকে আলোড়িত করে, যদিও তৎকালীন রাষ্ট্র ও সমাজের কর্তৃত্ববাদী চেহারার বড় একটা পরিবর্তন হয়নি।

রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্ববাদী চেহারা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ইউরোপের আলোকায়ন পর্বে (Enlightenment)। রেনেসাঁ, মানবিকবাদ ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই কালের বুদ্ধিজীবীরা কতগুলো জরুরি প্রশ্ন তোলেন। যেমন : উত্তরাধিকার সূত্রে কী ধরনের বৈধতা অর্জিত হয়? কেন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়? এবং কেন কিছু মানুষের মৌলিক অধিকার অন্যদের তুলনায় বেশি হয়?

এগুলো তাদেরকে রাজনৈতিক ও নৈতিক কর্তৃত্বের বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে উৎসাহ জোগায়, কর্তৃত্ববাদের পেছনের কারণ খুঁজতে প্রাণিত করে এবং কর্তৃত্ববাদকে অতিক্রম করার পন্থাগুলো নিয়েও নাড়াচাড়া করতে সাহায্য করে। এই নতুন চিন্তা ও পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই কালের ভাবুকরা সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের বিকাশ ঘটান। যা কিনা স্বাভাবিক আইনের আওতায় সামাজিক সম্পর্কগুলো নবায়নের ওপর জোর দেয়। এ সময়ের দু'জন বড় দার্শনিক হলেন টমাস হবস ও জন লক। এরা মনে করতেন, মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 'সামাজিক চুক্তির' আওতায় সম্ভব হবে। হবসের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করে। এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্যই মানুষ সার্বভৌম শক্তি প্রথমে নিজে প্রতিষ্ঠা করেও সেই সব ক্ষমতা রাষ্ট্রের কাজে হস্তান্তর করে। লকের মতে, সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ সীমিত উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত হবস ও লকের থেকে ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম চিন্তানায়ক রুশোর ধারণা ভিন্ন। রুশোর বিবেচনায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তারা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্প্রদায় তথা রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। এভাবে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটেলের চিন্তায় সিভিল সোসাইটি নামক যে ধারণার পূর্বাভাস প্রতিফলিত হয়েছিল, ইউরোপীয় ইতিহাসের নানা বিবর্তনের ধারায় তা দার্শনিক লক, হবস ও রুশোর ভেতর দিয়ে হেগেল, মার্কস ও গ্রামসিতে এসে উপনীত হয়।

এতকাল সিভিল সোসাইটি নিয়ে যেসব চিন্তা-ভাবনা চলছিল, দার্শনিক ফ্রেডারিখ হেগেল তার মূলে আঘাত হানলেন। হেগেল বললেন, পুঁজিবাদ

www.pathagar.com

বিকাশের একটি পর্বে সিভিল সোসাইটির উদ্ভব এবং এর দ্বারা পুঁজিবাদের স্বার্থই রক্ষিত হবে। যেহেতু পুঁজিবাদের গর্ভে সিভিল সোসাইটির জন্ম, তাই এর দ্বারা বৈষম্য দূরীভূত হবে না। উল্টো বৈষম্য ও দ্বন্দ্বই হবে এর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সিভিল সোসাইটির ওপর রাষ্ট্রের নজরদারি প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করলেন।

হেগেলের চিন্তা থেকে একধাপ এগিয়ে কার্ল মার্কস বললেন, সিভিল সোসাইটি হচ্ছে সেই বুনিয়াদ যার ওপর নাকি উৎপাদিকা শক্তি ও সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারগুলো ঘটছে, অন্যদিকে রাষ্ট্র হচ্ছে উপর কাঠামো। মার্কস বললেন, সিভিল সোসাইটি বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করছে। উপর কাঠামো হিসেবে রাষ্ট্রও ওই বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন করে। এভাবে মার্কস হেগেল বর্ণিত রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকাই অস্বীকার করলেন না, রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটি উভয়কেই পুঁজিবাদের পক্ষাবলম্বনকারী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

ইতালির কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক আন্তনিও গ্রামসি অবশ্য মার্কসের সঙ্গে একমত না হয়ে সিভিল সোসাইটিকে সমস্যার উৎস না ধরে সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে বর্ণনা করেন। গ্রামসির সঙ্গে একমত হয়ে এখনকার নব্য বামপন্থীরা রাষ্ট্র ও বাজারের আধিপত্য থেকে মানুষকে রক্ষা করতে সিভিল সোসাইটির ওপর জোর দিচ্ছেন। অন্যদিকে নব্য উদারনীতিকরা কমিউনিস্ট ও কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সিভিল সোসাইটিকে ব্যবহার করার কথা বলছেন।

৩.

বাংলাদেশের মতো 'উন্নয়নশীল' দেশ বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে সিভিল সোসাইটির ধারণা বিকশিত হয়েছে ঔপনিবেশিকতার সূত্রে। ঔপনিবেশিক কাঠামোর আওতায় সেদিন তাই এক বিকৃত সিভিল সোসাইটির ধারণা পল্লবিত হয়েছিল। তারই সিলসিলা আজও আমরা বহন করছি। মনে রাখা দরকার, ইউরোপে যে সিভিল সোসাইটি বিকশিত হয়েছিল তা তৃতীয় বিশ্ব বা মুসলিম দুনিয়ায় বেড়ে ওঠা সিভিল সোসাইটি থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। যেমন আমাদের দেশে ইংরেজের শিক্ষায় এবং ইংরেজের উৎসাহে সিভিল সোসাইটির ধারণা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ কারণেই পাশ্চাত্যের সিভিল সোসাইটি কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করার জন্য কাজ করেছে এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার

www.pathagar.com

পক্ষে ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে আমাদের মতো উপনিবেশিত দেশগুলোতে সিভিল সোসাইটি ঔপনিবেশিক প্রভুর চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন করেছে এবং সেটাকেই সিভিল সোসাইটি বলে চালানো হয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজের সমর্থনে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজি শিক্ষিত বাবু বুদ্ধিজীবীদের এক জগৎ গড়ে উঠেছিল। তৎকালে বাংলাদেশের সামাজিক নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগে এরাই নানারকম সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তোলে। কিন্তু এসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান সেদিন কর্তৃত্ববাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। ইংরেজ তার ক্ষমতার প্রতাপে সামাজিক নেতৃত্বের ভার সেদিন একদল রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, স্যার, জমিদারদের ওপর ন্যস্ত করে। এরা ছিল মোটের উপর সবাই ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থারই সমর্থক। ইংরেজ আসার আগে মুসলিম সমাজের গতিশীলতা ছিল না, এই প্রচারণা ইতিহাসসম্মত নয়। ঔপনিবেশিক কাঠামোর ভিত মজবুত হওয়ার আগে মুসলিম সমাজের গতিশীলতা সচল রাখার পেছনে আলেম সমাজের এক বিরাট ভূমিকা ছিল। কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার বিপ্লবী ঐতিহ্যও ছিল তাদের। মোগল আমলে মুজাদ্দেদ আলফেসানি, মোগল আমলের শেষ দিকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ আবদুল আজিজের ভূমিকা মূলত কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা ভেঙে ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকেই উৎসাহ জুগিয়েছিল। মুসলিম ইতিহাসে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আলেমদের লড়াইয়ের নজির ভূরি ভূরি। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতো কালজয়ী প্রতিভারা শুধু জ্ঞান সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেননি, তারা কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা ভেঙে সমাজে আদল, ইহসান ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। তারা চেয়েছিলেন এক দারুল আমান (City of peace and security) প্রতিষ্ঠা করতে। এই দারুল আমান হচ্ছে ধারণাগত দিক দিয়ে পশ্চিমের সিভিল সোসাইটির বিকল্প ইসলামী ডিসকোর্স। ইংরেজ আসার পর মুসলিম সমাজের নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে আলেম সমাজকে সঙ্কুচিত করে ফেলা হয়, কারণ তারা জানত আলেমরা ঔপনিবেশিকতা ও গোলামির বিরুদ্ধে। এজন্যই তারা একদল খানবাহাদুর, রায়বাহাদুর, চৌধুরী, জমিদারদের মতো তোতাপাখি সৃষ্টি করে, যারা ইউরোপ বলতে অন্ধ। এদের মানসজগৎ অনেকটা ইউরোপীয় ছায়ায় ঢাকা পড়ে এবং মুসলিম বা দেশজ ব্যক্তিমানসের ক্ষেত্রে আইডেনটিটির অভাব প্রকট হয়ে

www.pathagar.com

দেখা দেয়। সেই কালে যারা পাশ্চাত্যমুখী ছিলেন, ইংরেজরা পাততাড়ি গুটালেও আমাদের সেই বুদ্ধিজীবী ক্লাসের হাতেই রয়ে যায় বিশ্বস্ত দায়িত্বভার। আজ আমাদের মতো তৃতীয় দুনিয়ায় যে সিভিল সোসাইটির কার্যক্রম দেখছি তা সেই ইংরেজ সৃষ্ট তোতাপাখির ধারাবাহিকতা মাত্র। সেকালের চৌধুরী-জমিদারদের ভূমিকায় নেমেছে আজকের সিভিল সোসাইটি। এ কারণেই সিভিল সোসাইটি নামের যেসব প্রতিষ্ঠান এখানে আছে, সেখানে কোনো প্রভাবশালী বিজ্ঞ আলেম নেই, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কোনো বুদ্ধিজীবী নেই। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত কোনো গণমাধ্যম, এনজিও, ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিও সেখানে লক্ষণীয়। সিভিল সোসাইটি বলতে এখানে যা আছে তা পশ্চিমাদের সর্বাত্মক সাহায্যপুষ্ট (নৈতিক ও আর্থিক উভয় অর্থে)। এরা পশ্চিমা ঘেঁষা, পশ্চিমা চেতনা ভারাক্রান্ত এবং পশ্চিমের ওপর বিপজ্জনকভাবে নির্ভরশীল। এরা উন্নতি ও প্রগতি বলতে ইউরোপ-আমেরিকার দুনিয়াকে বোঝায়। গণতন্ত্র বলতে পশ্চিমাদের ইচ্ছামাফিক গণতন্ত্রকে বুঝে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য সুনিশ্চিত। জাতীয় রাজনীতি, জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় সংস্কৃতির উত্থান তাদের কাম্য নয়। তারা সুশাসনের পক্ষে বলে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলে এই কারণে নয় যে বাংলাদেশ তথা অপশ্চিমা দেশগুলোর সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে। ওই শ্লোগানের আড়ালে তারা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলোর শোষণ-লুণ্ঠন-জুলুম-অপচার-হস্তক্ষেপকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চায়। কমিউনিজমের পতনকালে পূর্ব ইউরোপসহ বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো সিভিল সোসাইটিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। একইভাবে সিভিল সোসাইটিকে আজ তারা ব্যবহার করছে ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। জঙ্গি, বর্বর, অকার্যকর রাষ্ট্র ইত্যাদি শ্লোগানের তলায় পশ্চিমারা আজ যে ইসলামবিরোধী ক্রুসেড শুরু করেছে, তার সহযোগী শক্তি হিসেবে সিভিল সোসাইটি দেশে দেশে কাজ করে চলেছে। সিভিল সোসাইটির লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল করার নামে ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াকু চেতনা শেষ করে দেয়া। সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির আরেক নাম হচ্ছে তথাকথিত সিভিল সোসাইটি। এজন্য সাধারণভাবে ইসলামী আদর্শ ও চেতনার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় দালাল সিভিল সোসাইটির অবশ্যকর্তব্য হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

এ মুহূর্তে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্ব তথা তৃতীয় বিশ্বের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ এবং এর পক্ষে আমাদের মতো দেশগুলোতে বৈধতা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে তথাকথিত সিভিল সোসাইটি। এটা এখন সবারই জানা, সিভিল সোসাইটি নানা রকম তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালায়। নোয়াম চমস্কির Manufacturing consent যারা পড়েছেন তারা এদের কাজের ধরন বুঝতে পারবেন। মতামত তৈরি করা এবং সেই মতামত নিজের পক্ষে ব্যবহার করা সাম্রাজ্যবাদী কৌশলেরই অংশ। কমিউনিজমের পতনের পর থেকে ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীকে নিয়ে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া এক বিশেষ ধরনের ধারণা বা ইমেজ নির্মাণ করতে উৎসাহী হয়ে পড়েছে। এরা সন্ত্রাসী, বর্বর, সভ্যতার জন্য বড় রকমের হুমকি। এই নির্মাণ পশ্চিমা যুদ্ধ কৌশলের অংশ। ইসলাম সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়, ইসলামের বর্বরতা, ধর্মান্ধতা, অসভ্যতা, ফতোয়াবাজি, বোরকা, ইসলামী আইনের আওতাভুক্ত তালাক, দোররা, বিশেষ করে ইসলামপ্রধান সমাজে নারীর 'মানবেতর' অবস্থার রগরগে কেচ্ছা এখন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই। পশ্চিমের ইসলামবিরোধিতা, ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের পরিচালিত ক্রুসেড একটা যুদ্ধাবস্থারই নমুনা মাত্র। একটা যুদ্ধ অবশ্যই চলছে। এটা শুধু ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তানে পরিচালিত দৃশ্যমান যুদ্ধ থেকে বোঝা যাবে না। তামাম ইসলামী দুনিয়াজুড়ে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিরোধিতার নামে ইসলামের বিরুদ্ধে হামলার চরিত্র ও কৌশল থেকেও এটা বোঝা দরকার। আগেই বলেছি, সাম্রাজ্যবাদের এই ইসলামবিরোধী যুদ্ধের একনিষ্ঠ পার্টনার হচ্ছে বাংলাদেশ তথা তৃতীয় দুনিয়ার সিভিল সোসাইটি নামের গালভরা প্রতিষ্ঠানগুলো।

সুতরাং আমাদের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষার খাতিরে এ ধরনের আত্মঘাতী সিভিল সোসাইটির বিরুদ্ধে এক প্রবল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার, যাতে সম্পৃক্ত হবেন আলেম, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুদ্ধিজীবী, মিডিয়া কর্মী, সংস্কৃতি কর্মী, দেশপ্রেমিক এনজিও ও নানা পেশার মানুষ। নতুন কালের এই সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকবে 'চৌধুরী-জমিদারদের' সিভিল সোসাইটি নয়, দাবুল আমান নামের গণমানুষের নতুন সামাজিক শক্তি ও সংঘ। দাবুল আমান হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের নতুন বিপ্লবী সূতিকাগার।

www.pathagar.com

অকার্যকর রাষ্ট্র

১.

'স্বৈরাচারী' সাদ্দাম হোসেনের জামানা শেষে মার্কিন কর্তৃত্বাধীন 'মুক্ত' ইরাক এখন গণতন্ত্রের ধারক। সেখানে আজ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। তবু কেন সেখানকার মানুষ এখনও সন্ত্রস্ত, ভীত? কেন সেখানকার জনগণ আজ সোচ্চার হয়ে বলছে, ইরাক ইরাকিদের জন্য, বিদেশি সৈন্য ফিরে যাও। 'অত্যাচারী', 'স্বৈরাচারী' সাদ্দামের শাসনের অবসানে ইরাকি জনগণ কি তাহলে খুশি নয়? তারা কি এই মুক্তি চেয়েছিল?

বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে সন্ত্রাসী ও শক্তিমান রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ফি-বছর অকার্যকর রাষ্ট্রের একটি তালিকা নবায়ন করে। সেই তালিকায় ইরাকের নাম বহাল তবিয়তে আছে। আমেরিকা তাহলে ইরাকিদের জন্য কি মুক্তি এনে দিল?

ভাবতে কষ্ট হয়, ইরাকের মতো একটি সৌন্দর্যময় দেশ আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। মনে পড়ে বাগদাদ, বসরা, নাজাফ, বিখ্যাত সেই কারবালা; মনে পড়ে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা, অ্যারাবিয়ান নাইটস আর হারুন আল রশীদের দেশ এই ইরাক। আমরা বাঙালি মুসলমান কারবালার কথা ভাবলেই 'হায় হাসান, হায় হোসেন' আর্তনাদ শুনি–মনে পড়ে যায় যৌবনে পড়া মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র কথা। কোন শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের বুক বিষাদে ভরে যায়নি সে বই পড়ে! সেসব এখন মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনার অধীন; গোলাগুলি ও ট্যাঙ্কের হুঙ্কারে কারবালা প্রান্তরের নির্জনতা বিঘ্নিত আজ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ইরাক সমগ্র আরব দুনিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। এটা শুধু তার পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার ঐতিহ্যের কারণে নয়, প্রধানত তার তেলসম্পদের জন্য। বর্তমান যুগে তেল হচ্ছে আসল সোনা। সারা পৃথিবীর তেল রপ্তানির একটা বিরাট অংশ আসে ইরাক থেকে। তেলসম্পদে ধনী ইরাকের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি নির্ধারিত হতো তার সমৃদ্ধ অর্থনীতির দ্বারা। ডলারের থেকে একসময়

www.pathagar.com

ইরাকি দিনারের কয়েকগুণ দাম বেশি ছিল। সেই ইরাক আজ অকার্যকর রাষ্ট্র।

কী করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রত্যক্ষ নারকীয় সামরিক হামলার মাধ্যমে ইরাককে অকার্যকর রাষ্ট্র বানিয়ে দিল, তা তো আমরা চোখের সামনেই দেখলাম। একইসঙ্গে ইরাকের মূল্যবান সম্পদ নানা বাহানায় হাতিয়ে নেয়ার জন্য যেসব ধ্যান-ধারণা প্রচারের প্রয়োজন হয়, তারও একটা মহড়া আমরা এই সুবাদে দেখে নিলাম।

ইরাকের মতো একই অবস্থা আফগানিস্তান, সোমালিয়া, সুদান, নাইজেরিয়া এমনকি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের। এসব রাষ্ট্র অকার্যকর, কারণ এখানে ইসলামী মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সুতরাং ইসলামী মৌলবাদ ঠেকাতে হবে। ভাবটা এমন–ইসলামী মৌলবাদ না থাকলে দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব থাকত না।

যে সাদ্দামকে মার্কিনিরা 'মৌলবাদী' ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে, সেই সাদ্দামকে তারাই আবার নির্জলা এক প্রহসনের ভেতর দিয়ে হত্যা করেছে। সুতরাং মৌলবাদ-বিরোধিতা একটা বড় রকমের তামাশা ছাড়া কিছু নয়। একসময় পশ্চিমাদের কমিউনিজমের বিরোধিতার দরকার ছিল, এখন ইসলাম-বিরোধিতার দরকার হয়েছে। কারণ, সারা দুনিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার ও সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য এটা প্রয়োজন। মতাদর্শিকভাবে ইসলামকে পরাস্ত করতে না পারলে এই একচেটিয়া আধিপত্য ও লুণ্ঠন সম্ভব নয়। তাই তারা ইসলামী মৌলবাদ নামক ধ্যান-ধারণার বিপরীতে পাল্টা ধ্যান-ধারণা ছুড়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। পশ্চিমের সেসব ধ্যান-ধারণা প্রচার করে তাদের মিডিয়া, তাদের তাঁবেদার এনজিও, ওদের কাছে মাথা বিক্রি করে দেয়া বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা।

অতএব, ইসলাম-বিরোধিতা, ইসলামকে বর্বর ধর্ম বানানো, ইসলামপ্রধান সমাজকে অসভ্য ও পশ্চাৎপদ প্রমাণ করা–এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মতাদর্শিক আধিপত্য কায়েমের লড়াই। বুঝতে হবে অকার্যকর রাষ্ট্রের তত্ত্ব কতটা ওই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য, আর কতটা হানাদার সাম্রাজ্যবাদী হামলা ও হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টির জন্য।

www.pathagar.com

এটা সত্য–ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা যে কোনো সমাজের জন্য ক্ষতিকর। সেই অর্থে পশ্চিমা আধুনিকতাও এক ধরনের মৌলবাদ। পুঁজিতান্ত্রিক, শিল্প-সভ্যতানির্ভর বিশ্বব্যবস্থার যে বিভীষিকা আমরা দেখছি, ধর্মীয় মৌলবাদের চেয়ে সেটি কোনো অংশে খাটো নয়।

মৌলবাদ শব্দটা সাধারণত ইতিহাসের একটা সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখা হয়। সেভাবেই ধর্মকে মধ্যযুগের সঙ্গে একাত্ম করা হয়, যদিও এসব ধ্যান-ধারণা আমরা পেয়েছি পশ্চিমের সূত্রে। কিন্তু এটা তো একটা বর্ণনামূলক অর্থ বহন করে, বিশ্লেষণমূলক নয়।

কিসের ভিত্তিতে আমরা স্থির করি, ধর্ম আমাদের পিছু টেনে রেখেছে আর আধুনিক যুগ সব যুগের শ্রেষ্ঠ, পশ্চিমা সভ্যতাই সভ্যতার একমাত্র মডেল। আজকে যে বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা গড়াগড়ি খাচ্ছি, সেটা মধ্যযুগের চেয়ে কী অর্থে ভালো–এই গুরুতর প্রশ্নের বিচার জরুরি, কেননা সমাজকে আমরা যেভাবে পশ্চিমা ছকের মধ্যে ফেলে প্রগতিবাদী ও মৌলবাদীতে ভাগ করে রেখেছি, তাতে আমাদের কোনো উপকারে আসছে না। যদি পশ্চিমই আমাদের সভ্যতার মডেল হয়, তাহলে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে নিজ ধর্ম ও সমাজকে ঘৃণা করার যে সবক আমরা পেয়েছি, সেটাই তথাস্তু। যদি পশ্চিমা সভ্যতা সভ্যতার একমাত্র মডেল না হয়, তখন?

সাদ্দাম হোসেন স্বৈরশাসক ছিলেন সত্য, কিন্তু তার শত্রুরাও বলতে পারবে না, তিনি মৌলবাদী ছিলেন। তার জামানায় তিনি ইরাকি সমাজকে প্রগতির পথে টেনে নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তারপরও তাকে সেই গ্রিক ট্রাজেডির হিরো বনতে হলো কেন? তার অপরাধ, তিনি পশ্চিমা কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। না হলে আরব দুনিয়ায় যেসব আমীর, রইস, রাজা, বাদশারা শাসন করছেন তারা কেউই সাদ্দামের তুলনায় গণতান্ত্রিক নন, তার থেকে কম অত্যাচরীও নন। তবে তারা কেউই আমেরিকা তথা পশ্চিমের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেননি বরং পশ্চিমের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়েই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। মৌলবাদী কিংবা অমৌলবাদী যেই বা যারা পশ্চিমা কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে চায় তারাই অকার্যকর। আর এরকম অকার্যকর কিছু প্রমাণ করা গেলেই নিরাপত্তার

www.pathagar.com

অজুহাতে পশ্চিমাদের আগ্রাসনের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। একই কারণ দেখিয়ে পশ্চিমারা যে কোনো দেশে সামরিক অভিযান চালাতে পারে কিংবা সেই রাষ্ট্রে তাদের মনমত সরকার বসিয়ে দিতে পারে।

২.

অকার্যকর রাষ্ট্রসংক্রান্ত তত্ত্ব বা বয়ান আমরা এখন হরহামেশা শুনতে পাই। বিশেষ করে ইসলামপ্রধান দেশগুলো সম্বন্ধে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ও একাডেমিক মূল্যায়ন আমাদের কমবেশি জানা। সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির কথা বিবেচনা করেই এখন আমাদের অকার্যকর রাষ্ট্র কথাটা বোঝা চাই। তাছাড়া অকার্যকর রাষ্ট্র নিয়ে যে একটা তত্ত্বগত তর্ক আছে, সেটাও জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। ম্যাক্স ওয়েবার বলেছিলেন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের বল প্রয়োগের বৈধতা থাকতে হবে। না হলে সেটা আজকালকার ভাষায় ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে যাবে। সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র সেই অর্থে একটা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র কিনা, সেই তর্ক এখানে উঠতেই পারে। আর সেই সন্ত্রাস করার ক্ষমতা যখন রাষ্ট্র হারায় তখন তাকেই বুঝি বলে অকার্যকর রাষ্ট্র। ম্যাক্স ওয়েবারের কথামত আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সবচেয়ে বড় বল প্রয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র। সুতরাং ওটি হচ্ছে একদিকে সবচেয়ে সফল রাষ্ট্র, অন্যদিকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রও বটে।

আজকে যে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা আমরা পেয়েছি, তাও কিন্তু উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত; একইসঙ্গে যুক্ত পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে। এর বৈষয়িক ও ধারণাগত উৎপত্তিও ওই ঔপনিবেশিক হানাদার পশ্চিমে। কাজে-কাজেই ওই পশ্চিমের বা পুঁজিবাদী সভ্যতার ছকের বাইরে যারাই আছে তারাই তো ব্যর্থ, অকার্যকর। নির্বিচার আধুনিকতাও এক ধরনের মৌলবাদ। সেই মৌলবাদী জমিনে দাঁড়িয়েই পশ্চিম নিজে ছাড়া অন্য সবাইকে ব্যর্থ ভাবতে অভ্যস্ত। পশ্চিমের Fund for Peace নামে একটা সংস্থা অকার্যকর রাষ্ট্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে। সবার বোঝার জন্য সেগুলোকে একত্র করে উদ্ধৃত করছি :

১. অকার্যকর রাষ্ট্র নিজ ভূখণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব কিংবা সেখানে একচ্ছত্র বলপ্রয়োগে ব্যর্থ।

www.pathagar.com

২.আইনগত কর্তৃত্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অকার্যকর রাষ্ট্র অপারগ।
৩.অকার্যকর রাষ্ট্র জনকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে না।
৪.আন্তর্জাতিক সমাজের পূর্ণ সদস্য হিসেবে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে অকার্যকর রাষ্ট্র কাজ করতে পারে না।

তার মানে একটি কেন্দ্রীয় সরকার যখন এত দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে যে, নিজ ভূখণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব হারায়; জনকল্যাণে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না, কিংবা নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে না। দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নে দেশ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শরণার্থীর চাপ, মেধা পাচার, সংখ্যালঘু নির্যাতন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা, মাদক ব্যবসা, কালোবাজারি, পুঁজি পাচার প্রভৃতিতে বেসামাল হয়ে পড়লে তাকে অকার্যকর রাষ্ট্র বলা যায়। একইসঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শ্রেণিবৈষম্য, আমলাতন্ত্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ, আইনি ব্যবস্থা ভেঙে পড়া, রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ, রাষ্ট্রের ক্ষমতা উপেক্ষাকারী নেতৃত্বের আবির্ভাব, রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র অথবা সমান্তরাল প্রশাসন, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, মৌলবাদ প্রভৃতির বিস্তার কিংবা সেই দেশকে যদি ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী হানাদার বাহিনী দখল করে নেয়, তখন একটি রাষ্ট্র অকার্যকারিতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

ব্যর্থ রাষ্ট্রের এই সমস্যা তো সভ্যতার মতোই পুরনো। সভ্যতার উত্থান-পতন যেমন আছে, তেমনি রাষ্ট্রেরও আছে। রাষ্ট্রের সফলতা আছে, ব্যর্থতা আছে। রাষ্ট্রের টিকে থাকা, না থাকা তার কার্যকারিতার কিংবা রাষ্ট্রনায়কদের দূরদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে। ইতিহাসে কত রাষ্ট্র বিলীন হয়ে গেছে, আবার কত রাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছে। সেটা হয়েছে ইতিহাসের চলমানতার স্বার্থেই। কিন্তু ইতিহাসের গতি-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যা ঘটছে, আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেই ব্যাপারটি তত্ত্বের আকারে এনে তাদের অভিসন্ধি কার্যকর করার চেষ্টা করছে–এ দুটো ব্যাপার পৃথকভাবে আমাদের বুঝতে হবে। এই সব রাষ্ট্র ব্যর্থ কিনা, ব্যর্থ হলে তা কি কারণে অথবা সেই ব্যর্থতার অন্ধকার থেকে উত্তরণের উপায় কি সেই ব্যাপার নিয়ে একটা রাষ্ট্রনৈতিক বা বৌদ্ধিক তর্ক উঠতেই পারে। কিন্তু দেখার

www.pathagar.com

বিষয় হচ্ছে সেই তর্ক যেন সাম্রাজ্যবাদী কোন অভিসন্ধি পূরণ না করতে পারে।

যদি দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন আর মৌলবাদই একটা রাষ্ট্রকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানায় তাহলে ব্রিটেন, ভারত, ইসরাইলও তো ব্যর্থ রাষ্ট্র। নাকি? পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। আমরা যে গণমাধ্যমগুলোয় দিনের পর দিন দেখলাম ব্রিটেনের মন্ত্রী, এমপি, লর্ডস সভা, কমন্স সভার মাননীয় সদস্যরা দলে দলে নির্বিচার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন, অবৈধ সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন–তবু তো ওই দেশটিকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের দুর্নাম কুড়াতে হয়নি। কারণ ওটি তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশ নয় বা কোনো মুসলিম দেশও নয়। তাহলে নিশ্চয়ই এতদিনে ওটিকে সংঘবদ্ধ পশ্চিমা প্রচারণার শিকার হতে হতো।

বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানে কখনও মৌলবাদীরা ক্ষমতায় যায়নি। কিন্তু ভারতে গেছে। বিজেপির মতো একটি মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল দাপটের সঙ্গে বহুদিন ভারত শাসন করেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তানে আর যাই হোক, মৌলবাদীরা রাষ্ট্রীয় মদতে গুজরাটের মতো ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটায়নি। এত বড় ঘটনার পরও ভারত ব্যর্থ রাষ্ট্র নয় কেন? কারণ, ভারতের প্রধান ধর্ম ইসলাম নয়।

পাকিস্তানে কিংবা সুদানে যখন ইসলামী আইনকানুন চালুর সিদ্ধান্ত হয়, তখন তাকে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে গালমন্দ করা হয়। কিন্তু একটি ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেয়া ইসরাইল এক অদ্ভুত সৃষ্টি। তার ভিত্তি ইহুদিবাদ ও ইহুদি ধর্ম। ইসলামী মৌলবাদের বিরুদ্ধে এন্তার সমালোচনা করা যায়, কিন্তু ধর্মান্ধ, জাতিবিদ্বেষী ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়া যেন রীতিমত গুনাহ। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো এই ইহুদি রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে নারাজ তো বটেই, এমনকি সবসময় তারা এই ধারণা দিয়ে থাকে–এটি একটি মহান, আধুনিক, গণতন্ত্রী ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র। ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়া মানে হিটলারের মানসিকতা ধারণ করা।

www.pathagar.com

পশ্চিমারা আর কত চোখে ধূলি দেবে? দুনিয়ার মজলুম মানুষের চোখ খুলতে এখনও কি বাকি আছে? তাহলে অকার্যকর রাষ্ট্রতত্ত্ব কার স্বার্থে আর কার বিপক্ষে? ইরাকের মতো ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকায় যারা আসছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পশ্চিমের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সামরিক, মতাদর্শিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে। সেই স্বার্থের অনুকূল বা প্রতিকূল হাওয়া বিবেচনা করে অকার্যকর রাষ্ট্রতত্ত্বকে পশ্চিমারা পেলেপুলে রাখে। পশ্চিমের ভূ-রাজনৈতিক-সামরিক কৌশল এত সূক্ষ্ম, ইচ্ছে করলেই যে কোনো অপশ্চিমি রাষ্ট্রকে তারা প্রায় রাতারাতি অকার্যকর-ব্যর্থ রাষ্ট্র বানিয়ে দিতে পারে। ধনবাদী শিল্প-সভ্যতা এমনই একটা অন্ধ শক্তি, যা পুরো বিশ্বকে অধীনস্থ করতে চায়। আবার পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা যেহেতু পশ্চিমের খ্রিস্টীয় সভ্যতারই একটা বিবর্তিত ও আধুনিক রূপ, তাই এদের জাত এবং আদি শত্রু ইসলামের হাত মুচড়ে দিতেই সুখটা বেশি। পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প-সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের বিরোধটা মৌলিক। এই ভেদ-বিভাজনের জায়গাটায় এসে পশ্চিমারা আজ অকার্যকর রাষ্ট্রের এক তত্ত্ব ছুড়ে দিয়েছে ইসলামপ্রধান রাষ্ট্রগুলোর দিকে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ইসলামের মৌলিক দার্শনিক-রাজনৈতিক প্রস্তাবনার আবেদন মানবসমাজের কাছে এখনও অনেক গভীরে। তাই অকার্যকর রাষ্ট্রের মতো ঠুনকো আর বেহায়া তত্ত্ব দিয়ে ইসলামকে আপাত কোণঠাসা করার চেষ্টা করা যেতে পারে; কিন্তু তার নৈতিক-দার্শনিক ভিত্তিকে টলানো সম্ভব নয়। ইসলামের উত্থান ঘটেছিল 'আইয়ামে জাহেলিয়ার' অন্ধকার ফুঁড়ে। সেই আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগ কি শেষ হয়েছে? মানুষের অন্ধকার এখনও কাটেনি। সে এখনও পুঁজিবাদের দাস, ভোগবাদের দাস, আত্মস্বার্থপরতার দাস।

বেইনসাফি, বেইমানি, জুলুম আজও রাজত্ব করছে। ফলে আজকের এই পুঁজিতান্ত্রিক জুলুমবাজির বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। দেখার বিষয় হচ্ছে, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে ইসলাম তার নৈতিক আর দার্শনিক শক্তি নিয়ে আজ কতখানি দাঁড়াতে পারে।

www.pathagar.com

ভালো মুসলমান, মন্দ মুসলমান

নিউইয়র্কে ৯/১১-এর ঘটনার পর থেকে পশ্চিমা মিডিয়ার সুবাদে ইসলাম ও মুসলমান নামীয় ব্যাপারটা যেন একটা রাজনৈতিক পরিচয়ের তকমা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম আর মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসী–এই সহজ সমীকরণটা প্রতিষ্ঠা করার 'মহান দায়িত্ব' যেন স্বেচ্ছায়, নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে পশ্চিমের নীতি-নির্ধারক, বুদ্ধিজীবী, সর্বোপরি প্রবল মিডিয়া। সেখানকার আলোচনা, লেখালেখি ও মতামত বিশ্লেষণ করলে একটা ধারণা হতে পারে, পৃথিবী আজ এক সর্বগ্রাসী ধ্বংসের দিকে ধেয়ে চলেছে, যার জন্য দায়ী পাপিষ্ঠ মুসলমানের দল! এরা দুনিয়াজুড়ে সন্ত্রাসের জাল বিছিয়ে রেখেছে। ইরাকের সাদ্দাম হোসেন, ইরানের মোল্লা, বিন লাদেনের দুনিয়াজোড়া শিষ্যকুল দেশে দেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে চলেছে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার অরাজকতা, গণহত্যা–সবকিছুর মূলেই একই ভূত কাজ করছে। সুতরাং এই ভূতের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে ন্যায়নিষ্ঠ, মঙ্গলকামী মানুষের একমাত্র দায়িত্ব। এই 'দায়িত্বটাই' পালন করছে আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ যুদ্ধ তাদের কাছে রীতিমত ধর্মযুদ্ধ, প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষায় 'ক্রুসেড'। অন্যায়, অধর্মের বিরুদ্ধে তাদের তাই নিরবচ্ছিন্ন লড়াই।

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাদের বিখ্যাত Manifesto of the Communist Party পুস্তিকাটি একটা বাক্য দিয়ে শুরু করেছিলেন : A specter is haunting Europe -the specter of Communism.

এরপর রুশ বিপ্লব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয়–এই দীর্ঘ সময়জুড়ে ইউরোপ শুধু কমিউনিজমের ভূত খুঁজে বেড়িয়েছে। আজকে পশ্চিমা গণমাধ্যম, লেখালেখি, মিডিয়া উপস্থাপনা দেখে যে কারো মনে হতে পারে, নতুন এক ভূত আজ পশ্চিমা সভ্যতাকে তাড়া করে ফিরছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, সেটি হচ্ছে ইসলামী ভূত–Specter of Islam। ইসলামী ভূত কেন এমন করে? পশ্চিমা নেতা, ভাবুক ও চিন্তাবিদদের এ নিয়ে বিশ্লেষণের অন্ত নেই। বিশেষ করে

www.pathagar.com

৯/১১-এর ঘটনার পর এসব লেখালেখি তুফানের গতি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব আলোচনার অনেক কিছুই জাতিদ্বেষ, রাজনীতি ও ধর্মযুদ্ধের প্রাবল্যে ভরপুর। এসব আলোচনার মোদ্দা কথা হচ্ছে, মুসলমানরা পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি, সচ্ছলতা, স্বাধীন জীবনযাত্রাকে ঘৃণা করে। তারা চায় সাধারণ মানুষকে সন্ত্রস্ত করে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কাঠামোটা তছনছ করে দিতে।

আরেক দল পশ্চিমা পণ্ডিত আছেন, যারা মনে করেন, আজকের ইসলামী সন্ত্রাসের বীজ লুকিয়ে আছে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভেতর; যেখানে আধুনিকতা, বহুত্ব, সেকুলারিজমের বিকাশ সম্ভব নয়। ওই সভ্যতা কেবল যুক্তিহীন ধর্মান্ধতার জন্ম দিয়ে চলেছে।

আরো একদল পণ্ডিত মুসলিম সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিমা খ্রিস্টান সভ্যতার বিরোধকে সংস্কৃতির মানদণ্ডে বিচার করতে চেয়েছেন। তাদের কথা হলো, মুসলিম সমাজ হচ্ছে প্রাক-আধুনিক সমাজ। সেই সমাজে আধুনিকতার অভাবই হচ্ছে আজকের রাজনৈতিক হিংসার মূল কারণ। গোটা দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে এটাকেই আজকাল সভ্যতার সংঘাত বলে চালানো হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, পশ্চিমা সমাজে আজকের বিশ্বব্যবস্থার সঙ্কট নিয়ে যে আলোচনাই হোক না কেন, তার অবশ্যম্ভাবী দায়-দায়িত্ব যে ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীর ওপর বর্তাবে বা তাদের দিকে আঙুল তোলা হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে পশ্চিমা সভ্যতার যে কোনো দায়-দায়িত্ব থাকতে পারে, সে ব্যাপারে আলোচনা প্রায় অনুপস্থিত। উল্টো মুসলিম সমাজের পক্ষে কোনো আলোচনা বা বই প্রকাশিত হলে তখনই তা মৌলবাদ বা ধর্মান্ধতা বলে বরাবরের মতো এর গুরুত্বকে খাটো করার চেষ্টা করা হয়। আশার কথা, এই প্রবল স্রোতের মুখে দাঁড়িয়েও যে দুয়েকজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সত্য কথা বা বিপরীত কথা বলতে এগিয়ে আসেন না, তা নয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতাও যে সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী ও মৌলবাদী চিন্তা-ভাবনা দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে, সে ইঙ্গিত আমাদের বেশ কিছুদিন আগে দিয়ে গেছেন মরহুম এডওয়ার্ড সাঈদ। সংস্কৃতিকেন্দ্রিক আলোচনা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা, স্বেচ্ছাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ যে কত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে, এডওয়ার্ড সাঈদের চেয়ে শক্তভাবে এ মুহূর্তে আর কেউ বলেছেন বলে মনে পড়ছে না।

www.pathagar.com

কিছুদিন আগে মৌলবাদ নিয়ে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ধর্মবিশেষজ্ঞ কারেন আমস্ট্রং তার Battle for God বইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন–এটা শুধু মুসলমান সমাজের ব্যাপার নয়; এই রূপান্তরগুলো আজ ধর্মনির্বিশেষে সব সমাজেই হানা দিচ্ছে। তিনি বলেছেন, এটা অতীতের অর্থাৎ প্রাক-আধুনিক সংস্কৃতিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টার ফল নয় বরং সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। অন্যভাবে দেখলে আধুনিকতা না থাকলে মৌলবাদও মাথা তুলবে না।

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক আলোচনায় পশ্চিম থেকে প্রায়শই সভ্যতার সঙ্কট সৃষ্টির জন্য প্রাক-আধুনিক বা ধর্মীয় সমাজগুলোর দিকে আঙুল তোলা হয়; কিন্তু আধুনিকতা বা আধুনিক সমাজের ভেতরেও যে সমস্যা আছে, সে ব্যাপারটাও ভাবতে আমাদের অনুরোধ করেছেন কারেন আমস্ট্রং। আধুনিক পশ্চিমী সাম্রাজ্যের আর এক তুখোড় সমালোচক হলেন ঔপন্যাসিক বুদ্ধিজীবী অরুন্ধতী রায়। তার মতে, আধুনিক পশ্চিমী সাম্রাজ্য নিজের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রেখে অন্য দেশে স্বেচ্ছাতন্ত্র কায়েম করে। এর বড় উদাহরণ সাম্প্রতিককালের আফগানিস্তান ও ইরাক। এখানে তারা Infinity Justice-এর কথা বলে সর্বতোভাবে Infinity injusticeকে প্রতিষ্ঠা করেছে মাত্র। এ ধারার সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে উগান্ডা তথা আফ্রিকার অগ্রণী সমাজবিজ্ঞানী মাহমুদ মামদানিকৃত Good Muslim, Bad Muslim : Islam, the USA and Global War against Terror বইটি।

মামদানি তার বইতে সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বা ধর্মকেন্দ্রিক আলোচনায় তেমন যাননি। তিনি হাল জামানার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কার্যকারণগুলো পর্যালোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন–পশ্চিমারা ইসলামী সন্ত্রাসবাদ বলে বিশ্ববাসীকে যা বোঝাতে চেষ্টা করছে, তা আসলে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির ফসল। আরো বিশেষ করে বললে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঔদ্ধত্য আর অসহিষ্ণুতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ জিনিস বেড়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদূর দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে যে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস আজ কারো নেই। এ অবস্থায় এই তথাকথিত 'ইসলামী সন্ত্রাসীরা' প্রতিরোধের সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রেখে যেন এটাই

www.pathagar.com

বলতে চাইছে, সব ধরনের ক্ষমতারই সীমা আছে। তাকে সংযত হতে, নিয়মানুগ হতে বাধ্য করা যায়।

৯/১১ ঘটে যাওয়ার পর আমেরিকা তথা পশ্চিমা দুনিয়া আমরা এবং ওরা বা ভালো মুসলমান, মন্দ মুসলমান-এর পার্থক্য করতে বেশ উদ্যোগী হয়ে ওঠে। এই ভাবনা অনুসারে খারাপ মুসলমানরা স্পষ্টতই সন্ত্রাসী, আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে ভালো মুসলমানরা এসব জঘন্য কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নন। তারা বরং উদ্বিগ্ন, কত দ্রুত এসব জঘন্য কাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা যায়। আমেরিকার কর্তা ব্যক্তিরা তাই মনে করেন, ভালো মুসলমানরা নিঃসন্দেহে 'ওদের' বিরুদ্ধে 'আমাদের' যুদ্ধে আমাদের সমর্থন করবেন। 'আমরা' ও 'ওরা'র বিভাজন নিছকই রাজনৈতিক। মামদানি দেখাতে চেয়েছেন, এর সঙ্গে আমেরিকার রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত। এই রাজনৈতিক ঘটনাকে সাংস্কৃতিক মাপকাঠিতে বিচার করা আসলে ঠিক নয়। তাতে বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

মাহমুদ মামদানি তার বইতে বলতে চেয়েছেন, আজকের বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্কট, তথাকথিত ইসলামী সন্ত্রাস–এগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রণনীতি ও রাজনীতির ফসল। কোনো সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। মার্কিন পণ্ডিত প্রবররা যে সংস্কৃতির দ্বন্দ্বের তত্ত্ব এনেছেন, তা নিছকই উদ্দেশ্যমূলক। তাদের রণনীতি ও রাজনীতির একটা নৈতিক বৈধতা দেয়ার জন্যই এসব করা হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের তত্ত্বের প্রথম জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন এডওয়ার্ড সাঈদ। তিনি তখন বলেছিলেন, বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে শুধু একরৈখিকভাবে দ্বন্দ্ব খোঁজা নিরর্থক। কারণ বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে দেয়া-নেয়া, আদান-প্রদানের একটা ব্যাপারও যুগপৎভাবে আছে।

মামদানি আমেরিকার বিগত কয়েক দশকের রাজনীতি-রণনীতি-কূটনীতির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, আজকের দিনে সন্ত্রাস কোথাও কোথাও রাজনৈতিক মহিমা অর্জন করেছে। এই মহিমা অর্জনের পেছনে মার্কিন প্ররোচনা সুস্পষ্ট। আমেরিকা আজ যে সন্ত্রাস নিয়ে চেঁচামেচি করছে, তা তার নিজ কৃতকর্মের ফল।

ভিয়েতনামে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে এখানে- ওখানে সরাসরি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শয়তান' নয়। তাই তাদের বন্দুকের নল যখন আমেরিকার দিকে ঘুরে গেছে, তখনই এরা ভালো মুসলমানের খাতা থেকে খারিজ হয়ে গেছে এবং মুক্তিসংগ্রামী থেকে নিরেট খলনায়ক ও সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার এই মোনাফেকী বিশ্লেষণ করার বোধ হয় বিশেষ দরকার নেই।

আফগানিস্তানে যখন ইসলামী জেহাদীদের দিয়ে কমিউনিস্ট নিধন চলছে, তখন দেশ-বিদেশের অনেক ইসলামী নেতা ও বুদ্ধিজীবী এটাকে তালি মেরে সমর্থন দিয়েছেন। আবার আজ যখন সেই আমেরিকা 'খারাপ মুসলমান' নামের জেহাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র বাগিয়ে ছুটে এসেছে, তখন বাম বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা বেশ পুলকিত বোধ করছেন। এই দুই ধরনের পুলক ও উল্লাসের মধ্যে নিরেট মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নেই। দেশীয়দের বিরুদ্ধে দেশীয়দের লড়িয়ে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে নিজের আধিপত্যকেই কায়েম করতে চায়–এই জিনিসটা ইসলামী বা বামপন্থী নীতি-নির্ধারকরা যতক্ষণ না ভালো করে বুঝতে পারবেন, ততক্ষণ তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা নিছক কথার কথায় পর্যবসিত হবে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন রকম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের তো আরো বেহাল অবস্থা। দেশীয়দের বিরুদ্ধে দেশীয়দের লড়াইয়ের ক্রীড়নক শক্তি হিসেবেই তারা এক রকম কাজ করে যাচ্ছেন বলা চলে।

আফগানিস্তান পর্ব শেষ হলে ছায়াযুদ্ধ থেকে আমেরিকা ভিয়েতনামের পর আবারো সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়ে ইরাকে। এখানেও সাদ্দাম হোসেন প্রথমে আমেরিকার মিত্র, পরে শত্রুতে পরিণত হন। আশির দশকে এই স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট শাসক আমেরিকার উৎসাহী সমর্থন পেয়েই ইরান আক্রমণ করেন। আমেরিকা কখনোই চায়নি, ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধ হোক। কারণ একজনকে দিয়ে আরেকজনের রক্ত ঝরিয়ে উভয়কে দুর্বল করাই ছিল আমেরিকার উদ্দেশ্য। এই কারণেই সেই সময় সাদ্দামকে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র সরবরাহ করেছিল আমেরিকা। পরে যখন সাদ্দাম কুয়েত আক্রমণ করেন, তখন আমেরিকা ইরাককে ধ্বংস করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় এবং তা যথার্থভাবে কাজে লাগায়। উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে সাদ্দাম অপসারিত হয়েছেন ঠিক, কিন্তু ইরাকের দুর্দশার আজ অন্ত নেই। যুদ্ধ এবং অবরোধের প্রতিক্রিয়ায় আজ অবধি সেখানে লাখ লাখ নারী-শিশু-বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করছে। তৎকালীন মার্কিন বিদেশ সচিব ম্যাডেলিন

www.pathagar.com

অলব্রাইটের ভাষায়–এটাই নাকি ইরাকিদের প্রাপ্য! এই ধরনের সভ্যতাবিনাশী ক্রিমিনাল কথা আর হতে পারে না।

ইরাকে আজ প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। এর নেতৃত্বে আছে মূলত ইসলামপন্থীরা, যাদের আমেরিকা বলছে সন্ত্রাসী। মাহমুদ মামদানি মনে করেন, এই সন্ত্রাসের অস্তিত্ব থাকবে না যদি ইরাকে অহিংস রাজনীতির পথ খুলে যায় এবং আমেরিকার আগ্রাসন শেষ হয়। মার্কিন দখলের অবসান ঘটার অহিংস রাজনৈতিক উপায় আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই জিনিস শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মামদানির কথা হলো, আজকের ইসলামী সন্ত্রাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চালু করা বিশ্বব্যাপি সন্ত্রাসের প্রতিরোধের উপায় হিসেবেই এসেছে। কারণ এক সন্ত্রাস আরেক সন্ত্রাস উপহার দেয়।

একই ঘটনা ঘটেছে ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রেও। আমেরিকার মদদপুষ্ট ইসরাইলও তার প্রভুর মতো কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা নিয়মতন্ত্রের কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীজুড়ে যা খুশি তাই করছে। তাকে শাসন করার মতো কোনো শক্তি নেই। পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতে মার্কিন মদদপুষ্ট ইসরাইলও আজ যা খুশি তাই করতে পারে। তাকে বাগে আনার শক্তি কারো নেই। ফিলিস্তিনের হামাস, হিজবুল্লাহ প্রভৃতি দল গঠনের প্রেক্ষাপট হলো এই। কোনো সন্ত্রাসই শেষ পর্যন্ত বিনা প্রতিরোধে এগুতে পারে না। মাহমুদ মামদানি সোজাসাপ্টা বলেছেন, আজকের বিশ্ব ব্যবস্থার যে সঙ্কট তার মূলে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে এই ব্যবস্থার আশু বদল প্রয়োজন। গোটা বিশ্বকে দখলে রাখার সন্ত্রাসী অভিপ্রায় থেকে কোনো শান্তি আসতে পারে না। বরং বিশ্বে পারস্পরিক সহাবস্থান ও দেয়া-নেয়ার নীতি হচ্ছে সভ্যতা রক্ষার একমাত্র রক্ষাকবচ। সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে সভ্যতাকে যারা রক্ষা করতে চান, এ বইয়ের উদ্দিষ্ট হচ্ছে সেই পাঠককুল। ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে যারা মানবজাতির এই সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন; মাহমুদ মামদানি সেসব মানুষের কাছে যুক্তি ও নিষ্ঠার অস্ত্র তুলে ধরেছেন। এটাই আজকের বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মজলুম মানুষের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার জায়গা।

www.pathagar.com

ইরাক, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও টনি ব্লেয়ারের আত্মকথন

ইরাক যুদ্ধ এখন পিছনে ফেলে আসা অতীত। প্রতিদিনের খবরে যুদ্ধের হেডলাইনটা হারিয়ে গেছে বেশ আগে। এমনকি যুদ্ধোত্তর ইরাকও খবরে তেমন উঠে আসে না আজকাল। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইরাকীদের থেকে মন ও চোখ সরে যেতে সময় লাগেনি আমাদের মোটেও।

তাছাড়া যুদ্ধ, ধ্বংস এসব তো ফেলে আসা ঘটনা। এখন তো গড়ার সময়। পশ্চিমারা আদর করে এটির নাম দিয়েছে Reconstruction। আসলে এই গড়াটা সত্যি কোনো গড়া না অন্য আর এক ধরনের ভাঙা। গড়া মানে তো বড় বড় বাড়ি, রাস্তা ঘাট, শিল্প কারখানা, তেলের প্লান্ট, বাজার-নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা-সব মিলিয়ে যাকে বলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের নির্মাণ। আর তারই পাশে আমরা অসহায়ের মত দেখেছি এই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো একটা সভ্যতার কৃষ্টি, শিল্প, ইতিহাস আর মূল্যবোধের মানবিক দিকগুলো ভেঙে পড়লো। আমরা দেখলাম হাজার হাজার বছরের পুরনো পুঁথি, বিভিন্ন ছোট-বড় স্মারক, ইতিহাসের মুহূর্ত, ইউরোপের বাজারে নীলামে বিক্রির জন্য পৌঁছে গেল অবিশ্বাস্য গতিতে। একটা অতি প্রাচীন সভ্যতাকে কত সহজে মানুষের চোখের সামনে থেকে মুছে ফেলা যায় অসাধারণ দক্ষতায় তা আমাদের দেখাল আধুনিক বিশ্বে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার দিশারীরা। আমরা ইরাক যুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ করেছি এই মানবতা বিরোধী যুদ্ধ। একজন 'একনায়ককে' সরিয়ে অন্য আরেকজন একনায়কের 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ভনিতা আমরা হজম করেছি। গণবিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংসের মিথ্যা অজুহাতে নিরপরাধ মানুষজনের উপর ধ্বংস লীলা মানতে না পেরেও মানিয়ে নিয়েছি। এখন যুদ্ধোত্তর কালে ইরাক ধীরে ধীরে বিস্মৃতির আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। আমরাও আমাদের অস্বস্তিগুলো কাটিয়ে উঠছি বোধ হয়। তবু এভাবে কি সবকিছু ভুলে যাওয়া যায়। বরং এটাই ফিরে দেখার সময়। ঘটনার পরেই হয়তো এক ধরনের বিশ্লেষণ সম্ভব।

এই ইরাক যুদ্ধের অন্যতম পরিকল্পক ছিলেন টনি ব্লেয়ার। কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী। এই টনি ব্লেয়ারই যুদ্ধবাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে নিয়ে ইরাকের উপর এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিলীন হয়ে যায় বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যের অহমিকাতো সহজে যাবার নয়। আধিপত্যের চূঁড়া থেকে হঠাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে নেমে আসার

www.pathagar.com

বাস্তবতা হয়তো ব্রিটিশ শাসক শ্রেণী সহজে মেনে নিতে পারেননি। তাই মার্কিনীদের দোহার ধরে সাম্রাজ্যবাদী অহমিকাকে হয়তো টনি নতুন করে ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। গর্ডন, এলেনবি, কিচেনার, কার্জন, গ্লাডস্টোন, ডিজরেইলির মত সাম্রাজ্যবাদীর সার্থক উত্তরাধিকার তিনি।

এই ধিকৃত রাষ্ট্রনায়ক, যার হাত থেকে এখনো ইরাকের রক্তের দাগ শুকায়নি সেই তিনি সম্প্রতি লিখেছেন ঢাউস সাইজের এক স্মৃতিকথা ঃ The Journey। এই জার্নি কিন্তু একজন উদার, মানবতাবাদী কিংবা প্রাজ্ঞ শাসকের স্মৃতি চারণা নয়। এটি হচ্ছে এমন একজন শাসকের লেখা বই যিনি তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতি অন্ধ সমর্থন জানান এবং ইরাকের উপর বিমান হামলা চালিয়ে, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে, অনৈতিক অবরোধ আরোপ করে এবং নিরীহ ইরাকীদের হত্যা করে প্রমাণ করেছেন রক্ত ছাড়া পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের কলকাঠি নড়ে না। ঐ সভ্যতার জন্য তাজা রক্ত দরকার। জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার- এই দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু সেই কাজটি খুব ভালভাবে করতে পেরেছেন। টনি খুব অল্প বয়সে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন বয়স তার ৪৩। অনেকটা মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম জেফারসন ক্লিনটনের মতো। ক্ষমতা পাওয়ার সময় তার বয়স ছিল ৪৬।

যাই হোক নিজের বয়সকে টনি কাজে লাগিয়েছেন। নিজের ভাবমূর্তি খাড়া করার চেষ্টা করেছেন হয়তো এইভাবে, আগে পশ্চিমের বুড়ো জেনারেশন দুনিয়ায় দাদাগিরি করে বেড়িয়েছে, এখন মাস্তানি করবে তরুণরা।

আজকাল পশ্চিমা বিশ্বে ক্ষমতায় যাওয়ার আগে, ক্ষমতায় থাকাকালে এবং ক্ষমতা থেকে বিদায়ের পরপরই সেখানকার রাজনীতিবিদরা ঢাউস, ঢাউস সাইজের স্মৃতিকথা লিখছেন। বিল ক্লিনটনের My life, বারাক ওবামার Audacity of Hope এর ধারায় টনির The Journey হচ্ছে শেষ সংযোজন। কবে হয়তো শুনতে পাবো জর্জ বুশও এরকম কিছু লিখে ফেলেছেন। এসব বইগুলোর প্রতিপাদ্য ঘুরে ফিরে সবসময় একটা জায়গায় এসে ঠেকে: সেটি হচ্ছে আমাদের স্বার্থের প্রতি যখন হুমকি আসে অথবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ও বিবেককে যখন অগ্রাহ্য করা হয় তখন আমরা তা প্রতিহত করবো। প্রয়োজনে শান্তিপূর্ণ কূটনীতি দিয়ে কিংবা প্রয়োজনে শক্তি দিয়ে আমরা তা মোকাবেলা করব।

এসব লেখার ভঙ্গি বা ভাষা লক্ষণীয়। এর ভিতরে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকির ইংগিত আছে। এটা শান্তির ভাষা নয়। স্কুল পালানো বখাটে ছেলেরা যেমন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বখাটে ভাষায় মাস্তানী করে, তাদের মতই হলো এসব বইয়ের ভাষা।

www.pathagar.com

সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে চাকু মেরে কলিজা ফালা ফালা করে দেব। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ কূটনীতিতে কাজ না হলে শক্তি দিয়ে দুনিয়াকে সিধা রাখবো।

এই ভাষা দুনিয়াকে সাহস যোগায় না। নতুন কোন দিগন্ত উন্মোচন করে না। এটা মাস্তানির ভাষা। এটা সকলকে আতঙ্কিত করে। পশ্চিমের এই মাস্তানীর ভাষা নতুন কিছু নয়। সেই হিসেবে টনির যুদ্ধবাজ ভাষায় আমাদের অবাক হওয়ার কথা নয়। মনে হয় যেন বইগুলো সব একই কারখানা থেকে একই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। এসব মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রপাগান্ডা মেশিনের সাহায্যে তাদের পাবলিক ফিগারদের ইমেজকে এইভাবে স্ফীত করার চেষ্টা করে। টনি ব্লেয়ারের The Journey এই রকম এক সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অংশ কিনা তা যাচাই করার প্রশ্নটা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

টনি তার বইতে নিজের নীতির পক্ষে জোর সাফাই গেয়েছেন। তার মানে কিছু অযুক্তিকে তিনি যৌক্তিকতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এ বইতে তিনি সহকর্মী গর্ডন ব্রাউনকে নিয়ে কটূক্তি করেছেন। প্রিন্সেস ডায়না সম্বন্ধে মতামত দিয়েছেন। এমনকি আফ্রিকার জনপ্রিয় নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা সম্বন্ধে রুচিহীন মন্তব্য করতে ছাড়েননি। তবে এই লেখায় টনির ইরাক যুদ্ধ নিয়ে মতামতগুলো বিশ্লেষণ করার উপরই জোর দেয়া হবে। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে তার প্রতিক্রিয়া– এই লেখা সেই প্রশ্নকে ঘিরেই।

টনি এক জায়গায় লিখেছেন: আমেরিকার নেতৃত্বে ইরাকের বিরুদ্ধে যারা শিকার হয়েছে, নিরীহ যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য যদিও তার অশ্রু ঝরেছে তবু তিনি তার কাজের জন্য দুঃখিত নন।

ইরাক নিয়ে তার আর একটি মতামত নীরিক্ষা করা যাক: এ যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য তার হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে কান্নার রোল উঠলেও আমাদের হাতে যে তথ্য ছিল আর এখন আমি যা জানতে পারছি, তাতে আমি এখনও বিশ্বাস করি সাদ্দামকে না সরালে সেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি ঝুঁকির কারণ হতো। তবে সাদ্দাম যাওয়ার পরে সে দেশটায় যে নরক নেমে এসেছে সেটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। একজন অনুতাপহীন, চেতনা লুপ্ত অপরাধ প্রবণ ব্যক্তির যথার্থ বক্তব্যই বৈকি। বাংলা ভাষায় মাছের মার পুত্র শোক, কুম্ভীরাশ্রু ইত্যাদি এ জাতীয় কিছু শব্দ আছে। সম্ভবত এসব শব্দগুলোও লজ্জা পাবে টনির সাথে নিজেদের যুক্ত করে দেখতে।

৯/১১ এর ঘটনার পর পশ্চিমাদের হঠাৎ মনে হলো যে আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের খতমের পর আরব দুনিয়ায় একটা বড় রকমের ওলট পালট দরকার।

www.pathagar.com

সোভিয়েট শত্রু বিনাশ হওয়ার পর পশ্চিমাদের এখন প্রধান শত্রু তাদের ভাষায় রেডিকাল ইসলাম। হান্টিংটন সাহেবও তার সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বে অমন ইংগিত দিয়েছেন। আরব মানসিকতায় নাকি ঐ ইসলামের বীজ লুকিয়ে আছে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পুরনো ছকে কিছু কাজ হচ্ছিল না। তাই নতুন করে ঘুটি সাজাতে হলো। তার জন্য দরকার হলে নতুন করে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যে কথা, সেই কাজ। আমেরিকা–বৃটেন লাখ লাখ সৈন্য আর যত সব ভয়ানক মারণাস্ত্র নিয়ে ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আন্তর্জাতিক আইন বলছে এসব করা যায় না। যে আইন জাতীয় স্বার্থের বিরোধী সে আইন বৃটেন আমেরিকা মানবে কেন?

রাষ্ট্রসংঘ বলছে উপনিবেশবাদ শেষ হয়ে গেছে। তাহলে রাষ্ট্রসংঘকে বলো অন্য নাম বের করতে। পশ্চিমা তথা মার্কিন একাধিপত্য হলো আজকের দুনিয়ার বাস্তব সত্য। এই সত্য যে মেনে নেবে তার আখেরে লাভ আছে। যে মানবে না তার বিনাশ অনিবার্য।

টনি ব্লেয়ারের অন্তরংগ বন্ধু জর্জ ডব্লিউ বুশ আমাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছেন 'আওয়ার ওয়ে অফ লাইফ' যে মানবে না সেই আমেরিকার শত্রু বলে বিবেচিত হবে। ২০০১ সালের ২০ সেপটেম্বর মার্কিন কংগ্রেসের দুই সভার যুগ্ম অধিবেশনে গোটা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে তার সেই ঘোষণা বহুচর্চিত হলেও স্মরণীয়ঃ Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.

সুতরাং আরবদের জেহাদি মনোবৃত্তি নির্মূল করতে হলে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে মার্কিন স্বার্থরক্ষার জন্য তারা কাউকেই খাতির করে চলবে না। সহযোগিতা না করলে এমনকি সরকার পাল্টে দিতেও তারা কসুর করবে না। সাদ্দাম বিপজ্জনক শাসক। তাকে সরিয়ে দেয়া হলো। অন্যদিকে ইরাকে পশ্চিমা সেনাবাহিনী থাকলে এই অঞ্চলের অন্য রাষ্ট্রগুলোও সমঝে চলবে। তাদের যা বলা হবে তাই তারা করতে বাধ্য হবে। না করলে সেখানেও মার্কিন শাসনের খাড়া নেমে আসবে। সেই সঙ্গে ইরাকের তেলের খনি দখলে আসায় পশ্চিমাদের এখন ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনেও চাপ সৃষ্টি করা সহজ হয়েছে। এই সুযোগে ইরান, সিরিয়া, লেবানন যদি স্বাধীনতাকামীদের (ওদের ভাষায় সন্ত্রাসী) সাহায্য বন্ধ করে তখন ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধাদের মেরুদণ্ডও ভেঙে যাবে। ইসরাইলকেও তখন শান্তি চুক্তি সই করাতে বাধ্য করা যাবে। তখন শুধু চারদিকে শান্তির রোড ম্যাপ কার্যকরী হতে থাকবে।

www.pathagar.com

এর পাশাপাশি আর একটা কারণ আছে যা উপরের রণনীতি ও কৌশলকে পুরোপুরি সমর্থন করে। এর সাথে জুড়ে আছে এক রাজনৈতিক আদর্শের কর্মসূচী সেটা হলো নব্য কনজারভেটিভদের আধা ধর্মীয় মতবাদ– খোলা বাজার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, মানবাধিকার, নির্বাচনী গণতন্ত্র এবং অবশ্যই পশ্চিমাদের রক্তে লুকিয়ে থাকা ক্রুসেডের বিদ্বেষ। মনে রাখা দরকার ১/১১ এর অব্যবহিত পর প্রেসিডেন্ট বুশ ক্রুসেডের হুমকিও দিয়েছিলেন। অর্থাৎ পশ্চিমা দুনিয়ার আচার ব্যবহার যা তাদের মতে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হলো, পশ্চিমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের প্রধান উপায় হলো সাম্রাজ্য। সরাসরি উপনিবেশ স্থাপন করলে হয়তো লোকে মন্দ বলবে। কিন্তু মহৎ কাজ করতে গেলে যে সময় সময় জোর খাটাতে হয় সেটা ইতিহাসের শিক্ষা। মার্কিন জনগণকে এটা বুঝাতে হবে যে সারা বিশ্বে আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা তাদের নৈতিক দায়। তা থেকে সরে আসা কাপুরুষতা। যেমন এক সময় ব্রিটিশরা বলতো কলোনির মানুষগুলোকে 'সভ্য' করা তাদের এক নৈতিক বোঝা। কিপলিং- এর ভাষায়– White Man, s Burden.

এই দুই-এ মিলে আজকের ইরাক পলিসি। এক ধরনের উগ্র ক্যাপিটালিজম ও উগ্র ক্রিশ্চানিটির সমন্বয় হয়েছে এই পলিসিতে। এই কারণেই গণমারণাস্ত্রের গাল গল্প প্রচার করে সাদ্দামকে উৎখাত করা হয়েছে। না হলে দুনিয়ায় কি সাদ্দামই একমাত্র একনায়ক ছিলেন?

এখন তো সাদ্দাম ইতিহাস। তার পরেও ইরাকে কেন পশ্চিমা সেনারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কারণ ঐ আধিপত্য ও লুণ্ঠনের লোভ আর 'রেডিকাল' ইসলামের ভয়। টনি ব্লেয়ার কিন্তু এই কথাটা রাখ ঢাক না করে বলেই ফেলেছেন, এ কালের এই ক্রুসেড দীর্ঘ বিলম্বিত হবে। হয়তো মধ্য যুগের ক্রুসেডের মতো। তার ভাষ্য উদ্ধার করছিঃ এটা সাধারণ কোনো যুদ্ধ করছি না। এ কথা বলছি কেননা এ যুদ্ধ এখন যেতে পারে ইয়েমেন বা লেবাননে, ফিলিস্তিনে, সোমালিয়ায় কিংবা মিন্দানাওয়ে বা আলজিরিয়ায়। আর সন্ত্রাসের এই ভাইরাসটি তৈরি হয়েছে বিকৃত ইসলামের ভিত্তিতে। তাই এমন যুদ্ধ প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতে পারে। এখানে তাই পাশ্চাত্যকে একটা বিরাট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। টনি আর একটা কথা বলেছেন– যে জিনিস নিয়ে আজকে সন্ত্রাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার মূলে আছে বিশ্ব পর্যায়ের আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন। টনি ব্লেয়াররা এটা বুঝতে পেরেও কেন এসবের সামরিক সমাধান খুঁজে নেন তা অনেক সময়ই বোঝা দুষ্কর হয়ে যায়।

www.pathagar.com

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের শরীরই তৈরি হয়েছে অস্ত্র আর পেশী শক্তির জোরে। তাই শান্তিপূর্ণ মোকাবেলার কথা টনিরা ভাবতে পারেন না।

আজ তাই সাম্রাজ্যবাদকে শুধু লেনিনের মত অর্থনৈতিক সূত্র দিয়ে বিচার করলে চলবে না। তাকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও বিচারের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদ আজ শুধু অপশ্চিমা বিশ্বের মুসলমানদের দিকেই বন্দুক তাক করেনি। পশ্চিমা বিশ্বের মুসলমানরাও আজ সাম্রাজ্যবাদের বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার। তাই একালে ইসলাম এসব প্রশ্নের মোকাবেলা করা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করা যাবে না, তেমনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই সংগ্রাম কোনো ইতিবাচক পরিণতির দিকে যাবে বলেও মনে হয় না।

টনি 'বিকৃত ইসলামের' ভয়ের কথা বলেছেন। এই কারণেই তারা Moderate Islam-এর তত্ত্ব ফেরি করে বেড়ান। এই 'বিকৃত ইসলামই' মূলতঃ পশ্চিমাদের 'ওয়ে অফ লাইফের' প্রতিপক্ষ। এই ইসলামই আজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার মাঠে নিশান বরদার। এই কারণেই ইসলামের এই ধারার প্রতি টনি ব্লেয়ারদের গোস্বার শেষ নেই।

সাম্রাজ্যবাদ ও আধুনিকতাবাদী ধ্যান-ধারণা আত্মস্থ করে মুসলিম সমাজে Liberal I Secular Islam বলে একটি ধারা তৈরি হয়েছে। এরা আসলে ইসলামকে রোখার কাজে জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের প্রকল্পই বাস্তবায়িত করে। এরাই ইসলামের নাম শুনলে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই মানে আজকে এই সব সাম্রাজ্যবাদের স্থানীয় মুৎসুদ্দীদের বিরুদ্ধে লড়াইও বটে।

এই তথাকথিত সেকুলার ইসলামের সাথে টনি ব্লেয়ারদের কোন সংঘর্ষ নেই। কারণ মুসলিম সমাজের এই অংশ সাম্রাজ্যবাদের 'সভ্যকরণ' প্রক্রিয়ার হুকুম বরদার। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের এই 'সভ্যকরণ' প্রক্রিয়াকে ইসলামসহ যে কোন বয়ানে যারাই মোকাবেলা করার কথা বলেছে তাদেরকেই সাম্রাজ্যবাদ সন্ত্রাসী বলে ছাপ মেরে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ এখন উন্মাদের মত চিৎকার করে বলছে ইসলামী জঙ্গিবাদের হাত থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। কোন্ সভ্যতা? যে সভ্যতা ইরাকে ১৪ লক্ষ মানুষকে খুন করেছে।

তথাকথিত অসভ্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সভ্যতা রক্ষা ও অসভ্যদের সভ্য করার যে প্রকল্প তা আসলে পশ্চিমের বর্ণবাদী, গোষ্ঠীবাদী, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও রণনীতির বিশ্বাসের ভিত্তিও বটে। টনি ব্লেয়ার তার স্মৃতি কথায় এই বর্ণবাদী বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়েছেন মাত্র।

www.pathagar.com

বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতির ভাঙা সেতু

বিশ্বায়ন শব্দটা আজকাল অতি বেশি ব্যবহৃত, যদিও এটি আমাদের প্রতিদিনের জীবনাচরণে কতখানি প্রাসংগিক তা রীতিমত আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়। 'ন্যাশনালিজম', 'ডেমোক্রাসি' প্রভৃতি শব্দ ও প্রত্যয় এক সময় আমরা পেয়েছিলাম পশ্চিমের সূত্রে এবং উপনিবেশিকতার হাত ধরে তা হজমও করেছিলাম। তেমনি করে বিশ্বায়ন শব্দ, প্রত্যয় বা মতাদর্শ যে আঙ্গিকেই হোক না কেন তা আমাদের একালে নজরে আসে পশ্চিমা দেশ, দাতা সংস্থা, পশ্চিমা পণ্ডিত ও প্রচার মাধ্যমের বদৌলতে। পরে এদেশীয় পশ্চিমা ঘেঁষা পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদর্শের অনুসারী বুদ্ধিজীবী মহল এর ব্যাপক চর্চা শুরু করেন। আর্থ-সামাজিক ঐতিহাসিক যে গতি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই এ শব্দটি আমাদের কাছে আসুক না কেন এটি যে একটি আরোপিত বিষয়, আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং এর অন্তর্গত ভাবাদর্শ যে চরম প্রতরণামূলক তাতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

বিশ্বায়ন শব্দটা নতুন মনে হলেও আসলে এর প্রেক্ষাপট ও বিকাশের ইতিহাস বেশ পুরনো। পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকেই এর উদ্ভব। এর সঙ্গে সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদ ও শ্রেষ্ঠত্ববাদ নিবিড়ভাবে জড়িত। আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরাই অভ্রান্ত, নেতৃত্বের যোগ্য, ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তি– এসব কিন্তু পশ্চিমের রাজনৈতিক চিন্তায় শক্তভাবে ক্রিয়াশীল, যা আবার খ্রিস্টীয় তত্ত্বের সাথে মিলে মিশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে রাখা ও অপর জাতি পীড়নের বিষয়টি সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেয়। বিশ্বায়ন হচ্ছে একালে পুঁজিবাদের একটা নতুন মুখোশ। পুঁজিবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সহোদর। একটি আরেকটি ছাড়া বাঁচতে পারে না। পুঁজিবাদ সারা বিশ্বে বাজার খোঁজে। আবার সেই বাজারের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তির প্রয়োজন হয়। এতকাল পশ্চিমা বিশ্ব এ কাজটাই করতো। এখন সেই প্রক্রিয়াটিকে বিশ্বায়ন নাম দিয়ে একটা 'সুশীল' চেহারা দেয়া হয়েছে মাত্র। ভাবটা এমন আমরা সবাই এক বিশ্বের অংশ, এখানে কোন বৈষম্য–ভেদাভেদ থাকবে না। এজন্যই পশ্চিমা জগত বা খ্রিস্টীয় জগত আর সেকালের মত উপনিবেশিকতা বৈধতা দেয়ার জন্য বলে না সাদা মানুষের বোঝা–

www.pathagar.com

হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন। তারা এখন বলছে 'ফ্রিডম', 'ডেমোক্রাসি', 'সিভিল সোসাইটি'র কথা।

সাম্রাজ্যবাদীদের জবরদস্তির ধরনও পাল্টে গেছে। একালে আছে মিডিয়া, বিজ্ঞাপন। তৈরি হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। বিশ্বায়ন কাজ করছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ ও অন্যান্য তাবেদারি সংস্থার মাধ্যমে। আর আছে সাক্ষীগোপাল জাতিসংঘ। দেশে দেশে তৈরি হয়েছে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের দোকান, এজেন্সি। এগুলোই হচ্ছে এনজিও, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি। এরাই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ দেখভাল করে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ক্রুসেড ও রেনেসাঁর পথ ধরে নব ইউরোপের উত্থান এবং সারা দুনিয়ায় উপনিবেশিকতার ভিতর দিয়ে খ্রিস্টানদের 'সিটি অফ গড' প্রতিষ্ঠার কথা ইতিহাসে বহুবার আলোচিত হয়েছে। এটাও আমরা জানি রেনেসাঁ- রিফরমেশনের নামে ইউরোপের জাতিগুলো জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে মতাদর্শ তৈরি করেছে তাই আধুনিকতা ও উন্নতির নামে অন্যান্য অইউরোপীয় বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়েছে আর বলেছে সব কিছু করা হয়েছে তোমাদের মঙ্গলের জন্য। উপনিবেশিকতার ভয়ংকর নেতিবাচক প্রভাব আজ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে উপনিবেশ উত্তর দেশগুলোতে বিরাজমান সংঘাত, বিভাজন, দাঙ্গা–হাঙ্গামা, হানাহানি, দুর্নীতির অবাধ বিস্তার ও প্রশ্রয়ে।

এটা সত্য পশ্চিমা শক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় উপনিবেশবাদের আপাত অবসান হলেও পৃথিবী আবার জড়িয়ে পড়ে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ নামের দুই পশ্চিমা মতাদর্শিক রাক্ষসের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে এবং সেই রাক্ষসের থাবার তলে প্রায় ৭০ বছর কেটে যায়। সমাজতন্ত্রের পতনের পর পৃথিবীর দখল ও নেতৃত্বের প্রশ্নটা যখন পুনরায় সামনে চলে আসে তখন সমাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে পুঁজিবাদী বিশ্ব দানবীয় চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়। পশ্চিম থেকে তখন শোনা যায় উদারতন্ত্রী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই নাকি আগামী দিনের মানব ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করবে।

পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার তাত্ত্বিক হিসেবে আবির্ভূত হন স্যামুয়েল পিটার হান্টিংটন ও ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা। হান্টিংটন বললেন, যেহেতু সমাজতন্ত্র উত্তর দুনিয়ায় নতুন কোন মতাদর্শ নেই তাই বিভিন্ন সভ্যতা এখন পারস্পরিক সংঘাতের ভিতর দিয়ে এগুবে এবং খ্রিস্টবাদ, ইসলাম, চৈনিক সভ্যতা ইত্যাদির মধ্যে লড়াই হবে। তিনি

www.pathagar.com

বিশেষ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য ইসলামকে শক্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করেছেন যা কিনা মতাদর্শিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতাকে মোকাবেলা করার সামর্থ্য রাখে। অন্যদিকে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা সমাজতন্ত্র উত্তর পরিস্থিতিকে দেখেছেন ইতিহাসের সমাপ্তি হিসেবে। তার মতে পশ্চিমাদের হাতেই ইতিহাসের গতি চলে গেছে এবং সেই গতির সামনে আর দাঁড়াবার কেউ নেই। আসলে এসব পণ্ডিতদের মতামত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্রকে নৈতিক বৈধতা দেবার জন্য উদ্ভুত হয়েছে। উপরোক্ত তাত্বিক আলোচনা, ধারাবাহিকতা ও ইতিহাসের গতিপ্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গত শতাব্দীর শেষে ও বর্তমান শতাব্দীর সূচনা থেকে 'বিশ্বায়নের' আবির্ভাব। ফলে এখন যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া আমরা দেখছি তার মূল্যায়ন করতে হবে ইতিহাসের নিরিখে, আন্তর্জাতিক ঘটমানতার পাল্লায় এবং মুসলিম সমাজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে সামনে রেখে।

কোন সন্দেহ নেই বিশ্বায়নের মাধ্যমে দেশে দেশে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবন যাপন, দর্শনসহ সব ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে শক্তিমান রাষ্ট্রগুলো। বিশ্বায়নের শুরুটা হয়েছিল একটা অভিন্ন বাণিজ্যনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যকে নিয়ে, যা আজকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেসন বা ডব্লুটিও নামে পরিচিতি পেয়েছে। যদিও সময়ে বোঝা গেল এটি আসলে বহুজাতিক কর্পোরেশন তথা পুঁজিবাদী দুনিয়ার স্বার্থ রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছে এবং দ্রুততার সাথে বিশ্বের তাবৎ মজলুম মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে দরিদ্র দেশের জনসাধারণ অতিরিক্ত গ্যাস বিল বা বিদ্যুৎ বিল প্রদান করবে কি না সেটা নির্ধারণ করার এখতিয়ার এসব দেশের সরকারের হাতে নেই। এটি নির্ধারণ করছে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ প্রভৃতি পুঁজিবাদের ধারক বাহক সংস্থা। দরিদ্র দেশের এই চরম নির্ভরশীলতা আমাদের এক নব উপনিবেশের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এবং এসব রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে। বিশ্বব্যাপি পশ্চিমাদের আর্থিক দাপট আমাদেরকে আরও মনে করিয়ে দিচ্ছে একদা পশ্চিমা বনিকের মানদণ্ডই ক্ষমতার রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল উপনিবেশ স্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে।

বিশ্বায়নকে আজ তাই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক–রাজনৈতিকভাবে বুঝলে চলবে না। এটি যে আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনাকেও নির্মূল করে দিচ্ছে তারও কিছুটা আমাদের আচ করা দরকার। আমাদের কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষার জগতেও ঢুকে

www.pathagar.com

পড়ছে বিশ্বায়ন। মুক্ত বাজার অর্থনীতির চাপে ও তাপে আমাদের সংস্কৃতির ডিসলোকেশন হচ্ছে। পুরনো বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ছে। পরিবর্তনের এ পাগলা হাওয়াকে যে দেশ, সমাজ চিহ্নিত করতে ও সামলাতে ব্যর্থ হবে, সে দেশকে পাগলা হাওয়া কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলা শক্ত।

বিশ্বায়নের যুগে বাজার অর্থনীতি কিভাবে আমাদের ইচ্ছা, আকাঙ্খা, কামনা-বাসনাকে তৈরি করে, নিজের মত সাজায় সেই দিকটার আমরা অতটা খবর রাখি না। বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদের তাগিদকে আমরা নিজের তাগিদ ভেবে বেহুশ হয়ে থাকি এবং পন্যের বিজ্ঞাপন ও আমাদের পিচ্ছিল গুপ্ত বাসনাগুলো উসকে দেয়ার নানান ফন্দি ফিকিরে ধরা দেই, সেই দিকটাও আমাদের ভালভাবে বুঝে দেখা দরকার।

পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির ব্যাপারটাই ছিল এতকাল আন্তর্জাতিক বাজারের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এখন পন্যের উৎপাদন ও বিক্রির সাথে একটা প্রতীকি ও সাংস্কৃতিক মূল্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পুরনো দিনের পুঁজিবাদী অর্থনীতির মোদ্দা কথা ছিল ভোক্তার প্রয়োজনে পণ্য উৎপাদন, বিক্রি ও মুনাফা যা বাজারকে সচল রাখতো। এখন উত্তর আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যাপারটা হলো ভোগের প্রয়োজনকে বহুজাতিক কোম্পানি, গণমাধ্যম ও তাদের বিজ্ঞাপনী সংস্থার এজেন্টদের মাধ্যমে তৈরি করছে যাতে সেভাবে পন্যের বাজারজাত করা যায়। ভোগের প্রয়োজন তৈরি করার মানে হচ্ছে ভোগের সংস্কৃতি তৈরি করা।

পশ্চিমা সমাজে এতকাল Soul বা আত্মা শব্দটা চলনসই বা ফ্যাশন দুরস্ত ছিল না। করপোরেট ক্যাপটালিজমের যুগে এই শব্দটি নতুন করে সেকুলার ব্যাঞ্জনা নিয়ে ফিরে এসেছে। করপোরেট ক্যাপিটালিজম যেমন নানা মত ও পথকে আত্মস্থ করেছে তেমনি ধর্মকেও নিজের মত করে গড়তে চাইছে। একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থার ভাষাকে নিরীক্ষা করা যাক। ম্যাডোনা যদি যীশুর ক্রুশবিদ্ধ (Crucifix) হওয়ার ঘটনাকে জুড়ে যৌন সুড়সুড়ি দেয়া গান গাইতে পারে তাহলে ট্রাক কোম্পানি মাজদা কেন পবিত্র আত্মাকে (Holy Spirit) অর্থনৈতিক ও লাভজনক কায়দায় ব্যবহার করতে পারবে না। টেলিভিশনে মাজদা ট্রাকের একটা বিজ্ঞাপন হলো ঃ Trucks are a spiritual thing for me. আর একটা বিজ্ঞাপনের ভাষা দেখা যাক ঃ American Express knows of lot of stores that are good for your body. And Anita knows

www.pathagar.com

one thatÕs good for your soul. এই বিজ্ঞাপনের ভাষাগুলো থেকে বুঝা যায় বিশ্বায়ন কিভাবে আমাদের ভিতর সুঁড়সুঁড়ি ও আত্মরতির জগত তৈরি করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি ভোগ্য পন্য সংস্থার ব্রান্ড নাম হচ্ছে কোকা কোলা, মারলবরো, কেএফসি, নাইক, হারশি, লেভিস, পেপসি, রিগলি, ম্যাকডোনাল্ড, বারবিডল ও নেসকাফে।

বিজ্ঞাপন বাজারে পন্যের চেয়ে এই সব ব্রান্ড নামকেই উচ্চকিত করে এবং ব্রান্ডের পক্ষে বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত কোম্পানি বা ব্রান্ডগুলো শুধু মার্কিন পণ্যই বিক্রি করে না একই সাথে আমেরিকার জনপ্রিয় সংস্কৃতি, এর সমৃদ্ধি ও সর্বত্রগামী কল্পনাকেও উচ্চকিত করে। সেই হিসেবে এই সব কোম্পানিগুলো আমেরিকার চিন্তাকে বিশ্বব্যাপি প্রসারিত করে দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে এরা শুধু পণ্য বিক্রি করছে না, প্রতীককে বিক্রি করছে। শুধু জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করছে না, জীবনের নতুন স্টাইলও তৈরি করে দিচ্ছে। এভাবে কার্পোরেট সংস্কৃতি আমাদের ভিতরে একটা নতুন মন তৈরি করছে। ঔপনিবেশিকতা আমাদের দিয়েছিল সেকুলার মন, বিশ্বায়ন আমাদের দিচ্ছে কনজুমারিস্ট মন।

সেই হিসেবে বিশ্বায়ন, লেট ক্যাপিটালিজম, নব উপনিবেশবাদ, উত্তর আধুনিকতার মতো শব্দগুলো একই সূত্রে গাঁথা। এটি শুধু আজ পণ্য বা পণ্য বিক্রির প্রতিযোগিতা নয়, এটি একটা ইমেজ যার পিছনে আমাদের মত দেশগুলোর মানুষ দিক বিদিশাহীনভাবে ছুটছে। ভোগবাদী মনের কারণে যে ইমেজ তৈরি হয়েছে তার কাছে জাতীয় স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। একই কারণে আজকের বিশ্বায়িত প্রজন্মের সামনে জাতীয় সংস্কৃতির চেয়ে মূল্যবান হয়ে উঠেছে টাটকা ফ্যাশন, ভ্যালেন্টইনস ডে, শোবিজ, সুন্দরী প্রতিযোগিতার মত বিষয়গুলো। শুধু তাই নয় আমাদের নিজস্ব ও লোকজ সংস্কৃতিও বিশ্বায়নের চাপে ও তাপে কার্পোরেট সংস্কৃতির উদ্দেশ্য সাধনে বড় ভূমিকা রাখছে। আজকের পহেলা বৈশাখ, বাসন্তী উৎসবের মত ব্যাপারগুলো প্রোমোট করছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিজয়ী চীনা ছবি Fare well my Concubine-এর নির্মাতা চেন কেইগস আক্ষেপ করে বলেছেন তার ছবি চীনে বাজার পায়নি। কারণ হলিউডের সেক্স, ভায়োলেন্স মার্কা ছবিগুলো স্থানীয় ছবির বাজারকে শেষ

www.pathagar.com

করে দিয়েছে। এর কারণ এই নয়, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পণ্য অপশ্চিমা দেশের পন্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট। মূল ব্যাপার হলো বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আগে ভোক্তার রুচিতে পরিবর্তন ঘটায়। তারপরে তাদের পছন্দমতো পণ্য পরিবেশন করে। চেন হতাশার সুরে তখন বলেছিলেন ঃ A quarter of a century ago, we were crazy abunt politics Now we were crazy about making money. Our thinking has not really changed. I am afraid one day we will become money hooligans, without culture.

বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মুনাফার কথা বললেও তারা সংস্কৃতিবিহীন নয়। তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। সেটাই হচ্ছে চেনের ভাষায় অর্থ সন্ত্রাসীদের সংস্কৃতি।

এই সংস্কৃতির দাপটে আমাদের তরুণ তরুণীরা নানারকম অনুৎপাদনশীল কাজে আজ লিপ্ত হচ্ছে। পোশাক, ফ্যাশন, ক্যারিয়ার প্যাটার্নে সর্বত্র এক অন্ধ পশ্চিমা অনুকরণ। পত্র-পত্রিকা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যে সব বিষয় চর্চা করছে তা আসলে জাতির আশা আকাঙ্খার পরিবর্তে পশ্চিমের আদল এনে দিচ্ছে আমাদের চিন্তা-দর্শন-জীবন যাপনে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এমন সব মানুষকে সাপোর্ট বা প্রোমোট করছে যারা আসলে তাদেরই লোক। তাদের স্বার্থের তল্পীবাহী–আধুনিকতম পরিভাষায় সিভিল সোসাইটি।

আজকে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হলো ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুলভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে এবং একটি ইসলাম বিরোধী মীথ ও ডিসকোর্স গড়ে তোলা হয়েছে। এ কাজটি একদিনে হয়নি। দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্রুসেড্, উপনিবেশিকতা ও বিশ্বায়নের ভিতর দিয়ে এটা আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর একটা ফলাফল হয়েছে মুসলিম মানসে আত্মপরিচয়ের সংকট মহামারীর মত ছড়িয়ে গেছে। একই সাথে বিভেদ-বিভ্রান্তি, ইতিহাস চেতনার বিলুপ্তি, সামাজিক শক্তি হিসেবে ইসলামের প্রান্তিকীকরণ (marginalization), ইসলামের বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চরিত্রে ফাটল, ইসলামের মৌল বিষয়ে অনৈক্য, নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশহীনতা আজ মুসলিম সমাজের সাধারণ চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে তাই মুসলিম সমাজকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে এক লড়াকু প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় তার সংস্কৃতির নিরুদ্দেশহীনতা কাটবে না। মানুষকে যান্ত্রিক ও পন্য তুল্য করার বিশ্বায়নী প্রচেষ্টাকে রুখতে হলে মুসলিম মানসে ইসলামকে প্রান্তিক অবস্থান থেকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে টেনে নিয়ে আসার কোন বিকল্প নেই।

বিশ্বায়নের লাগামহীন মুনাফা লুণ্ঠন, অবাধ ভোগের মাধ্যমে সত্তাগত ক্ষতি, সম্পদের অসম বন্টন এগুলো কোন একদেশদর্শী কিংবা জাতীয় সমস্যা নয়। এটা মানব জাতির সমস্যা। এই সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হলে চাই বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টা।

সর্বোপরি এক বৈশ্বিক মতাদর্শের ভিত্তিতে সকল মানুষকে একত্রিত করে রূপান্তরের প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়া।

ইসলাম কোন দেশগত বা জাতিগত মতাদর্শ নয়। ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বে বৃহৎশক্তি দুর্বল শক্তি, পাশ্চাত্য-প্রাচ্য, প্রথম বিশ্ব-তৃতীয় বিশ্ব বলে কিছু নেই। ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিসটেমিওলজীর বড় কথা হচ্ছে ইলম, আদল ও ইহসান।

পাশ্চাত্যে এক সময় জাতি রাষ্ট্রের রমরমা দেখেছি এবং সেই জাতি রাষ্ট্রের নিপীড়নকামী বৈশিষ্ট্যও আমাদের চোখ এড়ায়নি। সেই জাতি রাষ্ট্র এখন দলা পাকিয়ে সাম্রাজ্যবাদের রূপ নিয়েছে-বিশেষত ইংরেজি ভাষী দেশগুলো। এই নব্য সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে ট্রান্স ন্যাশনাল মতাদর্শ হিসেবে ইসলামের উপযোগিতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইলম, আদল ও ইহসানের ভিত্তিতে মানুষের সৃজনশীলতা ও সক্ষমতার দিগন্তকে দৃঢ় করে, নিরাপত্তাহীনতা- বৈষম্যহীনতা ঘুঁচিয়ে সকলের অংশীদারিত্বকে নিশ্চিত করে, সামাজিক সম্পর্ককে স্থিতিশীল করে এক নতুন সমাজের উত্থান ঘটতে পারে। যে সমাজে সামাজিক শক্তি সঞ্চালন যত বেশি হবে, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে সমাজ তত বেশি করে সব রকমের অশুভ তৎপরতাগুলোকে প্রতিহত করতে পারবে। সকল জাতীয় তৎপরতাও এভাবে হবে দেশপ্রেম-জাত, গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক। ফলে ব্যক্তি ও সমাজের যুগপৎ প্রবৃদ্ধি ঘটবে। আর এভাবেই সৃষ্টি হবে নতুন মানুষ, নতুন শতাব্দীর মানুষ, তৃতীয় সহস্রাব্দের লাগসই মানুষ, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যথার্থ মানুষ। এভাবে বিশ্বায়নের অভিঘাতে সংস্কৃতির ভাঙা সেতুরও পুনঃনির্মাণ সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

জাতিসংঘ, ইকবাল ও সাম্রাজ্যবাদ

The body of coffin thieves formed for the distribution of graves.

Kept woman of the old man of Europe.

জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে এই মন্তব্য একজন কবির, যিনি এই উপমহাদেশের মানুষের উপর চেপে বসা ঔপনিবেশিক গোলামীর বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াই করেছিলেন। কবি হিসেবে তিনি উপমহাদেশের মানুষের চিত্তে যেভাবে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়েছিলেন বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথাটা তিনি যেভাবে উপস্থাপন করেছিলেন সেটা আর কেউ পারেননি।

১৯৪৫ সালে যখন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইকবাল বেঁচে নেই। কিন্তু জাতিসংঘের পূর্বসূরী লীগ অফ নেশনসের প্রতিষ্ঠা এবং এটিকে ব্যবহার করে পরদেশ লুণ্ঠনে সদা তৎপর, হিংস্র ও প্রকট মিথ্যুক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা যে সব অপকর্ম করেছে, তা তার চোখের সামনেই ঘটেছিল।

সারা দুনিয়া জুড়ে আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নির্বিচারে সন্ত্রাসী তৎপরতা, আগ্রাসন ও গুণ্ডামী চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ জাতিসংঘকে ব্যবহার করে এবং 'ন্যায়নীতি', সন্ত্রাসবিরোধিতা' ইত্যাদির দোহাই দিয়ে এই অবৈধ কাজকর্মকে মার্কিনীরা হালাল করছে। অর্থাৎ এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা কিছু করছে সেটা তারা করছে জাতিসংঘের মাধ্যমে। কাজেই জাতিসংঘের নিজস্ব কোন চরিত্র, অধিকার এবং ভূমিকা আজ আর অবশিষ্ট নেই। জাতিসংঘ আজ পরিণত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি দমনমূলক ও সন্ত্রাসী এজেন্সিতে। অন্যদিকে জাতিসংঘ এখন তার প্রভু হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কবুল করে নিয়েছে। বলা বাহুল্য ইরাক –আফগানিস্তানে আগ্রাসন, লক্ষ লক্ষ নর-নারীর প্রাণহানী এবং ফিলিস্তিনী মানুষের অপরিসীম দুর্দশা– এর পিছনে আছে জাতিসংঘ ও তার প্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূমিকা।

www.pathagar.com

আজকের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের যে চেহারা আমরা দেখছি ইকবালের জীবদ্দশাতেও লীগ অফ নেশনসের একই রকম তৎপরতা ছিল। শুধু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জায়গায় ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা বড় পাতটায় ভাগ বসাতো। এই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরাই বিদ্যমান সভ্যতার নীতি নৈতিকতা সব কিছু ভূলুণ্ঠিত করে আজকের ফিলিস্তিন সমস্যা তৈরি করেছে এবং ইসরাইলকে তাদের সামরিক ফ্রন্টলাইন হিসেবে মুসলমানদের সামনে তাক করে রেখেছে।

ফিলিস্তিনী জনগণের সংগ্রাম, জায়নবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতা সম্বন্ধে ইকবাল ওয়াকিফহাল ছিলেন বিশেষ করে দার্শনিক হিসেবে তিনি সাম্রাজ্যবাদের অন্তর বাহিরকে নির্মমভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন:

ফিলিস্তিনের মৃত্তিকায় যদি ইহুদীদের অধিকার থাকে
তাহলে স্পেনের উপর কেন থাকবে না আরবদের অধিকার?
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু -
নারংগী অথবা মধু ও খেজুরের ব্যবসা নয়।

ইকবাল মনে করতেন জাতিপুঞ্জ কিংবা তার নিয়ন্ত্রক পশ্চিমারা কস্মিনকালেও ফিলিস্তিনীদের দুর্দশা লাঘব করবে না। তাদের উদ্দেশ্য শক্তি ও কৌশলের জোরে এটিকে করায়ত্ত করে পরে তার জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করা। ইকবাল তাই বলেছিলেন ফিলিস্তিনীরা যদি ঈমানের অস্ত্রে বলীয়ান হতে পারে তবেই তাদের স্বাধীনতা মিলবে। তার কবি কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে এভাবেঃ

জামানা এখনো যার উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হয়নি
আমি জানি সে অগ্নি নিহিত তোমার অস্তিত্বে।
তোমার ঔষধ জেনেভা অথবা লন্ডনে নেই,
ফিরিংগীদের প্রাণশক্তি ইহুদীদের হাতের মুঠোয়।
গোলামী থেকে জাতির নিস্কৃতির পথ
আমি শুনেছি।
খুদীর লালন এবং তার বিকাশের
আনন্দের মধ্যে নিহিত।

ইকবাল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের ভারবাহী হিসেবে জাতিপুঞ্জের দায়িত্ব পালনের দিকটি খুব ভালভাবে ধরেছিলেন। তার বুঝতে দেরী হয়নি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিপুঞ্জের ভূমিকা আসলে গৌন। তার কাছে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর পাওয়ার কিছু নেই। ইকবাল ‘জাতিপুঞ্জ’ শিরোনামে

www.pathagar.com

ছোট একটি কবিতাও লিখেছিলেন। তার ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে :

কদিন হতে বেচারা শায়িত মৃত্যু শয্যায়,
হয়তো দুঃসংবাদ বের হবে আমার কণ্ঠ
হতে, তাই ভয় হয়। একথা সুস্পষ্ট, ভাগ্য
নির্ধারিত হয়ে গেছে, গীর্জার অধিনায়করা
কিন্তু প্রার্থনা করছে, এটা যেন টলে যায়।
হয়তো বৃদ্ধ ফিরিংগীদের এ রক্ষিতা আরো
কদিন বাঁচবে ইবলিসের তাবিজের গুণে।

২

ইকবাল দর্শনের ছাত্র ছিলেন। দর্শন পড়তে যেয়েই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃত রূপটি তিনি বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ যে পশ্চিমা সভ্যতার চরিত্রের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তা তিনি চিহ্নিত করতে ভুল করেননি। তিনি দেখেছিলেন পশ্চিমাদের প্রাযুক্তিক ও কৌশলগত সমৃদ্ধি যত ব্যাপকই হোক না কেন তার নৈতিক ভিত্তি বড় দুর্বল। এই দুর্বলতার ফাক গলিয়েই সেখানে মাথা খাড়া করেছে ক্যাপিটালিজমের দানব। এই ক্যাপিটালিজমের চরিত্রই সাম্রাজ্যবাদী, ভোগবাদী, আত্মসুখবাদী হয়ে ওঠা। এই ক্যাপিটালিজম ভোগের নানা স্বপ্ন, চাহিদা সৃষ্টি করে। সেই চাহিদার চাপেই আমরা মোবাইল ফোনে বেহুদা কথা বলি। টেলিভিশনে যে সাবান অর্ধনগ্ন ও ভেজা কাপড় পরে মেয়েরা ফেরি করে সেটা কিনতে প্ররোচিত হই। মানে ক্যাপিটালিজম আমাদের ইন্দ্রিয়ে সুড়সুড়ি দেয়। ওতে এমন এক কাল্পনিক 'বেহেশত' তৈরি হয় যাতে পরলোক আমাদের ইহলোকে পরিণত হয়। আর আমরা কল্পনায় সেই পরলোককে ইহলোকে পেয়ে যেয়ে ধর্মের পরলোককে ঘৃণা করতে শিখি। এই জন্য মোল্লা, মৌলভীদের 'মৌলবাদী' বলে গাল দিতে কসুর করি না। ক্যাপিটালিজম কেন ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করে? কারণ ধর্মের যে বেহেশত তা ক্যাপিটালিজমের বেহেশত প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রবল বাধা। এই জন্যই ক্যাপিটালিজম ধর্মের বিরুদ্ধে, ধার্মিকের বিরুদ্ধে, সবরকম নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে।

ইকবাল ক্যাপিটালিজমের চাকচিক্যের তলায় মানবতা বিধ্বংসী বীজকে দেখেছেন। তার জীবদ্দশায় তিনি গভীরভাবে খেয়াল করেছিলেন তথাকথিত 'অগ্রসর' ইউরোপীয় দেশগুলো কিভাবে মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সেটি প্রাচ্যের দেশগুলোকেও গ্রাস করতে আসছে। ইকবাল তার এক প্রসিদ্ধ কবিতায়

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের নগরবাসীকে এই বলে সাবধান করেছিলেন ভঙ্গুর শাখায় বাঁধা নীড় স্থায়ী হতে পারে নাঃ

হে পাশ্চাত্য বাসী
আল্লাহর পৃথিবী একটি দোকান ঘর নয়।
আর তোমরা যাকে সত্যিকারের স্বর্ণমুদ্রা মনে করেছ
তা মেকী বলেই প্রমাণিত হবে।
তোমাদের নিজেদের খঞ্জরের উপরই
আপতিত হবে তোমাদের সভ্যতা।
ভঙ্গুর বৃক্ষশাখায় নির্মিত কুলায়
ভেঙে পড়বে- আজ নয় আগামীকাল।
কখনো এ স্থায়ী হবার নয়।

ইকবালের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি। ক্যাপিটালিজমের নৈরাজ্য বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, খুন, পরদেশ লুণ্ঠন, শোষণ, পরিবেশের সংকট সৃষ্টির পাশাপাশি সে আজ এক বিশ্বজোড়া সাংস্কৃতিক বর্ণবাদ তৈরি করেছে যার ভুক্তভোগী বিশ্বেরতাবৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী। কমিউনিজমের পতনের পর পশ্চিম থেকে শোনা গিয়েছিল ইতিহাস ফুরিয়ে যাওয়ার তত্ত্ব। তখন বলা হয়েছিল এখন থেকে পুঁজিবাদ অনুবর্তী উদারনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করা মাত্র পৃথিবীর মানুষ 'সব পেয়েছির দেশে' 'পৌছে যাবে'। কিন্তু পৌছায়নি। ক্যাপিটালিজম ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হানাহানি, রক্তভক্ষণ অবাধে চলছে। প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ইরাকে, আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে। আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ফ্রিডম, ডেমোক্রাসি কায়েমের আড়ালে দেশে দেশে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। বনিক সভ্যতার এই অধিপত্যবাদী চিত্র ইকবাল ঠিকই ধরেছিলেনঃ

ইম্পিরিয়ালিজম এর দেহটা প্রকাণ্ড,
হৃদয়টা অন্ধকার ...।

সুতরাং ইকবালকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা ভাবতে হয়েছিল। কারণ এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আধিপত্যবাদের জীবানু। কার্লমার্কসও ক্যাপিটালিজমের বিকল্প স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিজম শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা সভ্যতার বিকল্প শর্ত হয়ে উঠতে পারেনি। এটা যা করতে পেরেছিল তা হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটা বিকল্প ধারা সৃষ্টি করতে। কোনভাবেই পুঁজিবাদী সভ্যতার বিকল্প নয়। তাই শেষ পর্যন্ত কমিউনিজম টিকতে পারেনি।

www.pathagar.com

বিকল্প সভ্যতার কথা ভাবতে যেয়ে ইকবাল ইসলামকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। তিনি এর আন্তর্জাতিক চিত্রটি বিশ্বমানুষের সামনে ফুটিয়ে তুললেন। নতুন সভ্যতার কথা বলতে যেয়ে তিনি কোরআনের সমাধান সূত্রগুলোর দিকে ইংগিত করলেন:

কোরান কাকে বলে? সে হলো ধনিকের মৃত্যু পরোয়ানা, আর
অন্নহারা যারা, সর্বহারা দাস, কোরান আশ্রয় তার।
আমরা যে যেখানে সকলে একাসনে বসেই রুটিজল খাই
আমরা আদমের বংশধর যারা, সবার এক আত্মাই।
মনের ভিতরে তা পৌছে যায় যদি, বদল হয়ে যায় মনে,
বদল হলে মনে গোটা এ পৃথিবী সে মাতায় পরিবর্তনে।

ইকবাল মনে করতেন মানব নিয়তির এই ব্যাখ্যাই ইসলাম একদিন দিয়েছিল। কিন্তু এটিকে আজো মানব সমাজ পূর্ণাঙ্গভাবে রূপান্তরিত করতে পারেনি। মানুষের অগ্রগতি ও কল্যাণে ইসলামের কালজয়ী ভূমিকা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। বিশ্বমানুষের সার্বিক কল্যাণে ইসলামের এই নব অভ্যুত্থানে কোন সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী তাৎপর্য নেই। পৃথিবীর মানুষ যখন এক আসন্ন রূপান্তরের প্রয়োজন অনুভব করছে, অনুভব করছে পুনর্নির্মাণ- পুনর্গঠনের সেখানে ইসলামের এই পুনরুজ্জীবন ভাবনায় কোন অন্যায় নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরে এক নতুন সভ্যতার উত্থানের পক্ষে তিনি তার ধারালো যুক্তি দিচ্ছেন এই ভাবে: The object of my Persian `Masnavis' is not to attempt an advocacy of Islam. My real purpose is to look for a better social order and to present a universally acceptable ideal (of life and action) before the world, but it is impossible for me, in this effort to outline this ideal to ignore the social system and values of Islam whose most important objective is to demolish all artificial and pernicious distinctions of caste, creed, colour and economic status ... I have selected the Islamic community as my starting point not because of any national or religious prejudice, but because it is the most practicable line of approach to the problem.

ইসলাম আজ এক বিকল্প মতাদর্শ। এই মতাদর্শিক শক্তির কারণেই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ আজ ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীর উপর হামলে পড়েছে। কিন্তু ইকবালের স্বপ্ন অপরাজেয়। তার স্বপ্ন মন্থন শেষ হবার নয়।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের মোহ ও আমাদের বিদ্বৎ সমাজ

সাম্রাজ্যবাদ নানা রকমের মুখোশ পরে থাকে। সভ্যতার মুখোশ, উদার নৈতিকতার মুখোশ, গণতন্ত্রের মুখোশ, বিশ্বায়নের মুখোশ। সাম্রাজ্যবাদের হাতে অনেক সম্পদ। সে জন্য সে খুবই শক্তিশালী তাবেদার সৃষ্টি করে। সে উৎপাদন ঘটায় নানাবিধ মোহের। ফলে তার মুখোশের অভাব হয় না। যখন যে মুখোশের প্রয়োজন সেটি পরে সে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখে।

সাম্রাজ্যবাদ জিনিসটা নতুন নয়। কিন্তু তার ভয়ংকর চেহারা এমনভাবে আর কখনো দেখা যায়নি। সাম্রাজ্যবাদ এখন দ্রুত উন্মোচিত হয়ে পড়ছে। উদোম হয়ে পড়ছে তার শরীর। কোন মুখোশেই আর কুলোচ্ছে না। হিটলারের কথা আমরা শুনেছি। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কলহ, লুণ্ঠন ও সেখানকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফাঁক গলিয়েই তৈরি হয়েছিল হিটলারের মত মানুষ। কিন্তু সেই হিটলারকেও আজ ব্যাপকতায় ও স্থায়িত্বে ছাড়িয়ে গেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। হিটলারের যত না দোষ ছিল, তার চেয়ে বেশি বদনামী জুটেছে। সেদিনের ইঙ্গ-মার্কিন ফরাসি মিত্র জোটের প্রপাগান্ডার জোরে তাকে দানব বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই দানবের চেয়ে আজকের বুশ-ব্লেয়ার ও তার ছানাপোনারা নিষ্ঠুরতা ও জঘণ্য অমানবিকতায় সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের সমষ্টিগত অর্জন এমন সংকটে আর কখনো পড়েনি। কেবল মানুষ নয় এদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে প্রকৃতিও আজ বিপন্ন।

প্রগতিশীল বলতে আজ তাই বুঝাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। এটা ঠিক প্রগতিশীলতা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের কাছে প্রগতিশীলতার অর্থ দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের গোলামী করা। এক সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন সক্রিয় ছিল তখন এদেশে কমিউনিষ্টদের প্রগতিশীল বলা হতো, মুলত তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধিতার কারণে। কিন্তু আজকে সেই কমিউনিষ্টদের অনেকেই নানা রকম জাগতিক সুখ সুবিধার মোহে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে আত্মসমর্পণ করছে। এখন তাদের অবস্থান কি প্রতিক্রিয়াশীল?

এই আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও প্রগতিশীলতার একটা মাত্রা আছে এবং সেটা হয়তো প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে অগ্রগামিতা। সেই অগ্রগামিতার পথে সাম্রাজ্যবাদই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। এ প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যার বিরোধিতা নেই কিংবা তাদের সঙ্গে যারা আপোষ করে ফেলেছে তাদের আর যাই

www.pathagar.com

হোক প্রগতিশীল বলা চলে না। ইতিহাস থেকে দু একটা নজীর নেয়া যাক। রাজা রামমোহন রায়কে বলা হয় বড় মাপের মানুষ। তিনি হিন্দু ধর্ম সংস্কার করে ব্রহ্ম ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা নিবারণে তার বড় ভূমিকা ছিল। সবার উপরে বহুল আলোচিত উনিশ শতকীয় বাংলার যে নবজাগরণ তার প্রধান উদ্যোক্তা পুরুষ ছিলেন তিনি। বাংলা-ইংরেজি-সংস্কৃতি-ফারসি প্রভৃতি নানা ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও এদেশে তিনি বৃটিশ কলোনাইজেশনকে সমর্থন করেছিলেন। ব্রিটিশের ন্যায়পরায়নতায়(?) তার ছিল অগাধ আস্থা। ভারতীয়দের 'সভ্য' করার ব্যাপারে ইংরেজের ভূমিকার তিনি ছিলেন উৎসাহী সমর্থক। মোটকথা দেশাত্মবোধ বলতে তিনি ইংরেজের প্রভুত্বের সমর্থনকেই বুঝতেন। রামমোহন এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে মজবুত করার জন্য একদল শিক্ষিত ব্রিটিশ দালাল তৈরি করেছিলেন, যার মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ির প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এরা ইংরেজের এত অন্ধ অনুগত ও ভক্ত ছিলেন যে রামমোহনের অনুরাগী প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বলেছেন: ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও, না ইংরেজের অধীন হয়ে থাকতে চাও। আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলে গ্রহণ করবো। (বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার)

অথচ এই সব মানুষ স্বদেশ প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছে বলে ইতিহাসে জয়ঢাক বাজানো হয়েছে। এর পিছনে যে ইংরেজের হাত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই সেদিন ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। রাজা ও প্রিন্স না হয়েও ইংরেজের কৃপাধন্যে এরা সেই স্তরে উন্নীত হয়েছেন। রামমোহন ইংরেজকে জবর দখলকারী হিসাবে দেখেননি। দেখেছেন ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তিদাতা হিসাবে। তার ভাষায় : Divine providence at last in its abundant Mercy stirred up the English to break the yoke of those tyrants and to recive the oppressed natives of Bengal under its protection.... Your dutiful subjects have not viewed the English as a body of Conquerors but rather as deliverers and to look up to your Majesty not only as Rulers bur also as father and protector. (English Works of Raja Rammohun Ray Calcutta,1921,p-470)

এই মোহের কারণ কি? সাম্রাজ্যবাদ রামমোহন, দ্বারকানাথের মত মানুষদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের যে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ তা কিন্তু এদের দেখার কায়দাটিই পরিবর্তন করে ফেলেছিল। রামমোহনকে বলা হয় উদারনীতিক। কিন্তু উদারনীতিকদের অসুবিধা হচ্ছে তারা যতই আন্তরিক হোন না কেন চিন্তা ও বস্তুগত স্বার্থের দিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের যে নিয়ন্ত্রণ তা তারা কখনোই ছিন্ন করতে পারেন না।

www.pathagar.com

রামমোহনের কাল অনেকদিন গত হয়েছে। দুশ' বছর পার হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ তার চেহারা পাল্টায়নি। দেশে দেশে লুণ্ঠন, ভূমিদখল, গণহত্যার সেই পুরনো সিলসিলা আজও চলছে। ইরাকে, আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে লাখ লাখ মানুষকে তারা মেরে ফেলেছে। জাতিসংঘ পরিণত হয়েছে আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানে।

এখনও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে নিয়ে মোহের শেষ নেই। এখনও এরা ওসব দেশে যেতে পারলে বা ওদের কথা শুনতে পারলে আহ্লাদিত বোধ করেন।তারা ভাবেন তাদের স্বর্গলাভ ঘটেছে। গত কয়েকশ' বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মতো নির্যাতিত দেশগুলোতে শিক্ষিত মানুষের মনে যে মোহ সৃষ্টি করেছে এর দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষ করা যাবে না।

গত শতকের বিশের দশকে বাঙালি মুসলিম সমাজে রামমোহনের এক ভাবশিষ্য তৈরি হয়েছিলেন। তার নাম কাজী আবদুল ওদুদ।

ওদুদ সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও জীবনাদর্শই তার কাছে গুরুত্বপুর্ণ ছিল। ঐ ইউরোপীয় আয়নায় তিনি স্বসমাজ ও স্বসংস্কৃতিকে বিচার করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যেমন করে ইসলামকে একটি বর্বর, 'অসভ্য' 'জঙ্গি' 'মধ্যযুগীয়' ধর্ম হিসাবে প্রচার করেছেন ওদুদ সাহেবের চিন্তা ভাবনা তার থেকে খুব একটা পৃথক ছিল বলে মনে হয় না। তিনি আজীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করেছেন। তার বিখ্যাত বইয়ের নাম হচ্ছে 'শাশ্বত বঙ্গ'। কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি এই বইতে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠী নিয়ে তিনি গৌরব করার মত কিছু লিখতে পারেননি। সর্বত্রই ইসলামের প্রতি এক গভীর ক্ষেদোক্তি। যেন ইসলামই বাঙালি মুসলমান তথা মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কারণ। তার বহু সমালোচিত প্রবন্ধ 'সম্মোহিত মুসলমান' এ তিনি লিখেছেন ঃ ইসলামের ইতিহাস বহুল পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস। সুতরাং এই ব্যর্থতার জঞ্জালকে অপসারণ করতে হলে ইসলামী নীতি ও শাস্ত্রের বোঝাকেই (?) সরিয়ে ফেলা হচ্ছে তার পরম আরাধ্য। ওদুদ সাহেবের ভাষ্য এরকমঃ জানি, প্রতিপক্ষের এখানে একটি শক্ত জবাব আছে। তার উক্তিতে দাঁড়াবে, 'আমাদের যে সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ তার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে। আর সে ধর্মশাস্ত্র যে অপৌরুষেয় –revealed– এরই পরিবর্তন হবে না কি? সম্মান পুরঃসর প্রতিপক্ষকে নিবেদন করতে চাই, হ্যাঁ এ কথাটাও ভেবে দেখা দরকার ওদুদ সাহেবকে সমর্থন করবার মত মানুষের অভাব নেই এদেশে। মুসলিম

www.pathagar.com

সমাজের এই অংশই সাম্রাজ্যবাদের সমব্যথী। মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেও চেতনার দিক দিয়ে তারা পশ্চিমের আধিপত্যকে লালন করে চলেছেন। আজকের মুসলিম সমাজে সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন বিস্তারে এরাই হচ্ছে ভ্যানগার্ড।

উনবিংশ শতাব্দীতে কলোনিয়াল ব্যবস্থাকে সংহত করার জন্য বাংলার রেনেসাঁসের দরকার হয়েছিল। ব্রিটিশরা ছিল এর প্রোডিউসার, বাঙালি বাবুরা ছিল কনজিউমার। এই রেনেসাঁসের সূত্র ধরেই উনবিংশ শতাব্দীতে অত্যন্ত বড় মাপের বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী, সংস্কারক ও সাহিত্যিকদেরও উত্থান আমরা দেখতে পাই। এরা সব রকম যোগ্যতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন না। ইংরেজের পরাধীনতাকেই এরা স্বাধীনতা বলে চালিয়েছেন। শুধু পরাধীনতা নয়, সমাজে যে শোষণ চলছে তার ব্যাপারেও এরা ছিলেন নিস্পৃহ। এদেশে ইংরেজ শাসনকে মজবুত করতে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও ইংরেজের প্রশ্রয়ে নতুন গড়ে ওঠা কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজ সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। এদের একজন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করেছিলেন। ঘুণাক্ষরেও তিনি চাননি ইংরেজ রাজ্যের অবসান হোক। কেন চাননি সেটিও তিনি বলিষ্ঠভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন: ইংরেজ ভারতবর্ষের পরম উপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নতুন কথা শিখাইতেছে, যাহা আমরা কখন জানিতাম না তাহা জানাইতেছে, যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে। যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজদের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিয়াছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম– স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না। (বঙ্কিম রচনাবলি, পৃষ্ঠা-২৪০-৪১)

এই যে ব্রিটিশ শাসকরা আমাদের 'সভ্য' বানাবার কসরত করেছেন, নতুন কিছু শুনিয়েছেন বা বুঝিয়েছেন, নতুন আলো এনে উজ্জ্বল মানুষ তৈরি করতে সাহায্য করেছেন এর জন্য কৃতজ্ঞতার কোন অভাব নেই। ভাবটা এমন ব্রিটিশরা না এলে আমরা 'সভ্য ' হতে পারতাম না, একেবারে অন্ধকারে তলিয়ে যেতাম। ব্রিটিশরা আসার আগে এই উপমহাদেশে একটা উন্নত সভ্যতা ছিল। বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা ঐ ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। যে সভ্যতা তাজমহল, ফতেহপুর সিক্রি গড়ে তুলেছিল, যেখানে তৈরি হয়েছিল আমীর খসরুর মত কবি, আবুল ফজলের মত পণ্ডিত, তা কি এসব নব্য

www.pathagar.com

আলোকপ্রাপ্তদের মনে রাখা সহজ ছিল? মোটেই নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও মনে রাখতে পারেননি। তার উপলব্ধি স্থানীয় মানুষদের উপকারের জন্য এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক সাম্রাজ্যবাদী লর্ড মেকলের মত থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। ইংরেজ আগমনের 'মঙ্গলময়' দিক সম্পর্কে রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথরা যা ভেবেছিলেন পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রও সেই ধারায় ভেবেছেন আর কি। মজার ব্যাপার হচ্ছে সুদূর ইউরোপে বসে কালমার্কস ভারতে ইংরেজ শাসনের ভয়াবহ রূপটি বুঝতে পারলেও ইংরেজের আলোয় আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি বাবুরা বুঝতে পারেননি। সেই ১৮৫৩ তে কালমার্কস লিখেছিলেন ঃ The whole rule of Britain in India was swinish, and is to this day.

বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয় অগ্রসর চিন্তার মানুষ। তাকে বলা হয় ঋষি। এই সব বিপুল আয়োজনের মধ্যেও তিনি সাম্রাজ্যবাদকে যথাযথভাবে চিনতে পারেননি। এই না পারার কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই তাদের ছাঁচে ঢেলে এই 'অগ্রসর চিন্তার মানুষকে' নিজেদের মত করে তৈরি করে নিয়েছিল। না হলে হাতে পায়ে শিকল পরা এই গোলামীর কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পেতাম না ঃ ১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভব না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃংখলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমন কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরেজের অমঙ্গলকামী হইব, সমাজের অমঙ্গলকামী হইব, সেইদিন সে পরামর্শ দিব। (বঙ্গদেশের কৃষক)।

ইংরেজ শাসনকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে এটা বঙ্কিমের একটা সুপরিচিত বক্তব্য। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে খোলাখুলি মাঠে নেমেছেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজের কীর্তি। তারাই চালু করেছিল এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই ছিল এদেশে ইংরেজের শক্তির উৎস আবার সব রকমের শোষণ-শাসন নীতি এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য চরম ক্ষতিকর হলেও এর উপর তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ গড়ে উঠেছিল, যারা ছিল ইংরেজের উচ্ছিষ্ট ভোজী। সেই বঙ্গীয় সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন বঙ্কিম। বঙ্কিম সেই সমাজের ক্ষতির কথা ভাবতে পারেননি। শুধু তাই নয় ইংরেজ প্রভুকে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসভাজন বলে চিহ্নিত করাও স্বপ্নের বাইরে ছিল তার। কেননা তিনি ইংরেজের অমঙ্গলকামী নন এবং এটাও তার উপলব্ধি বটে ইংরেজের মঙ্গল

www.pathagar.com

এবং ঐ বঙ্গ সমাজের মঙ্গল এক ও অভিন্ন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই রকম কথা বলেছিলেন। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদেরও তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তিনি লিখেছেন জমিদারি উঠে গেলে গায়ের লোকেরা জমি নিয়ে লাঠালাঠি, কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে মরবে। (প্রমথ চৌধুরী' 'রায়তের কথা' বইয়ের ভূমিকা)।

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় সাম্রাজ্যবাদের মোহ থেকে মুক্তির ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এখনো তো ঐ মোহ আছে। তখনকার মোহ ছিল চাকরি বাকরি, কলকাতায় থাকা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিতরণ করা নানা রকম 'আলোয়' আলোকিত হওয়া। এখন এই মোহের রূপ বদল হয়েছে, চরিত্র বদল হয়নি। নগদ নারায়ণ, বস্তুগত সুবিধা থেকে শুরু করে বৃটেন, আমেরিকায় বসবাস সবই এর মধ্যে বহাল তবিয়তে মিশে আছে। সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটেনের আর একটি জিনিস দরকার ছিল। সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। ব্রিটিশরা আসার আগে এই জিনিসটা ভারতবর্ষে ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীরা তাই 'ঋষি' ও 'সম্রাট' বঙ্কিমের শিল্প নিপুণতা দিয়ে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার পথ খুলে দিল। 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহের' মত উপন্যাসগুলো যে দেশাত্মবোধের জন্ম দিয়েছে তা কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে পরিণত না হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। ফলে ভারত ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেছে। আনন্দমঠের সেই বিখ্যাত ভাষ্য উদ্ধার করছি: মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি ইংরাজের হইয়া পড়িল। হিন্দুরা রাজ্য জয় করিয়া ইংরাজকে দিল। কেননা হিন্দুর ইংরাজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরাজের অধীন ভারতবর্ষে হিন্দু অত্যন্ত প্রভুভক্ত।

এই যে ইংরেজকে মিত্র মনে করা এবং মুসলমানকে শত্রু জ্ঞান করা এর পেছনে যুক্তিটা কি? এই যুক্তির পিছনের আকাঙ্খা হচ্ছে ইংরেজের সহযোগিতা নিয়ে সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন, যার লক্ষ্য ভারতবর্ষব্যাপি এক হিন্দু ধর্মীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। বলা বাহুল্য এই জাতীয়তবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দ ও তার শিষ্যরা সশস্ত্র লড়াই করেছিলেন। বলা বাহুল্য এই লড়াইয়ের মধ্যে একধরনের দেশাত্মবোধের প্রকাশ রয়েছে কিন্তু উদার মানবিকতার অনুপস্থিতিও ভয়ানকভাবে প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রচিন্তায় মুসলমানদের কোন স্থান ছিল না। এটাকে কোন সেকুলার চিন্তা বলা যাবে না। সাহিত্য সম্রাটের 'মুসলমান প্রীতির' নিদর্শন স্বরূপ তার একটা লেখার নমুনা দেওয়া যেতে পারে: ঢাকাতে দুই চারিদিন বাস করিলেই তিনটি বস্তু দর্শকদের

www.pathagar.com

নয়ন পথের পথিক হইবে-কাক, কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়, অতিদুর্দ্দম, অজেয়। ক্রিয়া বাড়িতে কাক আর কুকুর, আদালতে মুসলমান। (বাংলা ১২২৭ সালের অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শণের পৃষ্ঠা ৪০১ দ্রষ্টব্য)
ভারতবর্ষে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ কর্তৃত্ব করবে এরকম একটি ঘোষণাকে ফ্যাসিবাদী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা যায় না। এই একগুয়ে মনোভাবের জন্য জিন্নাহর মতো উদারনৈতিক নেতাও কংগ্রেসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা ভারতবর্ষীয়দের জন্য কতটা ক্ষতিকর হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য কি পরিমাণ সুখকর হয়েছে তা পরিমাপ করা সত্যই কঠিন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এতটুকু বলা যায় তিনিই বঙ্গীয় হিন্দু রেনেসাঁর মধ্যমণি, শ্রেষ্ঠতম ফসল। তার সৃষ্টিশীলতার প্রাচুর্যে বাংলা ভাষা বহির্বিশ্বে বিপুল পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু এদেশে যে সমস্ত ব্যক্তি বা পরিবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে স্থায়ী হতে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছিল জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ি তার একটি। সামন্ত-জমিদার-বুর্জোয়ার যে মিশ্র পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে উঠেছিলেন তা কিন্তু ব্রিটিশের প্রশ্রয়ে গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশের জুলুম- অবিচার তার কবি মনকে মাঝে মাঝে কিঞ্চিত নাড়া দিয়েছে সত্য, এমনকি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর তিনি নাইটহুড ত্যাগের মতো সিদ্ধান্ত নেন। তার পরেও ব্রিটিশ অনুরাগ ছিল তার মজ্জাগত। বঙ্গ ভঙ্গ রদ করায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের উদ্দেশ্যে ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে কৃতজ্ঞ কবি 'জনগণ মন অধিনায়ক' প্রশস্তিটি রচনা করেন।
২৩-১-১৩১৫ তারিখে নির্ঝরিণী সরকারকে এক চিঠিতে ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের শাসন হিসাবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যথাযথ নয় বলে মত দেন। আবার রমারলার কাছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি হাজির করে ভারতের পরাধীনতাকে স্বাগত জানান। রামমোহনের মোহের সাথে রবীন্দ্রনাথের মোহের তফাৎ নেই। রামমোহনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরের মানুষ কিন্তু ব্রিটিশ আনুগত্যে ও ব্রিটিশের প্রসন্নতায় তার মন একই রকম রক্তিম হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবী' যখন ইংরেজ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় তখন শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা চেয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে- ইংরেজ রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করব এটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলুম। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশি বা বিদেশি প্রজার বাক্য বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা

www.pathagar.com

আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে নিয়ে কবির এই মুগ্ধতার যেন শেষ নেই। সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষীয়দেরকে শোষণ তো করেছেই, লাঞ্ছিত ও অপমানিতও কম করেনি। ব্রিটিশের অধীন ভারতবর্ষীয়দেরকে দাস হয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু সেই দাসত্বের বিরুদ্ধে কবি কথা বলতে পারছেন না, কারণ সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সেদিন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইংরেজরা এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। তাদের পক্ষে বড় মুখ করে তাই স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। পরে সে আন্দোলন পরিহার করে ভূবন ডাঙ্গায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথম দিকে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের তিনি নেতৃত্ব দেন এবং সেই আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার জন্য আমার সোনার বাংলা, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে প্রভৃতি গান রচনা করেন। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের এই মনোপরিবর্তনে ব্রিটিশ সরকারের হাত ছিল। এর পরেই আসে নোবেল প্রাইজ। তার পর থেকে তিনি বিশ্বমানবতার তত্ব প্রচারে নিবিষ্ট হন। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে তিনি লেখালেখিও শুরু করেন। তার 'রাজকুটুম্ব, ঘুষোঘুষি, স্বদেশি ও স্বাবলম্বন, স্বদেশি সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধ তার প্রতিক্রিয়াশীলতার নজীর। ব্রিটিশ শাসনের স্বপক্ষে তিনি লিখেছিলেন 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। এখানে স্বদেশি বিপ্লবীদের আন্দোলনের অন্যায্যতার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল। ইংরেজ সরকার এর শত শত কপি কিনে নিয়ে বিভিন্ন জেল খানায় আটক স্বদেশি বিপ্লবীদের মাথা ধোলাই করার জন্য বিতরণ করত এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রামেগঞ্জেও নাটক আকারে অভিনয় করাতো। সাম্রাজ্যবাদের এই বন্ধন মুক্তি আজও আমাদের ঘটেনি। সাংস্কৃতিক অর্থেও না, অর্থনৈতিক অর্থেও না এমনকি রাজনৈতিক অর্থেও না। এর কারণ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি। সে দুর্দমনীয়। রামমোহনের কালে, রবীন্দ্রনাথের কালে সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল তা আজও বহাল তবিয়তে টিকে আছে। সাম্রাজ্যবাদের চিন্তা ও দর্শন আজও পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ঐ চিন্তার নাম হচ্ছে পুঁজিবাদী উদার নৈতিকতা। এই উদার নৈতিকতার জালে আটকে আছে দুনিয়ার তাবৎ নির্যাতিত দেশগুলোর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, শিক্ষিত শ্রেণী। এই উদার নীতিকরা সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষ শক্তি। আগেই বলেছি এই উদার নৈতিকতা একটা মুখোশ। এরা মানুষের অধিকারের কথা বলে বটে, কিন্তু স্বাধীনতার কথা বলে না। সাম্রাজবাদের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না। কারণ সেখানে ঝুঁকি থাকে। আসলে পশ্চিমা উদারনীতির চর্চা সমাজের সুবিধাভোগী অংশের বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁর

www.pathagar.com

মহারথীদের উদারনৈতিকতা তাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় রূপ নেয়নি। বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের দশকে ও পরে আরো অনেক কবি সাহিত্যিক আধুনিকতার নামে নানা ধরনের হৈ হুল্লোড় করেন। পাশ্চাত্য উদ্ভুত নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-চেতনাকে নিজেদের মত করে সাহিত্যের মাধ্যমে উপস্থিত করেন বটে কিন্তু তা কখনো জনগণের মুক্তির কিংবা সাম্রাজ্যবিরোধিতায় দাঁড়ায়নি। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পক্ষে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের একটি অংশের অনুমোদন এত শক্তভাবে বিদ্যমান যে এটি একটা স্ট্যাটাস সিম্বলে পরিণত হয়েছে। কারো পুত্র বা আত্মীয় যদি স্টেটসে থাকে তাহলে যেন জাতে উঠতে সুবিধা হয়। এই কুলিন প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে সবাই তেড়ে আসবে। আজকালতো কাউকে 'মৌলবাদী', 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দিতে পারলে কাজ অর্ধেক হাসিল। কারণ প্রতিপক্ষের মুখ আগেই বন্ধ করে দেওয়া যাবে। এদেশে রামমোহন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও একই বদনাম নিয়ে বিদায় হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ঝুঁকি নিয়ে ছিলেন তিতুমীর। তাকে জীবন দিতে হয়েছিল। নজরুল কিছুটা এগিয়েছিলেন। তাকে কারাবাস করতে হয়েছিল। তাই বলে তো, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই থেমে থাকবে না। কারণ ও জিনিসটা মানবতার শত্রু। মানবতার মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতেই হবে।

এ আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে বলতে হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পূর্বতন অভিজ্ঞতা বলছে সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হলো, সাম্রাজ্যবাদ ও তার ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্তি। এটা না হলে এক পাও এগুনো যাবে না। দ্বিতীয় কথা জনগণকে সাথে নিতে হবে। জনগণকে সাথে নিয়েই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। লক্ষ্য থাকবে দেশের ভিতরে সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার যে শাসক শ্রেণী তাদেরকে পরাভুত করে প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ হতে পারে ইরান। ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে যে রাজতন্ত্র বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা একালের একটা বড় দৃষ্টান্ত। তিনি যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন, যা ছিল একাধারে সাহসী, জনসম্পৃক্ত, মেরুদণ্ডসম্পন্ন, দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্তর্জাতিক, দেশের মানুষের বিশ্বাস ও মুল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অথচ নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখানে বোধ করি ছোট আকারে হলেও উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত আছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কেমন হওয়া উচিত এবং কোন্ পথে এগুনো দরকার।

www.pathagar.com

চে গুয়েভারা, সাম্রাজ্যবাদ ও আজকের কমিউনিজম

পত্রিকার পাতায় দেখলাম বিপ্লবী চে গুয়েভারার ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার একটি সংগঠন বড়সড় একটা অনুষ্ঠান করেছে। তার মৃত্যুর এতদিন পর আমাদের এখানে তার মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের প্রাসঙ্গিকতা হয়তো আছে, কিন্তু বামপন্থী বলে পরিচিত এই শ্রেণীর চে গুয়েভারাকে নিয়ে উৎসাহ দেখে কয়েকটা কথা মনে পড়ল।

চে গুয়েভারা ছিলেন কিউবার বিপ্লবের অন্যতম নায়ক। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৫৯ সালে অত্যাচারী বাতিস্তা সরকারকে উৎখাত করে কমিউনিস্টরা কিউবার ক্ষমতায় আসে এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত ক্ষমতায় আছে। কিউবার এই বিপ্লবে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন চে গুয়েভারা। হয়তো তিনি না থাকলে ক্যাস্ট্রোর পক্ষে কিউবার বিপ্লবের মতো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না।

চে গুয়েভারা জন্মেছিলেন আর্জেন্টিনায়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক; কিন্তু বিপ্লবের নেশা তাকে চিকিৎসা পেশায় আটকে রাখতে পারেনি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যখন অধ্যয়ন করছেন তখন তিনি মোটরসাইকেলে করে ল্যাটিন আমেরিকা ভ্রমণ করেন। পরে ল্যাটিন আমেরিকা ভ্রমণের সেসব কথা তিনি লিখে গেছেন 'মোটর সাইকেল ডায়েরিজ'-এ। যে বই প্রকাশিত হওয়ার পর বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

এই ভ্রমণের সময় তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে বিচলিত হন। তিনি বুঝতে পারেন, মানুষের এই দুঃখ-দুর্দশার মূলে আছে পুঁজিবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বাজারের ওপর পুঁজিপতিদের একচেটিয়া আধিপত্য। আর তাই তিনি শোষণমুক্তির পথ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও বিপ্লবের পথ বেছে নেন। সাম্রাজ্যবাদ ও তার পোষিত পুঁজিপতিদের উৎখাত করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি জড়িয়ে পড়েন। এই জন্যই আর্জেন্টিনার চে গুয়েভারাকে দেখি কিউবায় এসেছেন বিপ্লব করতে। পরবর্তীকালে তিনি কিউবার মতো কিছু করার জন্য কঙ্গো ও বলিভিয়াতে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি চেয়েছিলেন, দেশে দেশে ভিয়েতনামের মতো প্রতিরোধ যুদ্ধ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে। অবশ্য কঙ্গো ও বলিভিয়ায় তার বিপ্লব প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বিশেষ

www.pathagar.com

করে বলিভিয়ায় যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি প্রাণ দেন। কিন্তু প্রাণ দিয়েই হয়তো তিনি প্রমাণ করেছেন, বিপ্লবীর মৃত্যু নেই।

কিউবার নতুন সরকারে তিনি শিল্পমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং ওই সরকারের ভেতর তিনি ছিলেন অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্তু চে গুয়েভারা মানুষ হিসেবে ক্ষমতা, যশ, সম্পদ হাতের মুঠোয় পেয়েও এ সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তার মুক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং দুর্ভোগ, ঝুঁকি ও মৃত্যুকে অবলীলায় বেছে নিয়েছেন। একজন আদর্শবাদী বিপ্লবীর এটাই হয়তো ট্র্যাজেডি। শেষের দিকে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে তার বহু বিষয়ে মতান্তর হয়েছিল। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সুবিধাবাদী অবস্থানকে তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজতন্ত্রের নামে সেখানে যা চলছে তা হচ্ছে দলীয় স্বৈরাচার। অন্যদিকে প্রলেতারিয়েত শাসনের নামে সোভিয়েত ইউনিয়নও এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তি প্রতিষ্ঠা করার পাঁয়তারা করছে। চে'র এই বিশেষ অবস্থানের জন্য সোভিয়েত চাপে ক্যাস্ট্রো তার বহুদিনের সহযোদ্ধাকে শুধু সরকার থেকেই বিতাড়িত করেননি, একভাবে বলা যায় তিনি তাকে কিউবা থেকেও বিতাড়িত করেছিলেন। এভাবেই আজীবন রোম্যান্টিক ও আদর্শবাদী বিপ্লবী চে গুয়েভারা আদর্শের জায়গা থেকে তার সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে ক্যাস্ট্রোও নিজের ক্ষমতা মজবুত করার জন্য কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি, তা আদর্শের দিক দিয়ে এক ধরনের পদস্খলন সত্ত্বেও। এর পরের ইতিহাস সবার জানা। তিনি বলিভিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সেখানকার মার্কিনপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করতে গিয়ে ধরা পড়েন। সিআইএ'র এজেন্টরা তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং তার হাত দুটো কেটে প্যাকেট করে কিউবায় পাঠিয়ে দেয়। গেরিলা যুদ্ধের সময় চে কিউবা থেকে কোনো সাহায্য পাননি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাসে এভাবে চে হয়ে যান গ্রিক ট্র্যাজেডির এক হিরো।

চে'র মৃত্যুর এতদিন পর তার ছবি বুকে নিয়ে এখনও অনেক তরুণ ঘোরাঘুরি করে। ম্যারাডোনার মতো খেলোয়াড় তার বুকে চে'র উল্কি এঁকেছেন। চে'কে নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। কিউবার টাকায় তার ছবি শোভা পায়। কিউবার ছাত্ররা স্কুলের প্রারম্ভিক সমাবেশে গেয়ে ওঠে : সেরে মোস কমো এল চে– আমরা চে'র মতো হয়ে উঠব। কোনো সন্দেহ নেই, এর অনেক কিছুর মধ্যেই আছে চে'র ইমেজকে ব্যবহার করার অপরাজনীতি। যেসব বামপন্থী আদর্শের দিক দিয়ে আজ

www.pathagar.com

পদস্খলিত হয়ে গেছেন, তারাই চে'র ঘাড়ের ওপর বন্দুক রেখে শিকার করতে চান।

ইতিহাসের এই এক অদ্ভুত রহস্যময় আর্তি। চে'র নিখাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় কোনো সংশয় ছিল না এবং তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের তাৎপর্যও আজ ফুরিয়ে যায়নি। কেননা সাম্রাজ্যবাদ তাবৎদুনিয়াজুড়ে আজও তার দুস্কৃতি ও লুণ্ঠন কার্য অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের সর্বত্র তাদের রাইফেল, ট্যাঙ্ক, মর্টার, কামান, যুদ্ধজাহাজ, বোমারু বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে তাক করে আছে এক মার্কিন বিশ্বব্যবস্থা কায়েম করার জন্য।

আজ যদি চে বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি কী করতেন? ধারণা করি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি আরেকটি ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতেন। এটি ঘটনার একটি দৃশ্য। আর একটি দৃশ্যে তিনি দেখতে পেতেন, যে আদর্শকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মানবমুক্তির জন্য লড়াই করতে চেয়েছিলেন, সেই কমিউনিজমের পতন হয়েছে। মার্কসবাদ তার অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির জন্য মানুষের আরাধ্য মুক্তি ও স্বাধীনতা আনতে দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিহাস কমিউনিস্টদের বিপক্ষে রায় দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শুধু পতনই হয়নি, সেটি এখন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। যে পতনের লক্ষণ চে তার জীবদ্দশায় দেখতে পেয়েছিলেন। চে'র আইডল ছিলেন মাও সেতুং। সেই মাওয়ের চীনেও এখন বড় রকমের পালাবদল ঘটে গেছে। বাজার অর্থনীতির নামে চীন যা শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছে, তা এক ধরনের পুঁজিবাদই। অতএব পুঁজিবাদের মর্মবস্তু গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীন লড়বে, এ চিন্তা আজ রীতিমত হাস্যকর হয়ে উঠেছে। এ কারণেই দেখি বিশ্বজুড়ে আমেরিকা দাপিয়ে বেড়ালেও চীনের ভূমিকা নিরুত্তাপ ও নিস্পৃহ। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকাকেন্দ্রিক বিশ্বে যে দু'একটি দেশ কোনো কোনো দিক দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা ধরে, চীন তার একটি। কিন্তু মার্কসবাদ থেকে চীনের পশ্চাদপসরণই বলে দেয়, বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামগুলোতে চীনের ভূমিকা আর আগের মতো নেই; তেমনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় তার মুখেও কোনো রা নেই। এ কারণেই চে'কে এখন চীনে 'বামপন্থী হঠকারী' বলা হয়। হায় চে গুয়েভারা!

বিশ্ব কমিউনিজমের এই হাল-হকিকতের পাশাপাশি বাংলাদেশের কমিউনিজম নিয়ে দু'একটি কথা এই সূত্রে বলা যেতে পারে। ষাট ও সত্তর দশকে দেশে দেশে

www.pathagar.com

কমিউনিস্টরা অনেক ধরনের বিপ্লবী ঘটনা ঘটিয়েছে। এরকম ঘটনা এ অঞ্চলে তেমন ঘটেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম চারু মজুমদার। হয়তো চে গুয়েভারার বিপ্লবী প্রত্যয় তিনি কিছুটা আত্মস্থ করেছিলেন। এর কারণ হচ্ছে, এদেশে যারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তারা ছিলেন প্রায় সবাই সন্ত্রাসবাদী। যুগান্তর, অনুশীলন অথবা সূর্যসেনের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ থেকেই তারা ১৯৩০ ও ৪০-এর দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল ব্রিটিশবিরোধী, একই সঙ্গে মুসলিম-বিদ্বেষী। ওই আন্দোলন যে মানসিক কাঠামো সৃষ্টি করেছিল এবং যে চিন্তা ও অভ্যাস গঠন করেছিল, তার থেকে মুক্ত হয়ে আসা সহজ ব্যাপার ছিল না। মুসলিম বিদ্বেষের কারণে কমিউনিস্ট আন্দোলন পূর্ববঙ্গে ব্যাপক সাড়া জাগাতে পারেনি। এমনি প্রেক্ষাপটে কমিউনিজম এদেশে কিছু মানুষকে ভারতমুখী করে তুলেছিল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী করে তুলতে পারেনি। কারণ সাংস্কৃতিক রুচির অভিন্নতার কারণে এখানকার কমিউনিস্টরা কলকাতার বাবু কালচারকে আদর্শস্থানীয় মনে করেছেন। কিন্তু কোনো প্রলেতারিয়েত কালচারের বিকাশ ঘটাতে পারেননি। ভারতীয় পুঁজিও যে এ অঞ্চলের মানুষের জন্য বড় রকমের আগ্রাসন হতে পারে, এই চেতনা এখানকার কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকদের মাথায় খেলেনি।

এই আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর নেতৃ পর্যায়ে যারা ছিলেন বা এখনও আছেন তাদের অধিকাংশই বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ও মধ্য শ্রেণী থেকে এসেছেন। প্রলেতারিয়েত শ্রেণী থেকে এসেছেন এমন নেতাকর্মীর সংখ্যা নগণ্য। ফলে এদের পক্ষে চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে বুর্জোয়া প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করা ছিল আদতেই কঠিন। এই কারণেই দেখি ষাট ও সত্তরের দশকে এদেশে যারা বিপ্লবী শ্লোগান দিয়েছেন, রেড বুক বুকে নিয়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন কিংবা ভিয়েতনামের মতো কিছু করে দেখাতে চেয়েছেন, তারা নানা রকমের শ্রেণী স্বার্থে আজ বড় বড় বুর্জোয়া দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন বা বুর্জোয়া দলের ভেতরে গিয়ে অনায়াসে কাজ করেছেন কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরেই বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য আমদানি করেছেন। এভাবে কমিউনিজমকে তারা এক রকম খোদা হাফেজ জানিয়ে দিয়েছেন। এরকম সন্ত্রাসবাদী ঝোঁক ও বুর্জোয়া কালচারের অনায়াস আত্মস্থকরণের ফলে এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন কখনও প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়নি।

www.pathagar.com

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর যখন পশ্চিমা বিশ্ব সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব কার্যকরী করতে শুরু করল, তখন আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ দিশেহারা এই মার্কসবাদীদের খুঁজে নিতে ও ব্যবহার করতে শুরু করল। কমিউনিজমের পতনের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদ ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু করেছে, সেখানে মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ এই কমিউনিস্টদের তারা সহজেই নিজেদের হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদের এই অন্যায় যুদ্ধে ইসলামকে প্রতিহত করার কাজে দু'একজন বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া এই কমিউনিস্টরা সবাই আজ সাম্রাজ্যবাদের শ্রেফ দাসানুদাসে পরিণত হয়েছেন। যারা এক সময় সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন, তাদেরকেই আজ সাম্রাজ্যবাদ বশীভূত করে ফেলেছে। তারাই এখন সবচেয়ে বড় প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল।

চে'র মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের এক কবি লিখেছিলেনঃ

বলিভিয়ার জঙ্গলে নীল প্যান্টালুন পরা
তোমার ছিন্নভিন্ন শরীর,
তোমার খোলাবুকের মধ্যখান দিয়ে
নেমে গেছে শুকনো রক্তের রেখা
চোখ দুটি চেয়ে আছে,
সেই দৃষ্টি এক গোলার্ধ থেকে ছুটে আসে অন্য গোলার্ধে।
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়।

জানি না আমাদের এখানকার মার্কসবাদীরা কমিউনিজমের পতন ও নিজেদের সর্বাত্মক পদস্খলনের পরও কোনো অপরাধবোধে দগ্ধীভূত হন কিনা। আজ চে'র মৃত্যুর এতদিন পরেও তিনি প্রাসঙ্গিকতা হারাননি। কমিউনিজম হয়তো প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কিন্তু চে'র দুরন্ত আত্মত্যাগ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা ও আন্তর্জাতিকতার আবেদনকে ছোট করে দেখা সম্ভব নয়। মার্কিন সভ্যতাকে তিনি 'বর্বর সভ্যতার' নিদর্শন মনে করতেন। তথাকথিত মার্কিনি গণতন্ত্র তার কাছে ছিল আমেরিকা মহাদেশের জেল সুপার (কারারক্ষী) নির্বাচন। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে পরদেশ ও পররাজ্য লুণ্ঠনের নীতিতে কোনো তফাৎ নেই। চে গুয়েভারার এই মার্কিন শোষণের বিরোধিতা আজও

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার অত্যুজ্জ্বল নীতিগত নিদর্শন। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এবং তাদের লাতিন আমেরিকান তাঁবেদাররা হয়তো তাকে হত্যা করতে পেরেছে। কিন্তু মানুষের মুক্তিসংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, যার অপর নাম চে গুয়েভারা তাকে হত্যা করতে পারেনি। চে বার বার ফিরে আসবেন। যেমন করে আমাদের এখানে ফিরে আসেন তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহরা। আজকে সাম্রাজ্যবাদের ভর কেন্দ্র হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য। আফগানিস্তান থেকে ইরাক হয়ে ফিলিস্তিন, এই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে চলছে এক রক্তাক্ত জনযুদ্ধ। চে যদি জীবিত থাকতেন তবে বলিভিয়ার জঙ্গল ছেড়ে এই ভরকেন্দ্রে এসে যে উপস্থিত হতেন না তা কে বলবে। অন্তত যে মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিপ্লবের লড়াইয়ে কোনো দেশের সীমানা নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী এই বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে চে কি সর্বহারার সেই আন্তর্জাতিকতাকে শক্তিশালী করার কথা ভাবতেন? অন্ত ত আজ যেখানে মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই চলছে ইসলামী আদর্শ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পাটাতনে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, কমিউনিজমের বিপর্যয়ের পর ইসলাম আজ এক সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী আদর্শ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা যেমন সাম্রাজ্যবাদকে বড় ঝাঁকুনি দিতে পেরেছিল, আজ ইসলামও সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় নতুন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। চে কিভাবে এই নতুন পরিস্থিতিকে মূল্যায়ন করতেন জানি না, তবে ইতিহাসের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যার মধ্যে আটকে থেকে আজকের পরিস্থিতিকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

কমিউনিস্টদের একটা প্রত্যয় হচ্ছে, ধর্ম নিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা চলে না। তাহলে লাতিন আমেরিকার লিবারেশন থিওলজিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা কিভাবে হাতে হাত ধরে একসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে অথবা আমাদের এখানে তিতুমীর-শরীয়তুল্লাহরা সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। ইতিহাসের এই পৃষ্ঠাগুলো আবারও একটু উল্টে-পাল্টে দেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

উইকিলিকসের নথি, সাম্রাজ্যবাদ ও আজকের মুসলিম উম্মাহ্

১.

মুসলিম উম্মাহ্ শব্দটা শুনে এখনও আমরা অনেকে রোমাঞ্চিত হই। বিশ্বব্যাপি ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীদের বিস্তার, জনসংখ্যা ও নৈতিক শক্তি প্রভৃতির আয়োজন দেখে আমরাও অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠি। বিশেষ করে কমিউনিজমের পতনের পর পাশ্চাত্যের যুদ্ধ কৌশল মুসলিম বিশ্বকে নতুন এক পরিস্থিতির মুখে এনে ফেলেছে। অর্থাৎ ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানে আর এক গরম হাওয়ার যুগে আমরা প্রবেশ করেছি। এই নতুন পরিমণ্ডলে ইসলাম পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে নতুন এক বোঝাপড়ার হয়তো প্রস্তুতি নিচ্ছে; কিন্তু এই নতুন ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রস্তুতির লগ্নে স্বাভাবিক প্রশ্ন হচ্ছে এমন অপরিমিত শক্তির অধিকার কি মুসলিম বিশ্ব আদৌ অর্জন করেছে? জনসংখ্যা, ধর্মবিশ্বাস বিস্তারের কাঠামো, সাংস্কৃতিক শক্তি এসব না হয় বোঝা গেল; কিন্তু অন্য যেসব অপরিহার্য শক্তির প্রয়োজন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, প্রায়ুক্তিক শক্তি– এসব কি আদৌ আছে? মুসলিম উম্মাহ্ শব্দটির সঙ্গে আমাদের আবেগ যতখানি জড়িত, বোধ হয় এর বাস্তব ভিত্তি ততখানি দুর্বল।

উইকিলিকসের হাজার হাজার নথি দেখিয়ে দিয়েছে মুসলিম বিশ্বের শাসক যারা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী রকম খারাপ। তাদের কথাবার্তা কতখানি নীচ। উইকিলিকসের নথি এখন প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট, এসব শাসক কতখানি অযোগ্য, অদক্ষ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও ভোগলিপ্সু। বছরের পর বছর ধরে এসব শাসক মুসলিম বিশ্বের ওপর জগদ্দল পাথর হয়ে বসে আছেন। ক্ষমতা করায়ত্ত রাখার জন্য এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যা তারা করতে পারেন না। চক্রান্ত, মিথ্যাচার, মানুষ হত্যা, সাম্রাজ্যবাদের পোঁ ধরা কোনো কিছুই এদের বিবেককে এতটুকু জাগ্রত করে না। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহ শব্দটি অনেকখানি বায়বীয়, অধরাই রয়ে যায়। উইকিলিকসের নথি আমাদের সামনে দুটো দিক খুলে দিয়েছে। একটি হচ্ছে, এসব নথি মুসলিম বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আমাদের সাহায্য করে। অন্যটি হচ্ছে, এসব তথ্য প্রকাশের ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোপন কুশ্রী চেহারা দুনিয়ার তাবত মানুষের সামনে উদোম হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

২.

উইকিলিকস পুরো দুনিয়া নাড়িয়ে দিয়েছে বলা যায়। কারণ দেশে দেশে শাসন, শোষণ, লুণ্ঠন অব্যাহত রাখতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে কত ভয়ঙ্কর ও পৈশাচিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে, ফাঁস হওয়া আমেরিকার ডিপ্লোম্যাটিক ডকুমেন্টগুলো তার দিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আর এ কাজ করতে গিয়ে মার্কিনিরা দেশে দেশে তাদের দূতাবাসগুলোকে রীতিমত গোয়েন্দাগিরির দফতর বানিয়ে ফেলেছে। আজকের একমেরু বিশ্বে 'আঙ্কেল শ্যাম' কোনো রকমের আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করেন না বলেই মনে হয়। এখন রেগে-মেগে শ্যাম চাচা উইকি বস জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে বিচারের আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছেন। জুলিয়ানের অপরাধ হচ্ছে, তিনি কেন এসব তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। আমেরিকার প্রবল প্রতাপান্বিত মিডিয়া ঝড় তুলেছে, জুলিয়ানের কেন এখনও ফাঁসি দেয়া হচ্ছে না। একটা পত্রিকার দম্ভোক্তি দেখুন : Why isn't Julian Assange dead yet? তথ্য প্রকাশ করা যদি অপরাধ হয় তাহলে দেশে দেশে নাশকতা, ষড়যন্ত্র, ইচ্ছামত ক্ষমতার পালাবদল, অস্ত্র ব্যবসা, প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন এবং সামরিক আগ্রাসন কি ভয়ানক অপরাধের মধ্যে পড়ে না? যে দেশটি নাকি দেশে দেশে তথ্য আর গণতন্ত্রের স্বাধীনতা ফেরি করতে ব্যস্ত, বাক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার শ্লোগান দিতে দিতে রীতিমত প্রাণান্ত সে-ই কিনা উইকিলিকসের ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী! কথায় বলে, সত্যের ঢোল আপনি বাজে। আমেরিকার দুষ্কর্মের কথা প্রকাশ করে দিয়ে উইকিলিকস বস নতুন কিছু বলেননি। যা করেছেন, সত্যকে তিনি নতুন করে মানুষের সামনে হাজির করেছেন। এতেই আমেরিকার গোস্‌সা। 'ফ্রিডম' ও 'ডেমোক্রেসির' একালের নিশানবরদার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সত্য প্রকাশে এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছে যে তারা এখন সামন্তবাদী শাসকের মতো আচরণ করতেও দ্বিধা করছে না। উইকিলিকস বসের এই সাহসী ভূমিকায় উজ্জীবিত হয়ে অনেকেই তাকে বিপ্লবী চে গুয়েভারার সঙ্গে তুলনা করছেন। জুলিয়ানের পরিণতি চে গুয়েভারার মতো হবে কি-না তা এখনও বলা না গেলেও তিনি যে কাজটি করেছেন তা সাম্রাজ্যবাদী দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভ্যুত্থানই বটে। চে'র একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে উইকিলিকস বসকে অভিনন্দন জানাই : Against brute force and injustice, the people will have the last word, that of 'victory'.

www.pathagar.com

যাই হোক, ওসব গোপন নথিপত্র প্রকাশের ফলে আমেরিকার ডিপ্লোম্যাটিক কারসাজি সাধারণ মানুষের কাছে চলে এসেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এর দায় স্বীকার করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। হিলারির ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর যুদ্ধবিমান থেকে ওরা আফগান ক্ষুধার্ত শিশুদের জন্য রুটি ফেলতে শুরু করে। একদিকে রুটি আর একদিকে বোমা। রুটি কুড়াতে এসে ক্ষুধার্ত শিশুরা বোমার আঘাতে মারা যায়। সেই শিশুদের মৃত্যুতে মার্কিনিরা ক্ষমা চায়। ওদের পলিসি মেকাররা কিন্তু বলে, ওটা নাকি Collateral Damage— আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি! হিলারির ক্ষমা প্রার্থনায় বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। এই প্রতারক, মিথ্যুক, মোনাফেক সভ্যতার কর্তাব্যক্তিদের ক্ষমা প্রার্থনার তলায় আছে অন্য রকমের অভিসন্ধি। ক্ষমা প্রার্থনাও ওদের ডিপ্লোম্যাটিক কারসাজির অংশ। এরা সবকিছুই করতে পারে। এদের কাছে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কানাকড়িও মূল্য নেই।

৩.

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম শাসকদের কাছে এখনকার সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ইরান, ইসরাইল নয়। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের শাসকরা তখন কিছুটা হইচই করেন। কয়েকবার ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল জেরুজালেম দখল করলে ওআইসি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট তৈরি হয় এবং বেশ কিছুদিন ধরে ওআইসির উদ্যোগে সদস্য দেশগুলোতে 'আল কুদস দিবস' ঘটা করে উদ্‌যাপন করার চেষ্টাও হয়। কিন্তু এখন বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে, ইসরাইলের সঙ্গে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রই কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। অনেক রাষ্ট্র গোপনে ইসরাইলের সঙ্গে একটা স্থিতি অবস্থাও মেনে নিয়েছে। ওআইসির প্রতিষ্ঠালগ্নে আমরা যে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা শুনেছিলাম, তা অনেকটাই এখন ফিকে হয়ে গেছে। পুরো মধ্যপ্রাচ্যে একদিকে ইসরাইলকে এখন প্রতিহত করার যেমন কেউ নেই, তেমনি তার অন্যায় কার্যকলাপের বিরোধিতা করার সাহসটুকুও মধ্যপ্রাচ্যের শাসকরা হারিয়ে ফেলেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ইরান এবং ফিলিস্তিনের হামাস ও হিজবুল্লাহর মতো দল। এ কারণেই আজকের একমেবু বিশ্বের অধীশ্বর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পৃষ্ঠপোষিত ইসরাইল

www.pathagar.com

রাষ্ট্রটির ইরানের ওপর এত গোস্বা। এখানে একটা জিনিস বোঝা দরকার, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরান বিরোধিতার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম শাসকদের ইরান বিরোধিতার ভেতর মৌলিক কোনো তফাত নেই। মূলত মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হচ্ছে এটির ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন। মধ্যপ্রাচ্যের কথিত মুসলিম শাসকদের লক্ষ্য হচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই সম্পদ লুণ্ঠনে সর্বোতভাবে সহায়তা করা এবং এই সহায়তার বিনিময়ে নিজেদের অবৈধ অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষে মার্কিন সমর্থন আদায়। যে রাষ্ট্রটি নাকি পৃথিবীজুড়ে ফ্রিডম ও ডেমোক্রেসি রপ্তানির জন্য এত ব্যাকুল, তারাই মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরাচারী শাসককুল সম্পর্কে আশ্চর্যভাবে নীরব। সাম্রাজ্যবাদী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইরান উচ্চকণ্ঠ বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মধ্যপ্রাচ্যের অনুগত মুরুব্বীরা ইরানকে একহাত নেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের শাসককুল এখন আমেরিকার কাছে জোরালো আবদার করেছেন ইরানকে দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। উইকিলিকসের নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, হারামাইন শরীফের খাদেম বলে পরিচিত সৌদি বাদশাহসহ উপসাগরীয় শাসককুল ইরানের ওপর হামলা চালাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বার বার তাগাদা দিচ্ছেন। শুধু মধ্যপ্রাচ্যের রাজা-বাদশাহ-শেখরাই নন, সেখানকার মেঝ-সেজ নেতারাও কম যান না। মার্কিন জেনারেল জন আবিজিয়াদের কাছে আরব আমিরাতের মিলিটারি কমান্ডাররা ইরানের প্রেসিডেন্টকে Aggressive ও Crazy বলেছেন। আবুধাবির যুবরাজ বিন জায়েদ আমেরিকার কাছে দাবি জানিয়েছেন : Take action against Iran within a year at most. মার্কিন জেনারেল মাইক মোসলিকে বিন জায়েদ বলেছেন, ইরানকে কখনোই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে দেয়া যায় না। এই লোকটি (মাহমুদ আহমাদিনেজাদ) আমাদের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

বাহরাইনের বাদশাহ হামিদ বিন ইসাও এদের দলে যোগ দিয়েছেন। তিনি আমেরিকানদের বলেছেন, The danger of letting it go on is greater than the danger of stopping it.

আজ মধ্যপ্রাচ্যের রাজা-বাদশাহ ও শেখরা সবাই মিলে ইরানকে আক্রমণ করার জন্য আমেরিকাকে প্ররোচিত করছেন। প্রেসিডেন্ট বুশ তার স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ Decision Points এ লিখেছেন, ইরাক

www.pathagar.com

আক্রমণের সময়ও আরব নেতারা তাকে একইভাবে প্ররোচিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর ওয়াশিংটনের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে এবং সাদ্দাম হোসেনকে দিয়ে ইরানে আক্রমণ চালায়। মধ্যপ্রাচ্যের শেখরা তখন টাকা-পয়সা দিয়ে ইরাককে এই যুদ্ধে সর্বোতভাবে সাহায্য করেন। কারণ তারা ভয় পেয়েছিলেন, ইসলামী বিপ্লবের ঢেউ যদি আরব জগতে ছড়িয়ে পড়ে তবে তাদের সামন্তবাদী মরুভূমি সমাজের শাসন ব্যবস্থা টিকবে না। তাই ওয়াশিংটন ও তেল কোম্পানির সেবাদাসরা বিপ্লব ঠেকানোর জন্য সাদ্দাম হোসেনকে ইরানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

ইঙ্গ-মার্কিন মদতপুষ্ট মধ্যপ্রাচ্যের এই ভোগবাদী শেখতন্ত্রগুলো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় শিখণ্ডি । এরা নিজেদের দেশে গণতন্ত্রের প্রাথমিক ধারণাটুকুও কাজ করতে দেয় না। এরা একটি মনোনীত পরামর্শদাতা সভার মাধ্যমে গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা রক্ষা করে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ইরানেই গণতন্ত্রের ছক মেনে পরপর সরকার পরিবর্তন হয়। বাকি দেশগুলোতে নেতাদের মৃত্যু পর্যন্ত জনগণকে অপেক্ষা করতে হয়। ওখানকার জনগণ যে এই মার্কিন পোঁ ধরা নীতি পছন্দ করে এমন নয়; কিন্তু অধিকাংশ দেশে জনরোষের আগুন থেকে বাঁচতে শাসকরা পশ্চিমী প্রভুদের সবুজ সঙ্কেত পেয়েই নানা দমন-পীড়ন চালায়। মধ্যপ্রাচ্যের আজকের ভূগোল তৈরি হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুর্কি-অটোমান খলিফাদের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে। অটোমানদের সেই বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙতে তখনকার সুপার পাওয়ার বৃটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন আজকের মধ্যপ্রাচ্যের রাজা-বাদশাহ-শেখদের পূর্বপুরুষরা।

আজকে আমরা মুসলিম ঐক্য ও সংহতির কথা বলতে বুক তড়পাই। কিন্তু শ্রবণ সুখকর না হলেও এটাই সত্য, এই আরব শাসকরাই সেদিন মুসলিম ঐক্যের দড়িটা কেটে দিয়েছিলেন। সেদিনের আরব শাসকদের ভূমিকার সঙ্গে আমাদের এখানকার মীর জাফর-মীর সাদিকদের ভূমিকার কোনো তফাত নেই।

মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে আজ রক্তগঙ্গা বইছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পেটোয়া ইসরাইল রাষ্ট্রটি পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে তাদের মৃগয়া ক্ষেত্র বানিয়ে ছেড়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আমরা অহর্নিশ গালি দেই। এই গালি অবশ্যই তাদের প্রাপ্য; কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের যেসব মেরুদণ্ডহীন

www.pathagar.com

আত্মপূজারি শাসক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হয়ে কাজ করছেন, তারাও সমানভাবে অপরাধী। এসব শাসকের সাহস, প্রজ্ঞা, ধর্মের প্রতি আস্থা কোনোটিই নেই। এরা নিজেদের হারামাইন শরীফের খাদেম বলে পরিচয় দেন। প্রকৃতপক্ষে এরা হচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদের খাদেম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মুসলিম বিশ্ব এদের হাতেই জিম্মি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে সাম্রাজ্যবাদের এসব স্থানীয় মুৎসুদ্দীর বিরুদ্ধেও লড়াই সমানভাবে জরুরি।

৪.

উইকিলিকস বাংলাদেশকে নিয়েও বোমা ফাটিয়েছে। উইকিলিকসের তথ্য এখন স্পষ্ট করে দিয়েছে, কমিউনিজমের পতনের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আড়ালে যে ইসলামবিরোধী লড়াই চালাচ্ছে তার রণক্ষেত্র এখন ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ঘুরে বাংলাদেশেও প্রসারিত হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, এ মুহূর্তে আমরা সাম্রাজ্যবাদী হানাদারির শিকার হয়েছি। এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্ক্রমণ আমাদের জন্য এখন ভয়ানক বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। উইকিলিকসের ফাঁস করা তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাসবিরোধী কৌশলের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম পরিবর্তনে একত্রে কাজ করছে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

সন্ত্রাসবিরোধী কৌশলের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্পর্ক কী! ভাবটা এমন, মাদ্রাসা শিক্ষিতরাই শুধু সন্ত্রাস করে! আধুনিক শিক্ষিতরা কেবলই সুশীল! তারা বোমা ছুড়ে না, সন্ত্রাস করতে জানে না!

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের কথা বলা হচ্ছে। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষা নাকি আমাদের পিছু টেনে ধরেছে। আমাদের চিন্তা-চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তো ভালো কথা; কিন্তু আধুনিক শিক্ষা আমাদের দিচ্ছেটা কী! ওটা তো ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার নামান্তর। আমাদের চিন্তার জগতে ঔপনিবেশিক শাসন ও গোলামির সম্পর্কই ওটা দীর্ঘস্থায়ী করে।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের এক প্রভাবশালী নেতা বলেছিলেন, মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের প্রজনন ক্ষেত্র। বাংলাদেশের এই নেতার ভাষ্যের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একালের সন্ত্রাসবিরোধী ভূমিকার কোনো তফাত নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ২০১০-এর

www.pathagar.com

ইসলামবিরোধী শিক্ষানীতির সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সন্ত্রাসবিরোধী ভূমিকা একাকার হয়ে গেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা কোনো ভুঁইফোড় বিষয় নয়। ৮০০ বছর ধরে এ ব্যবস্থা আমাদের দেশে টিকে আছে। জনগণের সমর্থন ও ভালোবাসা ছাড়া এ ব্যবস্থা এতদিন টিকে থাকতে পারত না। তাহলে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিশানা করেছে কেন? কারণ একটাই। এই শিক্ষাব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতি, যার আর এক নাম আধুনিকতা, তাকে লালন করে না। এই শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর দিয়ে 'ইসলামী মন' তৈরি হয়, 'পশ্চিমা বা ধর্মনিরপেক্ষ মন' তৈরি হয় না। সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছে, এই ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারি করবে না। সাম্রাজ্যবাদ তাঁবেদার তৈরি করতে চায়। স্বাধীন মানুষ তৈরি করতে চায় না।

এ কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মর্মবস্তু ইসলামী চেতনা ও ইসলামী প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো সাম্রাজ্যবাদ এবং তার এদেশীয় দালাল ও মুৎসুদ্দীদের অবশ্যকর্তব্য হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে ইসলামবিরোধী প্রচারণা চালানো ও ইসলামপ্রধান দেশগুলোর জনগণকে ইসলামের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করা সাম্রাজ্যবাদের এ মুহূর্তের মিশন হয়ে উঠেছে।

উইকিলিকস আরও কয়েকটি জরুরি তথ্য দিয়েছে। যেমন ভারতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা ও মাখামাখি। বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি এক তারবার্তায় উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা। এ দেশে আওয়ামী লীগ বরাবরই ভারতের তাঁবেদার দল হিসেবে পরিচিত। উইকিলিকসের নথি তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণ করেছে মাত্র।

এটা পরিষ্কার, ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এজেন্ডার সঙ্গে আওয়ামী লীগের মৌলিক কোনো তফাত নেই। আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিল মুসলিম লীগ ভেঙে। মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে সেই কালেই আওয়ামী লীগ নেতারা মুসলিম জাতীয়তাবাদ পরিত্যাগ করেছেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণা অস্বীকার করেছেন। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে চিন্তা করলে কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদ খুব কাছাকাছি জিনিস। স্বাভাবিকভাবে ভারত এখন চাইছে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে এ দেশে তার খবরদারি প্রতিষ্ঠা করতে।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলে এ দেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক শক্তিকে দমন করাই তার লক্ষ্য। আর এভাবেই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের এজেন্ডা একাকার হয়ে গেছে।

উইকিলিকসের আরেকটি তথ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের ডেথ স্কোয়াড হিসেবে পরিচিত র‍্যাবের প্রশিক্ষণ দিয়েছে যুক্তরাজ্য। এটা তো সাম্রাজ্যবাদের পুরনো খাসলত। এরাই সবচেয়ে মানবাধিকারের কথা বলে, আবার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তারাই সবচেয়ে বেশি। ইরাক, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এরাই নাকি সবচেয়ে বড় সৈনিক।

উইকিলিকসের এতসব তথ্যের পরে বাংলাদেশের মানুষকে নতুন করে সাম্রাজ্যবাদকে চিনিয়ে দেয়ার দরকার নেই। যে দেশে নাকি তিতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন, সে দেশে আরেকটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই জরুরি হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। ১/১১-এর ঘটনা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের ভেতরে আমরা কিভাবে ঢুকে পড়েছি। সেই প্রকল্পের আওতায় সাম্রাজ্যবাদ এখন চাইছে আমাদের 'সভ্য' ও 'প্রগতিশীল' বানিয়ে দিতে। এই 'সভ্যকরণ' অভিযানের একটা অংশ হচ্ছে মাদ্রাসার কারিকুলাম পরিবর্তন করে দেয়া। কারণ মাদ্রাসার তালেব এলেমরাই সাম্রাজ্যবাদের এই 'সভ্যকরণ' প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক। এই 'সভ্যকরণ' প্রক্রিয়াকে আজ যারাই চ্যালেঞ্জ করছে তাদেরই সাম্রাজ্যবাদ সন্ত্রাসী আখ্যা দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ এখন জোরেশোরে বলছে, ইসলামী আদর্শের লোকেরাই হচ্ছে জঙ্গিবাদের সমর্থক। সুতরাং সভ্যতা রক্ষার জন্য এদের বিরুদ্ধে লড়াই জরুরি।

সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধনীতির পক্ষে আমাদের দেশেও লোকের অভাব নেই। সাম্রাজ্যবাদী গণমাধ্যমগুলো যাদের শত্রু গণ্য করে দানবে পরিণত করে, একই কায়দায়, একই মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাদের শত্রু গণ্য করার পক্ষে এ দেশে বিস্তর লোক আছে। আমাদের সমাজে যারা নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করেন, তাদের প্রগতির প্রকল্প সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পেরই সমার্থক মাত্র। কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারাও ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা করেন। সুতরাং এই 'প্রগতিশীলতার' বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ না করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই এ দেশে নিছকই প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলাম ও সভ্যতার সংঘাত

১.

ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমা সভ্যতার সংঘাত নতুন কোনো ঘটনা নয়। সেই সংঘাতের ইতিহাসও বহু পুরনো। ক্রুসেড ও ঔপনিবেশিকতার স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন আশঙ্কা করেছিলেন, চার্লস মারটেল মুসলমানদের অভিযান ঠেকাতে না পারলে অক্সফোর্ডে এখন কোরআন পড়ানো হতো।

ইতিহাসে এই সংঘাতের পাশে সম্প্রীতিরও একটা ছবি আমরা দেখি। স্পেনের ভেতর দিয়ে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে ঢুকে সেখানে রেনেসাঁর জন্ম দিচ্ছে। খলিফা হারুন-অল-রশীদ রাজা শার্লিমেনের সঙ্গে উপঢৌকন বিনিময় করছেন। সম্প্রীতির এই জমিনটা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা একেবারে ফেলনা নয়। আজকের বিবদমান বিশ্বে সেটাই আমাদের ভরসার জায়গা।

যদিও ইতিহাসে সংঘাতের কথাটাই বেশি করে উচ্চারিত হয়, বিশেষ করে কমিউনিজমের পতনের পর সাম্প্রতিককালে ইসলাম ও ইসলামী মৌলবাদকে নতুন হুমকি হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এ প্রবণতা ও মেরুকরণ পশ্চিমা মিডিয়া, নীতিনির্ধারক ও পণ্ডিতকুলের কল্যাণে দিনে দিনে স্ফীত হয়ে উঠছে এবং তাদের কথায় প্রতীয়মান হচ্ছে ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতা বুঝি এখনই মুখোমুখি সংঘর্ষে উপনীত হয়েছে। ইসলামকে এখন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জনবিন্যাসগত হুমকি হিসেবেও বিবেচনা করা হচ্ছে। এই হুমকি ও বিরোধকেই বলা হচ্ছে সভ্যতার সংঘাত। ইসলামকে হুমকি হিসেবে দেখার পাশ্চাত্যের এই প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র ও সরকার জনপ্রিয় ইসলামী আন্দোলনগুলোকে দমন করার জন্য ইসলামী মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ধুয়া তুলেছে। তারা দেশে ও বিদেশে সমস্বরে ইসলামী মৌলবাদের এক কাল্পনিক ভীতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। যেমন করে এক সময় স্বৈরাচারী ব্যবস্থার পক্ষে পশ্চিমা সমর্থনের আশায় কমিউনিজম বিরোধিতাকে যুৎসইভাবে ব্যবহার করা হতো। ওই একই যুক্তিতে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী দলগুলোকে

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ করা, তাদের কর্মীদের জেলে পুরা ও নির্বিচার মানবাধিকার লঙ্ঘনকেও সিদ্ধ করা হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো, বসনিয়া ও কসোভোতে সার্বিয়রা, চেচনিয়ায় রুশীয়রা এবং দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলনগুলোকে বিদ্যমান কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার হোতারা ইসলামী মৌলবাদের জুজু দেখিয়ে দমন করার চেষ্টা করছে। পশ্চিমের সরকার ও মিডিয়া ইসলামকে এখন যাবতীয় সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উগ্রতার সঙ্গে সমার্থক করে ফেলেছে। ইসলামের চরিত্র হনন ও খণ্ডিত বিশ্লেষণ এখন পশ্চিমা মিডিয়ার প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠেছে। এসব মিডিয়ার কয়েকটি শিরোনাম লক্ষ্য করা যাক :

1. A Holy War Heads our Way
2. Focus : Islamic Terror : Global Suicide Squad
3. American Jihad
4. Prince Charles is wrong : Islam Does Menace the West
5. Islam Under Siege
6. The New Dawn for Islam : The Global Campaign against Secular State.

এই শিরোনামগুলো নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যপ্রনোদিত। এখানে ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীকেই কেবল আজকের দিনের সংঘাত ও যুদ্ধাবস্থার প্ররোচক শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীর কাজকর্মকে সব রকমের আক্রমণ, যুদ্ধ ও জিহাদের জন্য দায়ী করা হয়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য যা করছে তা নেহাতই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। শুধু আগ্রাসন ঠেকানোর জন্য তারা যুদ্ধে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

ভাবটা পাশ্চাত্য এমন সুশীল, রক্তপাত ঘটায় না, যুদ্ধ চায় না আর যত সংঘাত, হানাদারি ইসলামের রক্তমজ্জার সঙ্গে মিশে আছে। সুতরাং ইসলামকে বিনাশ করা ছাড়া দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে না।

সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব কিন্তু ইসলাম জগতে উদ্ভব হয়নি। কমিউনিজমের পতনের পর এই তত্ত্ব সারা দুনিয়া ফেরি করে বেড়িয়েছে পাশ্চাত্য জগত। কেন? কমিউনিজমের পর পাশ্চাত্য তার দুনিয়াজুড়ে হানাদারি ও আধিপত্য

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে ইসলামকেই ধরে নিয়েছে। তাই ইসলামের সঙ্গে একটা সংঘাত পাশ্চাত্যের জন্য এখন জরুরি হয়ে উঠেছে।

২.

সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বের উদ্ভাবক হচ্ছেন দুজন সাম্প্রদায়িক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী। এদের জাতিদ্বেষ ও সাংস্কৃতিক বৈরিতার চিন্তা-ভাবনা এরই মধ্যে বিশ্বজুড়ে প্রবল সমালোচিত হয়েছে। এদের দুটো লেখা আজকের সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বকে ঘিরে যাবতীয় বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এবং একাধারে কূটনীতিক, নীতিনির্ধারক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একটি হচ্ছে বার্নাড লুইসের 'দ্য রুটস অব মুসলিম রেজ', অন্যটি স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের 'দ্য ক্লাশ অফ সিভিলাইজেশন'। বার্নাড লুইস প্রথমে 'ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম' শীর্ষক যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জেফারসন লেকচার দেন ১৯৯০ সালে। জেফারসন লেকচার হচ্ছে একজন বুদ্ধিজীবীকে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় সম্মাননা। এই লেকচারটি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে বিখ্যাত আটলান্টিক মানথলিতে রুটস অব মুসলিম রেজ নামে প্রকাশিত হয়। লুইসের এই প্রবন্ধটিতে ইসলামকে খণ্ডিত ও বিদ্বেষপ্রসূতভাবে দেখানো হয়েছে। এটি ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পাঠকের সামনে একটা ভুল তথ্য দিয়েছে ও মিথ্যা ইমেজ খাড়া করেছে। একই সঙ্গে পাঠককে ইসলাম ও পশ্চিমের পারস্পরিক সম্পর্ককে শুধু ক্রোধ, সহিংসতা, ঘৃণা ও অযৌক্তিকতার মধ্যে ভাবতে বাধ্য করেছে। লুইসের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন মহলের যোগাযোগ ও সৌহার্দ্যের কারণে তার প্রবন্ধটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রচার পায়। এটি সমকালীন ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই।

লুইসের প্রবন্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় আটলান্টিক মানথলির ওই বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্র দেখে। এখানে দেখানো হয়েছে উগ্রমেজাজি, শ্মশ্রুমণ্ডিত, পাগড়ি পরিহিত একজন মুসলমানের চোখ ধক ধক করে জ্বলছে এবং ওই চোখের মধ্যে আমেরিকার পতাকা বসানো হয়েছে। এই প্রচ্ছদ চিত্রের হুমকি ও সংঘর্ষের মেজাজ প্রতিফলিত হয়েছে লুইসের লেখার ভেতরে সন্নিবিষ্ট আরও দুটো ইলাস্ট্রেশন থেকে। প্রথম ইলাস্ট্রেশনে আছে তারকা ও স্ট্রাইপ খচিত একটি সরীসৃপ মরুভূমি

www.pathagar.com

অতিক্রম করছে (মার্কিন আধিপত্য অথবা আরব জগতের প্রতি মার্কিন হুমকি)।

দ্বিতীয় ইলাস্ট্রেশনে দেখা যায় একটি সরীসৃপ নামাজরত একজন মুসলমানকে দংশন করতে যাচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই এই প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন মুসলমানদের সম্পর্কে পাঠককে একটা রগরগে নেতিবাচক ইমেজ তৈরিতে সাহায্য করে। আবার অনেক মুসলমানই দাড়ি রাখে। পাগড়ি পরে। সেটি দিয়েও পশ্চিমারা মুসলমানদের বোঝাতে চায় এরা মধ্যযুগীয় জীবনাচার ও ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী।

লুইসের প্রবন্ধের শিরোনাম 'দ্য রুটস অব মুসলিম রেজ' নিয়েও কিছুটা কথা বলা যায়। এ শিরোনাম নিতান্তই সাম্প্রদায়িক ও মতলবসিদ্ধ। পাশ্চাত্যে আজকাল যেভাবে মুসলিম ক্রোধের শেকড় খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে সেভাবে খ্রিস্টান অথবা ইহুদি ক্রোধের শেকড় সন্ধানী কোনো প্রবন্ধ আমরা অবশ্য সেখানে খুঁজে পাইনি। এটা ঠিক, পাকিস্তানের আণবিক বোমাকে ইসলামী বোমা বলা আর আমেরিকা ও ইসরাইলের আণবিক সামর্থ্যকে খ্রিস্টান বা ইহুদি বোমা না বলার মতো ব্যাপার আর কী। লুইসের লেখার মর্মার্থ হচ্ছে ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগত এক আসন্ন সংঘাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যা কি না ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ফল। লুইসের নিজের কথা শোনা যাক :

The struggle between Islam and the West has now lasted fourteen centuries. It has consisted of (rather than included) a long series of attacks and counter attacks, jihads and crusades, conquests and re-conquests. Today much of the Muslim is again seized by an intense and violent resentment of the West. Suddenly, America had become the archenemy, the incarnation of evil, the diabolic opponent of all that is good, and specifically, for Muslims, of Islam, why?

এখানে অবধারিতভাবে ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীকে দায়-দায়িত্বহীন ও প্রমাণবিহীনভাবে আগ্রাসনকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে নির্দোষ চরিত্রসম্পন্ন, যার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

মুসলমানরা অযৌক্তিক লড়াইয়ে মত্ত হয়েছে। লুইসের এই অপরিপক্ক, একচোখা বিশ্লেষণে সমস্যার গভীরতা উঠে আসেনি। বিশেষ করে ধনবাদী শিল্প সভ্যতার আগ্রাসী ও ইসলামবিরোধী সাম্প্রদায়িক চরিত্রের কারণেই যে আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় বহু রকমের সংকট তৈরি হয়েছে তা অনুক্ত রয়ে গেছে।

৩.

সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বের আর একজন দুর্বার সমর্থক হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমিসিয়ান স্যামুয়েল পি হান্টিংটন। এই ভদ্রলোক ১৯৯৩ সালে আমেরিকার ফরেন অ্যাফেয়ার্স পত্রিকায় ক্লাশ অফ সিভিলাইজেশন নামে একটি প্রবন্ধ লিখে স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তর পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ ও নৈতিক ভিত্তি দেয়ার চেষ্টা করেন। হান্টিংটনের এই থিসিসটি পরে– The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order নামে প্রকাশিত হয়। এখানে হান্টিংটন তার চিন্তা-ভাবনার ব্যাপক বিশ্লেষণ করেন। তার মত হচ্ছে, স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তরকালে সভ্যতার সংঘাতই বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আন্তঃসভ্যতার ভেতরকার বিবদমান ও ত্রুটিপূর্ণ সম্পর্কই হবে ভবিষ্যতের সংঘাতের উপাদান। ভবিষ্যতে যদি কোনো বিশ্বযুদ্ধ হয় তবে তা হবে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে।

হান্টিংটন বলছেন, আজকের বিশ্বায়িত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পৃথিবীতে জাতি রাষ্ট্রের আইডেন্টিটি দুর্বল হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে সভ্যতার পার্থক্যটাই উচ্চকিত হয়ে উঠছে। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর সেকুলারিকরণ দুর্বল হয়ে পড়ায় শেকড়ের দিকে ফেরার তাড়া দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া এতকাল বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক ছিল মূলত পশ্চিমারাই। এখন অপশ্চিমা সভ্যতাগুলোও বিশ্বব্যবস্থার চালকের আসনে বসার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে।

হান্টিংটন তার মনোলিথিক সভ্যতা চিন্তার কারণে ইসলাম ও চৈনিক সভ্যতাকে ভবিষ্যতে পশ্চিমা স্বার্থ ও মূল্যবোধের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করেন। হান্টিংটনের এ ধারণার মধ্যে সাংস্কৃতিক বর্ণবাদের গন্ধ পাওয়া যায়। তা না হলে তিনি বলতে দ্বিধা করেন না ইসলাম হচ্ছে পশ্চিমের ঐতিহাসিক শত্রু : Conflict along the fault

www.pathagar.com

line between Western and Islamic civilizations has been going on for 1300 years... .

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকার নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো প্রায় প্রতিরোধহীন পৃথিবীর ফাঁকা ময়দানে নতুন করে সাম্রাজ্যবাদী অভিযান শুরু করেছে। এ অভিযানে তাদের মূল প্রতিপক্ষ হচ্ছে ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠী। যদিও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নিজস্ব জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে ইসলাম প্রধান রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই, এমনকি ইসলাম প্রধান রাষ্ট্রগুলোর পাশ্চাত্যকে মোকাবিলা করার সামরিক সামর্থ্যও নেই। কিন্তু আদর্শিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে কমিউনিজমের পতনের পর এটিই এখন একমাত্র সুগঠিত ব্যবস্থা, যা কি না পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক শিল্প সভ্যতার বিকল্প স্বপ্ন জাগাতে পারে। এই ভয় থেকেই ধনবাদী সভ্যতার মারক আদর্শ ইসলামকে কোথাও বাড়তে না দেয়ার দৃঢ় সংকল্প হেতু আন্ত র্জাতিক ধনতন্ত্রের রক্ষক আমেরিকা ও তার মিত্ররা পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত কেও বিশেষ করে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে লড়াইয়ের ময়দানে পরিণত করেছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় পশ্চিমারা যেমন করে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে 'আত্মরক্ষামূলক' প্রতি আক্রমণ চালিয়েছে, আজ বিশ্বায়নের যুগে আমেরিকা ও তার মিত্ররা ইসলামকে একইভাবে নিশানা করেছে। ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার স্বার্থে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামী আদর্শ ও আন্দোলন ধ্বংস করাই হয়ে উঠেছে এখন পুঁজিবাদী দেশগুলোর লক্ষ্য। কারণ ইসলাম সামাজিক ন্যায়ের কথা বলেছে। দুর্বলকে আরও দুর্বল করে অন্ত হীন ব্যক্তিগত মুনাফা লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, বিশেষ করে রাষ্ট্র ও সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছে। শুধু তাই নয় জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি নির্বিশেষে এক বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছে ইসলাম। এ সমাজ হচ্ছে কার্যত অর্থেই প্লুরাল, কম্যুনাল নয় মোটেই। তার অর্থ ইসলামের বাড়বাড়ন্ত মানে ধনতন্ত্রী সভ্যতার জীর্ণতা অতি দ্রুত বের হয়ে আসা।

এ কারণেই ইসলামকে আক্রমণ করার পূর্ব শর্ত তৈরি প্রয়োজন। সেই শর্ত তৈরি করতে এগিয়ে এসেছেন পশ্চিমের দুই সংঘাতের বুদ্ধিজীবী বার্নাড লুইস ও স্যামুয়েল হান্টিংটন।

www.pathagar.com

৪.

স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তর বিশ্ব ব্যবস্থায় সভ্যতার সংঘাত কয়েকটা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমা সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে এসব জ্বালামুখ এমনিতেই উঠে আসে। যেমন মৌলবাদ, গণতন্ত্র, ইরাক-আফগানিস্তান-ফিলিস্তিন যুদ্ধ প্রভৃতি।

মৌলবাদ সবধর্ম ও সংস্কৃতিতে আছে। মজার ব্যাপার হলো সবকিছু বাদ দিয়ে ইসলামী মৌলবাদকেই এখন পশ্চিমা সভ্যতার জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মৌলবাদ ব্যাপারটা আদিতে ছিল প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের একটা আন্দোলন, যা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছিল। এই মৌলবাদ কিন্তু কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। এরা বাইবেলকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা ও অনুসরণ করার কথা বলতেন। এরা মনে করতেন বাইবেল হলো অভ্রান্ত। এর কোনো কিছুকেই মিথ্যা বলা যাবে না। এ অর্থে ইসলামের মধ্যে কোনো মৌলবাদ নেই। কারণ কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে হুবহু একই রকম আছে। এর কোনো বিকৃতিও হয়নি অথবা এর ব্যাখ্যার মধ্যে বড় কোনো বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয়নি। মুসলিম মৌলবাদ বলতে যাদের বোঝানো হয় তারা ঠিকই কোরআনকে ভিত্তি করে সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবন গড়তে চান; কিন্তু তা কখনও যুগোপযোগিতাকে বাদ দিয়ে নয়। তাই মুসলিম মৌলবাদের সঙ্গে এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক চেতনা বা আবেগ জড়িয়ে পড়েছে। মুসলিম মৌলবাদ সে হিসেবে অনেকটা রাষ্ট্রিক চেতনা, কেবলই একটা পশ্চিমা অর্থে ধর্মবিশ্বাসের বিষয় নয়। যদি তাই হতো তবে একে একটা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হতো না অবশ্যই। মুসলিম মৌলবাদের আছে বিকল্প স্বপ্ন। বিকল্প রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনা, যা অনায়াসে সেকুলার পশ্চিমা সভ্যতার বিকল্প মডেল হতে পারে। সেকুলার পশ্চিমা সভ্যতা যেভাবে চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথককরণ চায় এবং ধর্মকে পশ্চাৎমুখী ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় হিসেবে মনে করে তার সঙ্গে আছে ইসলামের মৌলিক তফাত। এই তফাতের জায়গাটায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমা সভ্যতা আজ ইসলামকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনায় সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বের মধ্যে নিয়ে

www.pathagar.com

এসেছে। যাতে জঙ্গি, বর্বর সন্ত্রাসী ইত্যাদি কথা বলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে শেষ করে দেয়া যায়। মুসলিম মৌলবাদের প্রতি পশ্চিমাদের গোস্বার আরেকটা কারণ হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের যুগ থেকে শুরু করে আজ এই বিশ্বায়নের যুগ-অবধি পশ্চিমাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোয় ইসলামই বড় রকমের পরিচয় ও সাহস জুগিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই অনড় অবস্থানের কারণেই ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের গালিবর্ষণের কোনো ক্লান্তি নেই।

ইসলামকে গালমন্দ করা ও হুমকি বিবেচনা করার আরেকটা কারণ হচ্ছে পশ্চিমারা মনে করে এটি অন্তর্গতভাবেই অগণতন্ত্রী ও অসহিষ্ণু। মজার ব্যাপার হলো যে পশ্চিমারা ইসলামকে অগণতন্ত্রী বলে নিন্দা করে সেই তাদের কাছেই আবার মুসলিম স্বৈরশাসক, অগণতন্ত্রী, রাজা বাদশাহ ও মিলিটারি ডিক্টেটররা হচ্ছে হরিহর আত্মা। মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র অবাধ নির্বাচন হলে আজ অধিকাংশ জায়গায় ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় চলে আসবে। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আরও স্বাধীন হয়ে উঠবে এবং এসব দেশের সম্পদ বিশেষ করে তেলের ওপর পশ্চিমা খবরদারি নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়বে। এ কারণেই পশ্চিমারা মুসলিম দেশগুলোতে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, উদারনৈতিক রাজতন্ত্র বা ডিক্টেটরের তত্ত্ব ফেরি করে বেড়ায়। আসল কথা হচ্ছে, মুসলিম দেশগুলোর ওপর এ যাবৎ পশ্চিমা আধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ ও তাদের দেশীয় তল্পিবাহীদের কারণে এখানে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ও স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমা দোসর সেনাশাসক ও স্বৈরাচারী রাজা-বাদশাহরা এমন পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে, যার ফলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে। মুসলিম দেশগুলোর জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের কৃত্রিম প্রকৃতির কারণে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর সীমানা তৈরি হয়েছে ঔপনিবেশিক প্রভুদের ইচ্ছায় অথবা এর শাসকরাও ক্ষমতাসীন হয়েছে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সমর্থনে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্বল অর্থনীতি, অশিক্ষা হয়ে উঠছে মুসলিম দেশগুলোর সাধারণ চরিত্র। বিশেষ

www.pathagar.com

করে পাশ্চাত্যের পো ধরা সেকুলার গণতন্ত্রীদের ব্যর্থতা জনগণের কাছে ইসলামপন্থীদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের বড় রকমের গাত্রদাহের কারণ। এসব ইসলামপন্থীর নীতি ও আদর্শের সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বড় কোনো তফাত নেই। ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে শুরা (পরামর্শ), ইজমা (পারস্পরিক সম্মতি), হিজবের (দল) চর্চা রয়েছে। আধুনিক মুসলিম পণ্ডিতরা ইসলামী ঐতিহ্য ঘেটে দেখিয়েছেন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক স্তরে বহুত্বের ঐতিহ্যও ইসলামের মধ্যে আছে। ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমা গণতন্ত্রের তফাত হচ্ছে সার্বভৌমত্বের ধারণাকে কেন্দ্র করে। ইসলাম খোদায়ী সার্বভৌমত্বকে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রয়োগ করতে চায়। রেনেসাঁ উদ্ভূত সেকুলার চিন্তা মানবতন্ত্রী ঐতিহ্যকেই উঁচু করে ধরে। চিন্তার এই পার্থক্যের কারণেই ইসলামী আন্দোলনগুলো যতই গণতন্ত্রী ও জনসমর্থনপুষ্ট হোক না কেন, তাকে মৌলবাদ ও পশ্চাৎমুখিতার সঙ্গে সমার্থক হিসেবে দেখানো পশ্চিমাদের জাতীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। যা কিছু ইসলাম তাই পশ্চিম ও আধুনিকতাবিরোধী এই মনোভাব আজ তুঙ্গে। হয়তো এই সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের ভাবতে হচ্ছে এরা হচ্ছে একালের ক্রুসেডার। প্রেসিডেন্ট বুশও ক্রুসেডের কথা বলেছেন। এভাবেই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ক্রুসেডের ভেতর দিয়ে একালে মধ্যযুগকে ফিরিয়ে এনেছে, যার বিরুদ্ধে নাকি পশ্চিমের মানুষ এক সময় একত্রিত হয়েছিল।

পশ্চিমা পণ্ডিতরা আজ ইসলামী মৌলবাদের উৎস সন্ধান করতে গলদঘর্ম হয়ে পড়ছেন। কিন্তু মৌলবাদের উৎস তারা আদৌ সন্ধান করতে পেরেছেন কি? এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বসনিয়ার মুসলমানরা বারংবার একথা পাশ্চাত্য সংবাদ ভাষ্যকারদের বলেছেন, ইহুদি বা খ্রিস্টানরা যদি এ রকম আক্রমণের সম্মুখীন হতো, তাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জের বা উন্নত দেশগুলোর ধিক্কার অন্যরকম হতো। বসনিয়ার মুসলমানরা ইউরোপীয় আদব-কায়দা রপ্ত করেছেন বহুদিন। ...they drank alcohol, ate pork, married non-Muslims and so on- nonetheless when killings began these secularized Muslims were

www.pathagar.com

the first victims of the Serbs (Islam, Globalization and Post modernity; Akbar S. Ahmed and Hastings Donnan).

সুতরাং কাকে মৌলবাদ আর কাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলব সেই জিনিসটা আগে নির্ধারিত হওয়া দরকার। দুনিয়াকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে সাদা ও কালোয়, আমরা ও ওরায় বিভক্ত করে ফেলেছে, তা কিন্তু মানব প্রজাতির জন্য কোনো সুখকর ঘটনা নয়।

হান্টিংটন সাহেবরা মার্কিন-ইউরোপীয়-খ্রিস্টীয় সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের সংঘাতের অনিবার্যতার কথা বলেছেন। কারণ ইসলাম 'মুক্তবাজার গণতন্ত্র' সমর্থন করে না। এটা সত্য বিশ্বটাকে কেবল বাজার অর্থনীতির ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। ভোগবাদ আর আত্মস্বার্থপরতা হতে পারে না মানুষের চরম নিয়তি।

ইসলাম বলছে, অভাবী অভাগাদের সাহায্য করতে। অনাথকে প্রতিপালন করতে। বৃদ্ধ, অসমর্থ ব্যক্তিদের ভার নিতে। কোরআন শরীফে যেমন আছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের কথা তেমনি আছে মুসতাদাফিন ও মুসতাকবিরিন–শোষিত ও শোষকগোষ্ঠীর কথা। ইসলাম এই বৈষম্য তুলে দেয়ার পক্ষে। এই যে মানবতন্ত্রী ভাবনা তা কিন্তু ইসলামের একার নয়। এর শরিক পশ্চিমা কর্পোরেট বিশ্বের অনেক ধার্মিক খ্রিস্টান এমনকি অন্যান্য ধর্মের ধার্মিক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তারাও মনে করেন অর্থনীতিকে, সমাজনীতিকে কতগুলো নৈতিক মূল্যমান মেনে চলতে হবে। কেবলই অর্থনৈতিক লাভ-লোকসান যেন সব রকম বিচার বিবেচনার শর্ত না হয়ে দাঁড়ায়। এসব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অতখানি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ও উদারনীতিক হওয়ারও পক্ষপাতী নন।

ঐতিহাসিকভাবে খ্রিস্টান ও মুসলমান ধর্মের সঙ্গে একটা যোগাযোগও আছে। দুটোই নবী ইব্রাহিমের সিলসিলার উত্তরাধিকারী। অতএব খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতটাকেই অনিবার্য ভাবা যুক্তিযুক্ত হচ্ছে কী? সব ধর্মের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি তাদের যৌথ শাশ্বত ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে সুরক্ষার জন্য আগামীতে এক কাতারে এসে দাঁড়ান তাতে আশ্চর্য হওয়ার তো কিছু নেই। সংঘাত নয়, একমাত্র সম্প্রীতিই পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে পারে।

www.pathagar.com

জেহাদ, ফতোয়া ও সাম্রাজ্যবাদ

১.

পশ্চিমের খ্রিস্টান দুনিয়া, যার নেতৃত্বে আছে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড পুরো মুসলিম দুনিয়ার উপর আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এর শুরু আফগানিস্তান আক্রমণের ভিতর দিয়ে। একই প্রক্রিয়া এখন টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইরাকে। মুসলমানের সাথে পশ্চিমা দুনিয়ার এই বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। ইতিহাসে এর একরূপ আমরা দেখেছি ক্রুসেডের কালে, অন্যরূপ সাম্রাজ্যবাদ–উপনিবেশিকতার যুগে। মাঝখানে ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার ঠেলাঠেলির ফলে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ছিল। এখন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিপর্যয়ের সুযোগে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের ঐতিহাসিক মুসলিম বিদ্বেষকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে।

সেকালের মত একালেও মুসলমানরা খ্রিস্টান দুনিয়ার এই সাম্রাজ্যবাদী কায়কারবারকে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। এসব চেষ্টার মধ্যে নানা অসম্পূর্ণতা আছে সত্য কিন্তু তারপরেও এর প্রক্রিয়া কখনো স্তব্ধ হয়ে যায়নি। মুসলমানের এই প্রতিরোধ প্রতিবাদের প্রচেষ্টাকে বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে জেহাদ।

বিশ্বাসী মুসলমানের কাছে জেহাদ শব্দের তৎপর্য ব্যাপক। নিছক যুদ্ধ, বিগ্রহ, রক্তপাত, অভ্যুত্থানের মধ্যেই এর সীমা আবদ্ধ নয়। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ, ন্যায় বিচার সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুদ্ধ, জ্ঞানে বিজ্ঞানে প্রযুক্তির কৌশলে বিজয়ী হওয়ার জন্য যে যুদ্ধ, দারিদ্র-মহামারী আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ, সর্বোপরি নিজের রিপু আর অসৎকামনার বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার যে যুদ্ধ তাই হচ্ছে জেহাদের আসল কথা। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে জেহাদের এই আসল কথা চাপা পড়ে গেছে। ভেসে উঠেছে নকল কথা।

জেহাদ শব্দটার প্রতি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ প্রচার প্রোপাগান্ডার জোরে এমনই ঘৃণা তৈরি করেছে যে এটি শুনলেই মনে হবে যে একদল রক্তপিপাসু, বর্বর, সহিংস ও ধর্মোন্মাদ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যযুগীয় কায়কারবার। বলাবাহুল্য এই জাতিগোষ্ঠীর নাম হচ্ছে মুসলমান। সাম্রাজ্যবাদের দেখাদেখি আমাদের এখানকার সাম্রাজ্যবাদ পন্থী আধুনিকতাবাদী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, লেখক, ঐতিহাসিকদেরও এ শব্দটির প্রতি ঘৃণা এমনই তীব্র যে জেহাদ শব্দটার গুরুত্ব ও মর্যাদাকে খারিজ করে দিতেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত হন না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজাদী সংগ্রমের এই অধ্যায়টি সম্পর্কে তারা অনেকেই নির্বাক বনে যান। আবার অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী দয়াপরবশ এসব বিদ্রোহ সংগ্রামকে 'পশ্চাৎপদ কৃষক চেতনা' হিসেবে চিহ্নিত করেন। কেউ কেউ এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের গন্ধ পান।

www.pathagar.com

জেহাদ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের এই ভয়ের কারণ আছে অবশ্যই। কেননা এই জেহাদের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে মুসলমানরা সাম্রাজ্যবাদের অনাচার-অপচার, হত্যা, ধ্বংস, লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন আজতক। ক্রুসেডকে ঠেকানো হয়েছে জেহাদ দিয়েই। উপনিবেশিক যুগে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলমানরা এই জেহাদের কৌশল গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। আজকের আফগানিস্তান, ইরাকেও এই ইতিহাসের পুনরাবর্তন ঘটছে। তাই জেহাদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের এত ক্ষোভ। আর আমাদের এখানকার সাম্রাজ্যবাদপন্থীদের ইসলামকে ভয় পাওয়ার কারণ এটাই।

২

দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত প্রচারণার জোরে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সবার মনেই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে জেহাদ মানেই যুদ্ধ। প্রকৃত ঘটনা আসলে সেরকম নয়। জেহাদ শব্দটা এসেছে আরবি জুহুদ ক্রিয়া থেকে যার মানে হচ্ছে চেষ্টা করা বা দৃঢ়তার সাথে প্রয়োগ করা। আরবিতে সশস্ত্র কিংবা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বর্ণনার জন্য অনেক শব্দ রয়েছে যেমন হরব্ (যুদ্ধ), সিরাস (সংগ্রাম), মারাকা (লড়াই) কিংবা কিতাল (হনন)। যুদ্ধ কিংবা রক্তপাতই যদি এসব কিছুর উদ্দেশ্য হতো তাহলে কোরআনে এসব শব্দ ব্যবহার করেই কাজ চালানো যেত। কিন্তু তা না করে জেহাদ শব্দকে বাছাই করা হয়েছে এ কারণে যে এটি দ্বারা যুদ্ধকে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। নৈতিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রয়োজনে সামরিক প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানের সংগ্রামের অঙ্গীকারের নাম হচ্ছে জেহাদ। সামরিক কার্যকলাপ জেহাদের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র।

মার্মাডিউক মোহাম্মদ পিকথল তার সুবিখ্যাত Cultural Side of Islam গ্রন্থে বলেছেন মানুষের মনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দাবীকে প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানের সর্বাত্মক যে প্রচেষ্টা তারই নাম জেহাদ। কোরআনি নীতিকে সামনে রেখে মুসলমানের প্রত্যেকটি কার্যকলাপ পরিচালনার মধ্যেই এই জেহাদের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। মানুষের হৃদয় ও মন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি স্তরে অন্যায়কে প্রতিহত করার যে অবিরত-প্রচেষ্টা তার মধ্যেই মুসলমানের এ দায়িত্ব পালন সম্ভব। আমরা কোরআন শরীফের একটি উদ্ধৃতি নেইঃ আল আমর বিল মারুফ ওয়াল নাহী আন আল মুনকার।

এখানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কথা বলা হয়েছে। এর মানে এই কর্তব্যে প্রত্যেক মুসলমানকে সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে হবে। আইনবিদগণ এই কর্তব্যের জন্য চারটি পথ বাতলেছেনঃ হৃদয়, জিহ্বা, হস্ত ও

www.pathagar.com

তরবারি। অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত বিচারে এই চারটি পথেই অন্যায়ের পথরোধ করা যায়। এখানে বোঝা দরকার তরবারিই অন্যায় রোধের একমাত্র পন্থা নয়।

রসুল স. বলেছেন নিজের পশু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে বড় জেহাদ, ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয়েছে জেহাদ উল আকবর। এর মানে হচ্ছে এ লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কার্যকর অর্থে যেমন ক্রিয়াশীল করা যায় তেমনি সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাও সহজতর হয়। এ লড়াইটা শুরু হয় নিজের ভিতর থেকে। এ হচ্ছে ইতরতা, নীচতা ও সবরকমের খারাপ প্রকৃতি জয় করে উপরে ওঠার চেষ্টা। মানুষের মধ্যে জানোয়ারের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। এ সব বদ অভ্যাসগুলো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেলে মানুষও কার্যকর অর্থে ভয়ানক জানোয়ারে পরিণত হয়। এই সব তীব্র উত্তেজনাসমূহ নিয়ন্ত্রণে রাখাই হচ্ছে জেহাদের মূল অর্থ। অন্যদিকে মানুষ নিজের পরিবেশ ও চারিপাশের মানুষকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এসবকে প্রতিহত করতেও জেহাদ আবশ্যক। এরকম জেহাদকে তাই কেউ কেউ বলেছেন জেহাদ আল নাফস– প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ, কেউ বলেছেন জেহাদ আল শয়তান– শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ।

রসুল স.-এর একটি জনপ্রিয় হাদিস হচ্ছেঃ আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদে ফিরলাম। একটি যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে তিনি একথা বলেছিলেন। সাহাবীরা বড় জেহাদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, এ হচ্ছে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এখানে রসূল স. দৈনন্দিন জীবনের কাজেকর্মে অন্তরের ও সমাজের অমঙ্গলকে জয় করার সাধনার কথা বলেছেন।

বড় জেহাদের আরও দু একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। রসূল স. বলেছেন, শহীদের রক্ত অপেক্ষা পণ্ডিতের কলমের কালি অনেক বেশি পবিত্র। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও মনীষার চর্চার উপরে ইসলাম কতদূর জোর দিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যেই যে পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে শক্তিমান ও পয়মন্ত হওয়া যায়, পৃথিবীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাতো ইসলামের ইতিহাস থেকেই আমরা দেখছি। আবার একই ইতিহাস থেকে এটাও স্পষ্ট মুসলমানরা যখন এই জগত থেকে হারিয়ে গেছে তখন তারা সবচেয়ে বেশি ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। আজকের মুসলমানরাই তার বড় প্রমাণ। এ কালের জন্য তাই মুসলমানের সবচেয়ে বড় জেহাদ হচ্ছে জ্ঞান ও মনীষার জগতে নিজেদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনা। এরকম জেহাদকে অনেকে জেহাদ আল তারবিয়া- শিক্ষার জেহাদ বা জেহাদ আল কলম- কলমের জেহাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনেকে ইসলামের বাণীকে শান্তিপূর্ণভাবে, হিকমতের সাথে এবং যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অমুসলমানদের কাছে তুলে ধরার কথা বলেছেন। এখন যেহেতু যোগাযোগ

www.pathagar.com

ও তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে তাই এটা ইসলাম প্রচার ও প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে।

এ ধরনের কাজকে তারা বলেছেন জেহাদ আল দাওয়াহ- প্রচারের জেহাদ বা জেহাদ আল লিসান- জিহ্বার জেহাদ। তারা কোরআন শরীফের এই আয়াতটিকে নিজেদের কাজের স্বপক্ষে তুলে আনেন ঃ

আল্লাহর পথে আহ্বান করো জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো পছন্দযুক্ত পন্থায়। (সুরা-১৬, আয়াত-১২৫) এরপরে আছে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা অসংখ্য জেহাদের পরীক্ষা। এর একটাই উদ্দেশ্য নিজের পাপবিদ্ধ শরীর ও মনকে নিষ্কলুষতার দিকে নিয়ে যাওয়া। বিপদে-মসীবতে ধৈর্যের পরীক্ষা দেয়া, দানশীলতার নজীর স্থাপন করা, ব্যবসায় সততা রক্ষা, ওয়াদা পালন, সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে সমর্থন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মুসলমানের একালের সংগ্রাম এর প্রত্যেকটি তো বৃহত্তর অর্থে জেহাদের অংশ।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে জেহাদের এই অমলিন চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে এবং এর মহান তাৎপর্যকে এমন একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে যে এর চৌহদ্দী এখন যুদ্ধ ও রক্তপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এমনকি মুসলমানরাও আজকাল জেহাদ শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। জেহাদের প্রকৃত তাৎপর্য মুসলমানের জীবন থেকে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলেই আজ তাদের শিরে নেমে এসেছে বিপর্যয়ের বোঝা। মার্মাডিউক পিকথল যথার্থ লিখেছেনঃ

It was when the Muslims lost the spirit of Jihad in works of peace, and lost sight of the larger meaning of the term in the restricted meaning which the scholiasts attached to it, that Muslim civilisation began to stagnate.

(Cultural. Side of Islam, p-120)

এই হলো আজকের মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে হলে মুসলমানকে আরো কৌশল, আরো বুদ্ধিমানতা, আরো সৃজনশীলতার সাথে অগ্রসর হওয়া দরকার। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, মুসলমান দেশগুলোর বিরুদ্ধে তাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাকার নানামূখী আগ্রাসন ও অভিযানের প্রেক্ষাপটে শুধু সশস্ত্র সংগ্রাম করে কোন বড় ফল পাওয়া যাবে না। এই বিপদকে মোকাবেলার জন্য মুসলমানকে আজ জেহাদের বৃহত্তর ও বহুমূখী তাৎপর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করতে হবে।

www.pathagar.com

রসুল স.-এর একটি হাদীসের উদাহরণ নেয়া যাক। তিনি বলেছেন, দারিদ্র মানুষকে কুফুরীর দিকে ঠেলে দেয়। ১৪০০ বছর পর এই নির্দেশকে আজকের মুসলমান সমাজ কিভাবে গ্রহণ করবে। ঈমান হচ্ছে ইসলামের সার কথা। সেই ঈমান বাঁচানোর জন্য আজ দুনিয়ার তাবৎ মুসলমানের উচিত নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির সংগ্রামে শরীক হওয়া। অন্যথায় দারিদ্র হেতু মুসলিম সমাজের দুর্দশা ঘোচানো যাবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত মুসলমানরাই আজ এ পৃথিবীতে সবচেয়ে দরিদ্র জাতি। আর এটা কেনা জানে দরিদ্রের পক্ষে কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। এই দারিদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ তাই আজ মুসলমানের জন্য জরুরি হয়ে উঠেছে।

এবার কোরআন শরীফের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি নেয়া যাক ঃ

তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সুরা-তহা, আয়াত-১০৩)

আজকের মুসলিম দুনিয়ায় কোরআনের এ বাণীর বিপরীত ছবিটিই পরিলক্ষিত হয় বেশি। এ কালে মুসলমান দেশগুলো পরস্পরের সাথে নানারকম কলহে জড়িয়ে পড়েছে। কখনো কখনো এই কলহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পর্যন্ত পর্যবসিত হয়। নিজেদের ভুলের কারণে হোক আর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলেই হোক আমাদের কালেই আমরা এসব ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছি। ইরাক-ইরান যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ এমনকি আমাদের দেশের বাঙালি-অবাঙালির বিরোধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাত- এসবের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। অথচ এগুলোই মুসলিম উম্মাহর সংহতিকে প্রতিদিন দুর্বল করে দিচ্ছে। আর এর প্রেক্ষাপটে মুসলিম দুনিয়ার উপর সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে। মজার ব্যাপার হলো এসব যুদ্ধের কোন কোনটিকে স্বার্থপর শাসকরা নিজেদের সুবিধার জন্য জেহাদ নাম দিয়ে ধর্মীয় রং দেয়ার চেষ্টা করেন যাতে সাধারণ মুসলমানের সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু ধর্মীয় রং দিলেই কি এসব যুদ্ধ জেহাদের তাৎপর্যে উন্নীত হতে পারে? সেকালের উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতিমী, অটোম্যান, মোগল, পাঠান ইত্যাদি মুসলমান রাজবংশের মধ্যে পারস্পরিক কলহ, বিবাদ, অভিযান, সংগ্রাম কিংবা এর বাইরের যে সব যুদ্ধ বিগ্রহ এর অনেক কিছুকে জেহাদ বলা মোটেই ন্যায় সংগত হবে না।

আজকাল অনেকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জেহাদের কথা বলেন। কিন্তু সেই জেহাদ শুরু হওয়া দরকার মুসলিম সমাজের ভিতর থেকে। বিভক্ত, বিধ্বস্ত, কলহরত মুসলিম দুনিয়াকে ইসলামের ভিত্তিতে এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা দরকার। একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বড়

www.pathagar.com

গ্যারান্টি হতে পারে। জেহাদের এই দিকটি আমরা অনেক সময়ই গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখতে চাই না।

৩

এবার আমরা সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে চোখ ফেরাতে পারি। এ জেহাদকে বলা হয়েছে জেহাদ বিল সাইফ- তরবারির যুদ্ধ। যে জেহাদ নিয়ে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের বশংবদ লেখক এবং প্রচারকর্মীরা ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়েছেন।

এই জেহাদ হচ্ছে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আক্রান্তের লড়াই। নিজের দেশ, নিজের কওম যদি আক্রান্ত হয় তবে তার প্রতিরক্ষার জন্য যে লড়াই তা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। কোরআনের নীতি অনুসারে সশস্ত্র জেহাদ করা যেতে পারে কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন আত্মরক্ষা, দুর্বল ও নির্যাতিতকে রক্ষা এবং অন্যায়ের প্রতিকার। এই কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে এ সব ক্ষেত্রে যদি সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হওয়া যায় তবে মানব প্রজাতির ভবিষ্যৎই বিপন্ন হবে।

রসুল স. বার বার যুদ্ধের সময় নিরীহ ব্যক্তি, নারী-শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মযাজকদের আক্রমণ করতে কঠোর নিষেধ করেছেন। এমনকি ফসলের ক্ষেত ও ফলবান বৃক্ষকে ধ্বংস করতে তিনি মুসলিম যোদ্ধাদের নিষেধ করেছেন। রসূল স. বলেছেন, তোমরা তাদের জীবন ধারণের উপায়গুলো ধ্বংস করো না। শত্রুর বিরুদ্ধে এই ছিল রসূল স.-এর যুদ্ধের নীতি।

যে যুদ্ধে একটি ফলবান বৃক্ষ ধ্বংস করাও নীতিবিরুদ্ধ সে যুদ্ধ কি করে মধ্যযুগীয় ধর্মোন্মাদদের কারকারবার হতে পারে এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারণায় আমরা কিভাবে বিভ্রান্ত হই তা নতুন করে ভাবা দরকার। এর সাথে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের আজকের যুদ্ধ কৌশলের তুলনা করা যাক এবং সেটি ইরাকের নমুনা দিয়েই পেশ করছি। ইরাক 'যুদ্ধ' শুরু হওয়ার আগে সাম্রাজ্যবাদীরা দেশটির উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। এই অবরোধ আরোপের কারণে ৫ লাখ ইরাকী শিশু অনাহারে অপুষ্টিতে মারা যায়। এ সম্পর্কে তখনকার ক্লিনটন প্রশাসনের সেক্রেটারি অফ স্টেট ম্যাডলিন অলব্রাইটকে তার মতামতের জন্য জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ভাবলেশহীনভাবে বলেন, সবদিক বিবেচনা করে We think the price is worth it- আমরা সবকিছু চিন্তা করে যা করেছি তাতে পাঁচ লাখ ইরাকী শিশুর মৃত্যু এমন কিছু নয়। ঠিকই আছে। এরপর ইরাক যুদ্ধ ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী আমাদের চোখের সামনেই আছে। যাদের কাছে ৫ লাখ শিশু হত্যা অন্যায় কিছু নয়, যারা নিউক্লিয়ার বোমা- ক্লাস্টার বোমা ছুড়ে দেশের পর দেশ বিরান করে দিচ্ছে, যাদের মধ্যে মায়ামমতা বলে কিছু নেই, যাদের মধ্যে ইনসাফের ধারণাটুকু

www.pathagar.com

নেই তাদের মুখে ইসলামের জেহাদের মূল্যায়ন করতে যাওয়া এক বিরাট তামাশা ছাড়া কিছু নয়। রসুল স.-এর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের ভয়াবহতাকে কমিয়ে আনা এবং এর ফলাফল ছিল চমৎকার। বিজিতদের সাথে রসূল স., তার প্রতিনিধি এবং পরবর্তীকালে তার পূণ্য অনুসারীরা যে ব্যবহার করেছেন তাই তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছে। মক্কার কোরেশদের দুর্ব্যবহারের প্রতিদানে রসূলের ক্ষমার কথা স্মরণ করুন। মুসলমানের সাথে যারাই শান্তি চেয়েছে তারা তা পেয়েছে যতক্ষণ না তারা বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। মুসলমানরা অমুসলমানদের সাথে যদি কোন চুক্তি করেছে তবে সেটা জানবাজী দিয়ে তারা রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। যারা ইসলামকে তরবারির ধর্ম হিসেবে প্রচার করেছে তারা মিথ্যুক। খ্রিস্টান ইউরোপের কাছে ইসলামের এই ভাবমূর্তি আজও একটা পরিবর্তন হয়েছে বলা যাবে না। অথচ মজার ব্যাপার হলো মধ্যযুগে খ্রিস্টান ইউরোপই ক্রুসেডের লড়াইগুলো লড়েছে।
এই সব ক্রুসেডের নৃশংসতা একবাক্যে ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। এর বিপরীতে সেদিনের জেহাদকারীদের চেহারাটা আমরা একটু দেখে নিতে পারি। রাজা রিচার্ডকে হাতে পেয়ে গাজী সালাহউদ্দীন যে ব্যবহার করেছিলেন তাতো রীতিমত কিংবদন্তী হয়ে আছে। এসব কথা খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তারপরেও জেহাদকারীদের বদনামের অন্ত নেই। কারণ তারা আজ অন্ত্যজদের দলে। দুনিয়ার ক্ষমতার পালাবদলে তারা ছিটকে পড়েছেন। এই সুযোগে ক্রুসেড আবার ফিরে এসেছে। প্রেসিডেন্ট বুশ মধ্যযুগ থেকে সেটি আবার নিয়ে এসেছেন একালে।

৪

জেহাদ নিয়ে এই বিতর্কের যেন শেষ নেই। সাম্প্রতিককালে এই বিতর্ক আরো উপরে উঠে এসেছে। এর কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা এ বিষয়টি নিয়ে অহেতুক পানি ঘোলা করছে এবং ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার ঐতিহাসিক প্রয়াস আজও সমানে চলছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ লেখক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদরা কোরআন শরীফে বর্ণিত জেহাদের নীতিকে ভুল ও অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করে ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতার বিরুদ্ধে জেহাদরত দল ও গোষ্ঠীর চরিত্র হননের সর্বাত্মক চেষ্টা তারা চালিয়েছে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ইসলামের সমালোচনা করতে যেয়ে কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দেন, 'আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই ... ।' ঘটনার প্রেক্ষাপট না জেনে এবং পূর্বাপর আয়াতটি না পড়ে যে কোন লোকের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক এটি বুঝি একজন মুসলমানকে অমুসলমান হত্যার খোলাখুলি অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের

www.pathagar.com

লেখক, তাত্ত্বিকরা এমনকি মুসলিম দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ সেকুলারিস্ট লেখক, রাজনীতিবিদরাও কোরআন শরীফের অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে কৌশলে দেখাতে চান মুসলমানরা যে অসহিষ্ণু ও রক্তাশ্রয়ী তার কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থের উস্কানি। লয়েড জর্জের উদ্ধৃত আয়াতাংশ আমি পূর্বাপর উদ্ধৃত করছিঃ

'আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘণকারীদের পছন্দ করেন না।'

'আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি।'

'আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু।'

'আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)।'

(সুরা-২, আয়াত ১৯০-১৯৩)

এটা হত্যা ও ধ্বংসের কোন নির্দেশ নয়। এখানে যুদ্ধের কয়েকটা নীতির কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এ সব যুদ্ধের নির্দেশ প্রধানতঃ আত্মরক্ষার্থে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। আর কখনো নিপীড়িতের জন্য ত্রাণ করা প্রসঙ্গে জেহাদের কথা এসেছে। এসব কথা কোরআনে গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। যেমনঃ

'আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না, দুর্বল সেই সব পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।' (সূরা-৪, আয়াত-৭৫)

কিন্তু কখনো জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়নি। কোরআন শরীফে স্পষ্ট ফরমান এসেছেঃ 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই।' (সূরা ২, আয়াত-২৫৬)। তার মানে গায়ের জোরে কাউকে ধর্মান্তরিত করা চলবে

www.pathagar.com

না। পরাজিত শক্তি তার নিরাপত্তার জন্য ইসলাম গ্রহণ করবে এমন কথা কোথাও আসেনি। আজকে সেকুলার বলে পরিচিত পশ্চিমা বিশ্ব সেখানকার অভিবাসী সংখ্যালঘু মুসলমানদের সেটুকু স্বাধীনতা দিতে রাজী হবেন না, যেটুকু ইসলাম অমুসলমানদের দিয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ বলে পরিচিত ফ্রান্সের অভিবাসী মুসলমান মেয়েদের হিজাব পরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সেখানকার সরকার কি ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেয়নি?

এবার দেখা যাক জেহাদ শব্দটার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্বের দিকটা। আগেই বলেছি যে, ঐতিহাসিক কারণে সাম্রাজ্যবাদ জেহাদ ব্যাপারটিকে সবচেয়ে কলুষিত করেছে। এসব তর্ক খুব বেশি উঠেছিল যখন এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম অঞ্চলগুলো সাম্রাজ্যবাদের পদানত হয়। আমাদের ভারতবর্ষে ইংরেজের হাতে যখন মুসলমান শাসকরা পরাজিত হন তখন ভারতের মুসলমানরা দীর্ঘ একশ বছর ধরে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এসবের মধ্যে উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদ ও বাংলাদেশের তিতুমীর এবং হাজী শরীয়তুল্লাহর লড়াই খুবই বিখ্যাত। এসব যুদ্ধকে এক ধরনের জনযুদ্ধ (Peoples war) বলা যায় এবং এর জনপ্রিয়তা ও গণআবেদন ছিল প্রচুর। এসব লড়াইকে তখন বলা হতো জেহাদ। এসব লড়াইয়ের ফলে ইংরেজকে প্রচুর খেসারত দিতে হয়েছিল এবং সেই কারণেই পররাজ্য লুণ্ঠনকারী ইংরেজ জেহাদ ও জেহাদকারীদের বিরুদ্ধে সামরিক ও মিডিয়া উভয়বিধ যুদ্ধই চালিয়েছিল। স্মরণ যোগ্য ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ কর্তব্য কিনা এই বিচার পাওয়ার জন্য সৈয়দ আহমদ মক্কা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। শুধু সৈয়দ আহমদ নয়, সেদিন ভারতবর্ষের বহু মনস্বী আলেম ওলামারাই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইকে ফরজ হিসেবে গণ্য করেছিলেন এবং সেই হিসেবে তারা সেদিন ভারতবর্ষকে দারুল হর্ব ঘোষণা করেছিলেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের আজাদী সংগ্রামের এই গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস যথাযোগ্য গুরুত্ব ও মর্যাদা পায়নি। সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী 'আধুনিক' 'প্রগতিশীল' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' লেখকরা স্বাভাবিক কারণে এসব লড়াইকে গুরুত্বহীন করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। মনে রাখা দরকার আজকালকার মৌলবাদ শব্দটার মতো সেকালের ওহাবী শব্দটাও একটা গালি। সৈয়দ আহমদ ও তিতুমীরের নাম তাই ইংরেজ ও তার বংশবদ লেখকেরা ঘৃণায় মুখে আনবার চেষ্টা করেননি। পরবর্তীকালের প্রগতিশীল লেখকরা সে নীতি অনুসরণ করে গেছেন মাত্র। ওহাবীদের জেহাদ নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু গোল বাধিয়েছিল ইংরেজ স্বয়ং। ওহাবীদের সাথে যুদ্ধে নাকানি চুবানি খেয়ে তারা এসব জনযুদ্ধকে স্তিমিত করার জন্য ভিন্ন একটা কৌশল ধরলো। মুসলমানদের ভিতর থেকেই একদল

www.pathagar.com

নেতৃস্থানীয় অথচ ইংরেজ অনুগত ব্যক্তিকে তারা বাছাই করলো এবং তাদের মুখ দিয়ে ইংরেজ শাসনকে জায়েজ ঘোষণা করার ফতোয়া দেয়ানো হলো। এইভাবে জেহাদের সাথে সাথে ইসলামের একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান ফতোয়াও সেদিন বিতর্কিত হয়ে উঠলো। আলীগড় খ্যাত সৈয়দ আহমদ খান ও তার বন্ধু চিরাগ আলী এবং আমাদের বাংলাদেশের নওয়াব আব্দুল লতিফ ও কারামত আলীরা ইংরেজের সাথে সহযোগিতার সূত্রে জেহাদ আন্দোলন সঠিক নয় বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই এইসব মনস্বী ব্যক্তিরা তাদের সময় ও অবস্থানে বসে যে কাজটি করেছিলেন তা যদি প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে বিশ্লেষণ করতে যাওয়া হয় তবে তাদের প্রতি বেঈনসাফী হবে। তারা যখন দেখেন দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংগ্রাম করে ইংরেজকে পরাস্ত করা গেল না, উল্টো অধিকতর শক্তিশালী ইংরেজ মুসলমানদেরকেই নিশ্চিহ্ন হবার দোর গোড়ায় পৌছে দিল তখন তারা ইংরেজের সাথে সহযোগিতার কথা বলেছিলেন। তাদের এই কৌশল কি জেহাদেরই একটি ভিন্ন কৌশল ছিল কিনা তা ভাবা যেতে পারে। কারণ লক্ষ্যটাই আসল। কে কোন কৌশলে লক্ষ্যে পৌছল সেটা অনেক সময় জরুরি নয়।

জেহাদ আর ফতোয়া নিয়ে একই রকম বিতর্ক উঠেছিল আলজেরিয়ায়। সেখানকার ফরাসি দখলদারদের বিরুদ্ধে আবদুল কাদেরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জেহাদ আন্দোলন নিয়ে এরকম ফতোয়া ও প্রতি ফতোয়ার নজীর আমরা দেখেছি। ভারতবর্ষের মতো সেখানেও প্রশ্ন উঠেছিল ফরাসি দখলদারিত্বে থাকা আলজেরিয়া কি দারুল হরব, যদি দারুল হরবই হয় তবে সেখান থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে যাওয়া জরুরি কি না এবং বিধর্মী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য কি না। এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সেদিনের ওলামারাও একমত হতে- পারেননি। ঘটনার বাস্তবতা, জটিলতা ও ভয়াবহতা তাদেরকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছিল। একদিকে সামরিক ও প্রাযুক্তিকভাবে অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদের সাথে লড়াইয়ে জেতার সম্ভাবনা যেমন কম তেমনি বিধর্মীদের আনুগত্য করাও অসম্ভব – সেদিনের মত এরকম বিশ্রী ও দুর্বিষহ অবস্থার নতুন চেহারা দেখছি আজকের ইরাকে। সেখানে একদল মুসলমান মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদে লিপ্ত। আর একদল মুসলমান মার্কিন বাহিনীর সাথে সহযোগিতার সূত্রে ক্ষমতায় যেয়ে ইরাকের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী। এ দুটোর কোনটি ঠিক তা বলা কঠিন। হয়তো দুটোই ঠিক। অথবা দুটোই ভুল। ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ অবশ্য কর্তব্য এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কৌশল নির্ধারণ হচ্ছে বড় কথা। এ পরিস্থিতিতে বিশ্ব মুসলমানের নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাবিদদের ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্তে আসা দরকার। এই ঐক্যই আজ বিশ্ব মুসলমানের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আগেই বলেছি সেটাই বড় জেহাদ।

www.pathagar.com

জেহাদের মতো ফতোয়া নিয়েও সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণার অন্ত নেই। কারণ এই ফতোয়া দিয়েই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করা হয়েছিল। এখনও সে প্রক্রিয়া কমবেশি চলছে। সাম্রাজ্যবাদের মতো সাম্রাজ্যবাদপন্থী মুসলিম দেশের সেকুলার রাজনীতিক ও লেখকরাও ফতোয়া শব্দটাকে আক্রমণ করেন জঘণ্যভাবে। আমাদের এখানে 'ফতোয়াবাজ' শব্দটা চালু হয়েছে এদেরই কল্যাণে। এ শব্দটা এখন গালি। মনে রাখা দরকার দু একটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলিম দেশের সেকুলার শক্তি আজকাল সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ ও তল্পীবাহক। এদের অবস্থা সেই ইংরেজি প্রবাদের মতো ঃ More Christian than the Pope.

ইসলামী আইনে ফতোয়া হচ্ছে ঃ কাজী, বিচারপতি বা ব্যক্তি বিশেষের প্রশ্নের উত্তরে মুফতী বা ইসলামী আইনে পারদর্শী ব্যক্তির বিধিসম্মত আইন সংক্রান্ত অভিমত। এই অভিমত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় উদ্ভুত নানা সমস্যা নিয়ে হতে পারে। ফতোয়া যেমন হুকুমনামা নয় তেমনি ফতোয়াদাতার তা কার্যকর করার কোন ক্ষমতা নেই। কার্যকর করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের নিয়োগকৃত কোন প্রতিনিধির। সাধারণতঃ রাষ্ট্রের বিচার বা প্রশাসনিক বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিরা এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ইসলামী ইতিহাস জুড়েই আইন বিষয়ক সমস্যায় ফতোয়া দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হয়ে আছে। সুলতান, কাজী, বিচারকের দরবারে ধারা অনুসারে ফতোয়া জারি করতেন মুফতী বা আইন বিশারদ। এদিক দিয়ে মুফতীরা ছিলেন সুলতান বা কাজীর আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অনেকটা সাহায্যকারী। ইসলামের ইতিহাসে ফতোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এভাবে যে এটি ইসলামী আইনের চলমানতাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। সময়ের পরিবর্তনে নতুন নতুন আইনের দরকার হয়েছে। ইসলামী আইনের মূল উৎস কোরআন ও হাদীস ঘেঁটে তার আলোকে আইন প্রণয়ন করতে এই মুফতীরাই সাহায্য করেছেন। এইভাবে ইসলামী আইনের সৃজনশীলতা সব সময় অব্যাহত থাকে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সব সময় মুফতীরা একরকম ছিলেন। কোন কোন সুলতান বা রাজা বাদশাহদের চাপে তাদের ইচ্ছামতো ফতোয়া দিয়েছেন অনেকে। এতে ক্ষমতাবান ব্যক্তির যেমন সুবিধা হয়েছে তেমনি নির্দিষ্ট মুফতীরও কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। এ হচ্ছে ঘটনার একটি দিক। এর অর্থ এই নয় ফতোয়ার কার্যকারিতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইসলামের ইতিহাসে এর বিপরীত ছবিও আছে ভুরি ভুরি। ক্ষমতাবানদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাদের স্বার্থের বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন এবং নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছেন

www.pathagar.com

এমন নজীরও অপ্রতুল নয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মুজাদ্দেদ আলফেসানীর কথা আমরা বলতে পারি

রসূল স. বলেছেন, অত্যাচারী শাসকের মুখের উপর সত্য কথা বলাই শ্রেষ্ঠ জেহাদ। সেদিক দিয়ে এইসব আলেমরা জেহাদের শ্রেষ্ঠতম পরীক্ষাই দিয়ে গেছেন।

ইসলামী যুগের শেষে মুসলিম দুনিয়ায় যখন কলোনির যুগ এলো তখন অবস্থার পরিবর্তন হলো প্রচুর। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইনের কার্যকারিতা কমে গেল। তখন মুফতীরাও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরাসরি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ফতোয়া দিতেন। মুসলমানরাও এটিকে উপদেশ হিসেবে স্বাগত জানাতো। ব্যক্তিগত ফতোয়া কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। যখনই ফতোয়া রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে জড়িয়ে হতো তখনই সমস্যা সৃষ্টি হতো। কারণ রাষ্ট্র ইসলামী আইনে চলতো না, কিন্তু ব্যক্তি মুসলমান। সে ধর্মের অনুজ্ঞা পুরোপুরি মেনে চলবে, না রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করবে। মুসলিম দেশগুলোতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই দ্বন্দ্ব আজও বর্তমান। কেন না এসব রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে স্বাধীনতা পেলেও আইনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীন হয়নি। আজও এসব রাষ্ট্রে পুরনো উপনিবেশিক সেকুলার আইন কার্যকরী রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া এ দ্বন্দ্বের অবসান হওয়ার সম্ভাবনা কম। বাংলাদেশের হাইকোর্ট ২০০১ সালের ১ জানুয়ারী ফতোয়া দেয়ার বিধানকে বেআইনী ঘোষণা করেছিলেন। আমি বলবো এটা মুসলিম বিশ্বের চলমান ধর্ম ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের একটা প্রকাশ। এই রায়ের পর এখানকার সেকুলার রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি কর্মীরা উল্লসিত হন। তারা মনে করেন এটা নাকি আমাদের সমাজের আধুনিকীকরণের পক্ষে এক বিশাল পদক্ষেপ। সেই পুরনো পশ্চিমা প্রচারণা। ধর্মকে কোণঠাসা করা এবং হুবহু পশ্চিমা আইন ও সংস্কৃতি গ্রহণ করার যে আধুনিকীকরণ তা আসলে এক প্রকার পশ্চিমাকরণও। আমরা আধুনিক হতে চাই কিন্তু মোটেই পশ্চিমাকৃত নয়। আমাদের আধুনিকতা আমাদের সংস্কৃতি, জীবন দর্শন ও মূল্যবোধকে অতিক্রম করে নয় মোটেই। বিচারপতিদ্বয় তাদের রায়ে বলেছেন, আদালতই মুসলমানদের বিষয়ে আইনের অভিমত নিয়ে সব প্রশ্নের মীমাংসা করবে। অন্য কেউ নয়। হক কথা। সেক্ষেত্রে আদালতকে মতামত নিতে হবে মুফতীদের কাছেই। ফতোয়া নিষিদ্ধ করলে কে মতামত দেবে আর তাতে তো ইসলামী আইনের বিবর্তন ও বিকাশ বন্ধ হয়ে যাবে। অথবা বিকল্প হিসেবে আদালতের বিচারকদের ইসলামী আইনে সুপণ্ডিত হতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রের বিচারকরা ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ হবেন না এ অনেকটা রোম দেশে রোমানদের মত না আচরণ করার মতো। বিচারপতিরা যেটা পারতেন সেটা হলো ফতোয়াদাতার যোগ্যতার সীমা নির্ধারণ করে দিতে, যাতে দায়িত্বহীনভাবে ফতোয়া

www.pathagar.com

না আসে কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফতোয়ার ব্যবস্থার জন্য সরকারকে সুপারিশ করতে। তা না করে তারা ইসলামের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে অনাকাঙ্খিতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। একালে ফতোয়া নিয়ে সবচেয়ে বেশি হৈচৈ হয়েছে ইমাম খোমেনী কর্তৃক সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে জারিকৃত দণ্ড নিয়ে। এ ফতোয়া নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব তাদের স্বভাবসুলভ লেখকের স্বাধীনতার ধুয়া তুলে অনেক শোরগোল করে। কিন্তু সালমান রুশদীর আপরাধকে তারা নজরে আনে না। ইমাম খোমেনীর এ ফতোয়ার বিরুদ্ধে সৌদী আরবের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ও কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমরা পাল্টা ফতোয়া দেন এবং বলেন ঘটনাটি বেআইনী ও বেইসলামী। বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া মুসলমান আইন অনুমতি দেয় না এবং ইসলামী দুনিয়ার বাইরে এর এক্তিয়ারও নেই। এমনকি ১৯৮৯ সালের মার্চ ইসলামী সম্মেলনে ৪৫টির মধ্যে ৪৪টি মুসলমান রাষ্ট্র একমত হয়ে এই বিধান নাকচ করে। ইসলামী সম্মেলনের সিদ্ধান্তে সত্যতা ছিল কিন্তু পুরোপুরি কি সঠিক ছিল? কারণ ইমাম খোমেনীর ফতোয়া তারা বাতিল করেন এটি কার্যকরী করার কতকগুলো টেকনিক্যাল অসুবিধার দিক উল্লেখ করে। কিন্তু যদি সত্যিকার অর্থেই সালমান রুশদীকে যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এনে তার অপরাধের দণ্ড দেয়া হতো সেক্ষেত্রে কি পাশ্চাত্যের নেতারা এসবের সমালোচনা থেকে বিরত থাকতেন? রুশদীর অপরাধ যে শাস্তিযোগ্য একথা কি পাশ্চাত্য কবুল করে নিতো? কখনোই না। তাহলে কি সৌদী আরব ও মিসরের আলেমরা এবং কতকক্ষেত্রে ওআইসি পাশ্চাত্যকে একটা বড় ধরনের ছাড় দিয়েছিল? কারণ ফতোয়াটি এসেছিল এমন একটা দেশ থেকে যা ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী। পাশ্চাত্যকে ছাড় দিয়ে মুসলিম বিশ্ব তাদের অনুগ্রহ লাভ করবে এ ধারণা মস্তবড় ভুল।

৬

এ কালের প্রেক্ষিতে জেহাদ ও ফতোয়ার ধারণার পূণর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বহুকাল ধরে মুসলমানরা জীবনের বহুমূখী সংগ্রাম ও সাফল্যের ধারা থেকে পিছিয়ে পড়েছে। পরাজয়, হতাশা, ব্যর্থতা তাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠেছে। এরকম একটা অবস্থা এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দিতে পারে। যে বিচ্ছিন্নতা কারো কারো মধ্যে নিয়ে আসতে পারে এক ধরনের উগ্রচিন্তা ভাবনা বা জঙ্গিপনা। মুসলিম দুনিয়ার বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্রতম এই জঙ্গি গোষ্ঠীকে নিয়েই পাশ্চাত্য তিলকে তাল করে। এসব বিচ্ছিন্ন জেহাদীরা কোরআন হাদীসের ভাসা ভাসা আক্ষরিক অর্থ নিয়ে ধর্মের এক অতি সরলিকৃত ধারণা গড়ে তোলে। ফলে এভাবে ইসলামকে একটি অবক্ষয়ী আদর্শের সহায়ক হিসেবে তারা নির্মাণ করে

www.pathagar.com

চলেছে, কিন্তু এটা তারা বুঝতে পারছে না। ধর্মের জন্য তারা কাজ করে এমনকি জেহাদ করতে প্রস্তুত, এ কথা তারা বলে এবং কথায় কথায় ভিন্নমতালম্বীদের নিন্দা এমনকি তাদের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চায় না তারা। ফলে অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে মতাদর্শের তারা নিন্দা করে প্রকারন্তরে তাদের কার্যকলাপ সেই মতাদর্শের পক্ষে যায়। এমনকি তাদের আবেগকে ব্যবহার করে ইসলামের শত্রুরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা তারা বুঝে উঠতে পারে না।

মুসলিম দেশের পণ্ডিত ও রাজনীতিকদের ভূমিকা এখন তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসলামের মধ্যে এসব বিচ্যুতি ও স্খলনকে রুখবার জন্য তাদের এগিয়ে আসা দরকার। না হলে ইসলামের সামাজিক সংহতি দুর্বল হয়ে যাবে। মুসলিম পণ্ডিত ও রাজনীতিকদের যেমন একদিকে যারা হিংস্রতাকে জেহাদের সমতুল্য বানাতে চায় তাদের প্রতিরোধ করতে হবে তেমনি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা যারা মুসলিম বিশ্বের বন্ধুত্ব নয়, আনুগত্য চায় তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধের কৌশল বের করতে হবে। কেননা সাম্রাজ্যবাদীরা সেকালের মত একালেও মুসলিম বিশ্ব মাথা তুলে দাঁড়াক, ঐক্যবদ্ধ থাকুক ও সমৃদ্ধতর হোক এটা কোন অবস্থায় চায় না। তাই মুসলিম পণ্ডিত ও রাজনীতিকদের এই দ্বিমূখী জেহাদে নেমে পড়া আশু কর্তব্য।

ঐতিহাসিক কাল ধরে জেহাদের ধারণা একদিকে সশস্ত্র যুদ্ধ অন্যদিকে আত্ম শোধনের ভাবনার মধ্যে পড়ে আছে। জেহাদের এই ডাইমেনশনকে আরো বিস্তৃত করে মুসলমানের জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করা চাই। নিজের ভিতরের 'বড় জেহাদই' ঠিক করে দেবে 'ছোট জেহাদের' পদ্ধতি ও লক্ষ্যকে। এটাও আমাদের বোঝা দরকার আণবিক অস্ত্র ও নানা রকম গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রে সজ্জিত আগ্রাসী পশ্চিমের মোকাবেলায় বিচ্ছিন্ন দু'একটি হামলা কিংবা বোমাবাজী করে সমস্যার উত্তরণ ঘটবে না এবং কোন নিরীহ মানুষকে নাজেহাল করা ইসলাম অনুমোদিত নয়। যে প্রাযুক্তিক, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাদীক্ষার উৎকর্ষতার জোরে পাশ্চাত্য আজ মুসলিম দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে তাকে করায়ত্ত্ব করা দরকার। প্রশ্ন উঠতে পারে সেই প্রযুক্তি করায়ত্ত্ব করতে গেলেও তো পাশ্চাত্যের চোখ রাঙানি, ধমকানি আর শাসানি এগিয়ে আসবে। আবারও বলছি মুসলিম বিশ্বের ঐক্যকে যদি অটুট রাখা যায় তবে পাশ্চাত্যের চোখ রাঙানি কোন কাজে আসবে না। আমাদের অনৈক্যই সাম্রাজ্যবাদীদের বড় অস্ত্র।

মুফতী বা ফকীহদের আজ এগিয়ে আসা দরকার জেহাদের এই নতুন তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করতে এবং এগিয়ে নিতে। মুফতীদের আজ বলতে হবে কি করে ইসলামের ভিতরের বিচ্যুতি অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের চোখ রাঙানিকে ফিরিয়ে দেয়া যায়। মুসলমানের জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার ফতোয়া আজ দরকার। এই জীবন সংগ্রামী ও জীবনবাদী ফকীহ এবং মুফতীদের জন্য আজ আমরা অপেক্ষা করছি।

www.pathagar.com

উদারনৈতিক ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদ

পশ্চিমা গণমাধ্যমের সূত্রে আমরা এখন ইসলামের নানারকম প্রকারভেদের সঙ্গে পরিচিত। এর একদিকে আছে লিবারেল ইসলাম, সেকুলার ইসলাম, মডারেট ইসলাম। অপরপ্রান্তে আছে ফ্যানাটিক ইসলাম, মিলিট্যান্ট ইসলাম, এক্সট্রিমিস্ট ইসলাম ইত্যাদি। ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীর ভেতরে এ রকম শ্রেণী বিভাজনের ঘটনা একদিনে ঘটেনি। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন মুসলিম সমাজের ভেতরে বড় রকমের ভাংচুর ও টানাপোড়েনের সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, মুসলিম চিন্তার জগতেও সংকটের ব্যাধি বিস্তৃত হয়। আজকের দিনে তামাম ইসলামী দুনিয়ায় যে বিবাদ-বিসম্বাদ, শ্রেণী বিভাজন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য–তার মূলে আছে ঔপনিবেশিক শাসনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। তবে পশ্চিমের মিডিয়া, নীতিনির্ধারক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী মুসলিম সমাজের সেই অংশকে অনুমোদন দেয়, যারা নাকি তাদের চিন্তাভাবনার যুগপৎ অনুকরণ, বাস্তবায়ন ও সমর্থন করে। এরাই মুসলিম সমাজে লিবারেল-উদারনীতিক হিসেবে পরিচিত। আজকের দিনে এই শ্রেণীটি মুসলিম সমাজে পশ্চিমা গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারীবাদ, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করে। এরা পশ্চিমের সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুভব করে এবং পশ্চিমকেই যাবতীয় উন্নতি-প্রগতির মডেল হিসেবে মান্য করে। এদের কথা হচ্ছে, মুসলিম সমাজের সত্যিকার উন্নতির জন্য পশ্চিমা আধুনিকতা ও মূল্যবোধকে ইসলামের ভেতর জায়গা দেয়াই ভালো। কারণ আধুনিকতা, বিশ্বায়ন, তথ্য-প্রযুক্তির মতো নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখে এবং মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার প্রেক্ষাপটে 'উন্নত' পশ্চিমের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করাই ভালো। আসলে মুসলিম সমাজের এই অংশ এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক গোলামির মধ্যে আটকে গেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা বলতে তারা মুসলিম ঐতিহ্যের কাছ থেকে মুক্তিই বুঝিয়ে থাকে এবং ইসলামী মূল্যবোধকে মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচনা করে। এই কারণে পশ্চিমা নীতিনির্ধারকরা মুসলিম

www.pathagar.com

সমাজের লিবারেল অংশকে খাতির করে; কারণ তারা জানে, এরাই তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থ দেখভাল করবে।

মুসলিম সমাজের অপর অংশ, যাদেরকে অহর্নিশ বর্বর, অসভ্য, ধর্মান্ধ, জঙ্গি ইত্যাদি বলে গাল দেয়া হয়, তাদের প্রতি পশ্চিমের এত গোস্বার কারণ তারা শিল্পতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সভ্যতাকে মানব মুক্তির একমাত্র মডেল মনে করে না এবং ওই সভ্যতার মূল্যবোধকেও সর্বজনীন হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ হিসেবে ইসলামকে ভিত্তি করে জগৎবিচারের ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গির লালন ও অগ্রায়নে তারা বেশি পরিমাণে আগ্রহী।

মুসলিম সমাজের উদারনীতিক অংশ এক অর্থে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সহযাত্রী। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের তো এরা বিরোধী নয়ই—এরা এর দ্বারা মোহাবিষ্ট। বাঙালি মুসলিম সমাজে উদারনীতির প্রথম পরিস্ফূটন ঘটে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ভাবুকদের হাতে। এরা সমাজ সংস্কারের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেটা বিদ্যমান ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে এবং কোনো সমাজ বিপ্লবকে সমর্থন না করে। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কাণ্ডারী ওদুদ সাহেবরা সিপাহী বিপ্লবকে সমর্থন করেননি, ওহাবীদের স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই-সংগ্রামকে প্রাগ আধুনিক মোল্লা শ্রেণীর কাণ্ড-কারখানা হিসেবে সমালোচনা করেছেন। ওদুদ সাহেবদের প্রগতিশীল আন্দোলন কিন্তু কখনোই সাম্রাজবাদবিরোধিতায় রূপ নেয়নি। ওদুদ সাহেবদের সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ছিল, ইসলামকে পশ্চিমের সামনে 'সহনশীল'-'সভ্য' করে তোলার প্রয়োজনে নাক-মুখ-কান ছেঁটে দিয়ে এর নৈতিক ভিত্তি দুর্বল করে দেয়া।

সেদিনের মতো মুসলিম দুনিয়ায় ওদুদ সাহেবের মতানুসারী লোকের সংখ্যা মোটেই কম নয়। এদের কথা হলো, পশ্চিম আজ অপ্রতিরোধ্য। তার সামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আদর্শিক সামর্থ্য আজ এক বাস্তবতা। দুনিয়াজুড়ে পশ্চিম এক অভাবনীয় রূপান্তর সাধন করে ফেলেছে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠী যদি নিজেকে যথোপযুক্তভাবে যুক্ত করতে না পারে, তাহলে তারা যুগের রাজপথ ধরে হাঁটতে পারবে না। তারা কেন্দ্র থেকে প্রান্তে নির্বাসিত হবে।

www.pathagar.com

মোট কথা, পুরো ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশ-উত্তর যুগে মুসলিম সমাজের উদারনৈতিকদের কাছে একমাত্র প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, কিভাবে ইসলামকে পশ্চিমা আধুনিকতার সঙ্গে মানানসই করে তোলা যায়। এই মানানসই করতে গিয়েই তারা ইসলামী ব্যবস্থার সংস্কার করে পশ্চিমা সভ্যতার উপযোগী করে তোলার কথা বলেন।

আসল কথা হচ্ছে, মুসলিম সমাজের এই 'উদারনৈতিক' 'প্রগতিশীল', 'আলোকপ্রাপ্ত' অংশ এক ধরনের অনুকরণ, হীনম্মন্যতা, নির্ভরশীলতা, দাস্য ও পরাজিত মানসিকতার জন্ম দিয়েছে, যা আজ মুসলিম দুনিয়ায় মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এই উদারনৈতিকরাই ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকতার প্রতাপে গত এক থেকে দেড় শতাব্দী মুসলিম সমাজের নেতৃত্বে বসে আছেন; কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপত্র ও পরিকল্পনা মুসলিম সমাজের ভাগ্যের তো পরিবর্তন করেইনি বরং তারা দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অনুন্নয়নের চক্রের মধ্যে যেমন পড়ে আছে তেমনি এর থেকে পরিত্রাণের জন্য পাশ্চাত্যের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ছুটোছুটি করছে। আজকের মুসলিম সমাজের সামনে পাশ্চাত্যের বৈরীতার চেয়ে উদারনৈতিকদের ব্যবস্থাপত্র বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য এটি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম দুনিয়ার উদারনৈতিক ও প্রগতিশীলদের আমলনামা পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

একালে মুসলিম সমাজের উদ্যমহীনতার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই দাস্য মানসিকতা। জার্মান নও-মুসলিম সুপণ্ডিত মুরাদ হফম্যান মনে করেন, এই মানসিকতাই উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়াকে নানা আদলে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং এটি হচ্ছে আমাদের অনুন্নয়নের প্রধান কারণ। তার নিজের কথা হচ্ছে এ রকমঃ

...এর (ঔপনিবেশিকতা) দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার চেয়ে বরং মানসিক ঘাটতিই প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশায়নকে টিকিয়ে রেখেছে...

যদি এ ধারণা সঠিক হয়, তবে মানসিকতা পরিবর্তনের মধ্যেই উন্নততর বিকাশের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যাবে, এটা অর্জন করা খুবই কষ্টসাধ্য। ...এই চেষ্টা ছাড়া মুসলিম জাহানের অধিকাংশ শুধু অনুন্নত এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীলই থেকে যাবে না; আরও খারাপ

www.pathagar.com

ব্যাপার হচ্ছে, আমরা সবাই বিশ্বায়িত, অর্থাৎ আরেকবার উপনিবেশায়িত হয়ে যাব। এবার মুসলমানরা রাজনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক ক্রীতদাসে পরিণত হবে।

হফম্যান বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন, এককালের অনুন্নত মুসলিম দেশগুলোকে আজকাল আদর করে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ডাকা হচ্ছে। কিন্তু এই উন্নয়নের উদ্দেশ্য কী এবং তার গতিপথ কোন দিকে? সত্য বটে, কিছু কিছু মুসলিম দেশ তথাকথিত প্রথম বিশ্বকে অনুকরণ করে বস্তুগতভাবে কিছুটা এগিয়েছে; কিন্তু সেখানে আমাদের মৌলিকত্ব ও আত্মপরিচয়টা কোথায়?

এই সব পশ্চিমা ভাবাশ্রিত 'উদারনৈতিক', 'আধুনিক', 'আলোকিত' ইসলামের বয়ান ও বিশ্লেষণ শেষতক ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের উপর জোর দেয়, পশ্চিমা ধাঁচের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল খাড়া করে এবং সেকুলার জাতি-রাষ্ট্রের কথা বলে। এই পশ্চিমা ধাঁচের বয়ানের প্রতি যারা অনুরক্ত, তারা ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধানের অনুসরণকে মধ্যযুগীয় ও অতীতচারিতা হিসেবেও দোষারোপ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ-ফরাসি চক্রান্তে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন ও খণ্ডীকরণের প্রেক্ষাপটে আরব ও তুর্কি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। তাহা হোসেন, লুৎফি সৈয়দ, আলী আবদুর রাজিক প্রমুখ বুদ্ধিজীবী মিসরীয় জাতীয়তাবাদ ও ইউরোপীয় পথে সংস্কার সাধনের পক্ষে মত দেন এবং খেলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আজকের দিনে ঐতিহাসিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে উল্লেখ করেন। কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে ইউরোপীয় আধুনিকতার পক্ষপাতী তুর্কি জাতীয়তাবাদীরা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা, আইন, শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে, জনজীবন থেকে ইসলামকে সরিয়ে দিয়ে ইউরোপীয় পজিটিভিস্ট শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এভাবে মুসলিম দুনিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতাদের একটা বড় অংশ ইউরোপীয় পথে সংস্কারে উদ্যোগী হন। মিসরের নাসের, ইরানের রেজা পাহলভি, ইরাকের কাশেম, তিউনিসিয়ার হাবিব বরগুইবা, আলজিরিয়ার বেনবেল্লাহ, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ প্রমুখের সংস্কার প্রচেষ্টা মূলত এক ধরনের পশ্চিমা অনুকরণ ছাড়া কিছু নয়। শুধু

www.pathagar.com

তাই নয়, এই তথাকথিত 'আলোকিত' শাসকরা পশ্চিমের স্বার্থে নিজ নিজ দেশকে একটা দমনযন্ত্র ও নিপীড়নের হাতিয়ার বানিয়ে ফেলেছে। এসব সেকুলার, অপদার্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতার কল্যাণে মুসলিম দুনিয়া মাথা তুলে দাঁড়ায়নি, পশ্চিমা বিশ্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং এদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব পশ্চিমা দুনিয়ার সামনে আজ রীতিমত প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে উঠেছে।

উদারনীতির সমস্যাটাই হচ্ছে এটি আধুনিকতা ও পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা এতখানি মোহাবিষ্ট যে, এরও নির্মোহ সমালোচনার প্রয়োজন আছে–তা উদারনীতিকরা স্বীকার করতেই চায় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই উদারনীতিকরা পশ্চিমের অন্ধ অনুকারী ও খয়ের খাঁ। এই উদারনীতিক মুসলিমরা জগৎ বিচারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটার পরিবর্তে পশ্চিমের অনুকরণের পথ নিয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পশ্চিমা আধুনিকতা নিজেই আজ মহাসংকটের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। এসব সংকটের অনেক কিছুই আমরা জানতে পেরেছি ষাটের দশকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের পণ্ডিতদের লেখালেখি থেকে। এসব লেখালেখিতে ইউরোপের তথাকথিত এনলাইটেনমেন্টকে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে। ফ্যাসিজম, নাজিজম, জায়নিজম, স্ট্রাকচারালিজমের মতো নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী মতবাদগুলোও আধুনিকতার শরীর ফুড়েই বের হয়েছে। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, আজকের দিনের আলোকিত, যুক্তিবাদী সময়ের পথিকৃৎরা গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র উৎপাদনে যেমন ক্লান্তিহীন, তেমনি দুনিয়াজুড়ে প্রাণের সংকট সৃষ্টি করেও তাদের কোনো কুণ্ঠা নেই। তারপরও উদারনীতিকদের আদিখ্যেতা দেখে শরমে মাথা হেঁট হয় এবং তারা আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিরবধি মান্য করে চলার ব্রতে আপসহীন। এই মান্যতার কারণেই তারা ইসলামকে আক্রমণ করে, ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীর নীতি-নিয়মকানুনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় এবং যারা ইসলামী চিন্তার জগতকে বিভিন্ন সময় ফলবান করে তোলার চেষ্টা করেছেন তাদের এক হাত নেয়। তাদের একটাই কথা, ইসলামকে আশ্রয় করে কোনো প্রগতি ও উন্নয়নের মডেল প্রতিষ্ঠা করার সম্ভব নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, উদারনীতিক বয়ান ইসলামের বিশ্বচিন্তাভিত্তিক নয়, এমনকি এটা মুসলিম সভ্যতার বিকাশে

www.pathagar.com

বড় কোনো অবদান রাখেনি। এর একটাই উদ্দেশ্য, মুসলিম সমাজের প্রগতির কথা বলে ইসলামকে পাশ্চাত্যের অনুকারী সভ্যতায় পরিণত করা। উদারনীতিকদের যুক্তি ভিত্তিহীন এই কারণে, ইতিহাস থেকে দেখছি, ইসলাম তার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে প্রথমে ব্যক্তিকে পরিবর্তন করে, তারপর সমাজ রূপান্তর করে, সর্বশেষে ইসলামী সভ্যতার পত্তন ঘটেছে কোনো ধার করা উপকরণ দিয়ে নয়। এমনকি পশ্চিমা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বও ঝুটা কথা, তেমনি ইসলামের জন্য এটা একটা হুমকি সেটাও–অতি কথামাত্র। ইরানি বুদ্ধিজীবী হামিদ আলগার উদারনীতিকদের সাচ্চা জওয়াব দিয়েছেন এভাবেঃ পশ্চিমা বিশ্বের বর্ণনা অনুযায়ী আধুনিক সভ্যতার কাছ থেকে কোনোরকম বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হওয়া দূরে থাকুক, ইসলাম বরং বলা যায়, সেই দুনিয়ার ক্ষয়িষ্ণু মান ও মূল্যবোধ এবং ক্রমবর্ধমান বিভ্রান্তির প্রতি গুরুতর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। দর্শনের দিক থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত পশ্চিমের পক্ষ থেকে এই ধর্মকে দেয়ার মতো তেমন কিছুই নেই, যার শক্তি নিহিত আছে বিশ্বাস ও জীবন, চিন্তা ও কাজের ঐক্যের মধ্যে। ইসলাম আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পশ্চিমা ইহলৌকিকতার দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে। ইসলাম চরমের পক্ষ নিয়ে আপেক্ষিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে; বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী সচেতনতার সীমাবদ্ধতাকে নিজের অতীন্দ্রিয় বাস্তবতার সচেতনতা দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই চ্যালেঞ্জ নিছক কতিপয় বিপরীতের সমষ্টির মধ্যে নিহিত নয়, বরং এটা মৌলিকভাবে আলাদা বিকল্প বেছে নেয়ার বিষয়। মুসলমানরা নিজেরা যদি এই বেছে নেয়ার পরিণতি আরো ইতিবাচক ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রদর্শন করতে পারে, তবে এ ধরনের চ্যালেঞ্জের শক্তি সার্বিকভাবে বেড়ে যাবে।

পশ্চিমা আধুনিকতার অনুকরণ করলেই মানুষ তার প্রার্থিত মুক্তি পেয়ে যাবে–এর মতো বাজে কথা আর হতে পারে না। যারা খোদায়ী ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করেছে এবং সব রকমের নীতি ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়েছে তাদের তৈরি বিশ্ব ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও শান্তির আশা সুদূরপরাহত। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি জ্ঞানের স্পর্শ ছাড়া মানুষের কল্যাণে আসতে পারবে না। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই ধরনের

www.pathagar.com

বল্গাহীন, নীতিহীন বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত সমৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র ও শাসকের জন্ম দিতে পারে। গণতন্ত্রের আকার ও ধরন হয়তো টিকে থাকবে; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা চলে যাবে একটি ক্ষুদ্র কায়েমী স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীর হাতে। অর্থ, শিক্ষা, বিনোদনের মতো বিষয়গুলো বৈজ্ঞানিক কায়দায় সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত হবে।

আজকের পৃথিবীর নাগরিকরা কি সেই ভবিষ্যদ্বাণী হাতে হাতে ফলতে দেখছেন না? বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ হলো মানুষের নিকৃষ্টতম শত্রু। এমন ভয়াবহ সর্বনাশা শত্রুর মুখোমুখি বোধ হয় মানুষ আর কখনো হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ কী করতে পারে, আফগানিস্তান, ইরাক ও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে আজকে তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। আজকের প্রেক্ষিতে তাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা হচ্ছে সবচেয়ে প্রগতিশীলতা। আর উদারনীতিকতার আড়ালে যে প্রগতিশীলতার চর্চা এতদিন চলেছে, তা আসলে সবচেয়ে বড় প্রতিক্রিয়াশীলতা। সুতরাং গতকালের প্রগতিশীলদের কেউ কেউ আজ যদি তাদের অবস্থানগত কারণে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যান, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। সেই হিসেবে উদারনীতিকরা হচ্ছে এখনকার প্রতিক্রিয়াশীল; কেননা তারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক এবং আধুনিকতা নামক মানববিধ্বংসী প্রকল্পের সমর্থক। এই উদারনীতিকরাই মুসলিম দুনিয়ার সর্বনাশের জন্য দায়ী। কেননা তাদের প্রস্তাবিত মডেল মুসলিম সমাজকে অপমান, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পারেনি এবং মুসলিম সমাজের সত্যিকার উন্নতির ধারাও সূচনা করতে পারেনি। এটা বোঝার সময় এসেছে, বিদেশি সমাধান আসলে কোনো সমাধান হতে পারেনি। সুতরাং এসব সমাধানের আমদানিকারকদের হাতে মুসলিম সমাজের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। আজকের মুসলিম সমাজের ভেতর থেকেই এমন একটা আন্দোলন উত্থিত হওয়া দরকার, যাতে নবযুগের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তকরা এগিয়ে আসেন, যারা কিনা নিজের ইতিহাস, সমাজ ও বিশ্বভাবনার প্রেক্ষাপটে সমাধানের পথ বের করেন ও সমকালীন সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন। এই মুহূর্তে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে, আমাদের বর্তমান অবস্থা ও চিন্তাভাবনার পরিবর্তন। অন্য কথায় আমাদের জগৎবিচারের দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমাদের বিকল্প উত্তরণের পথ খুঁজে বের করা চাই।

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম

১.

মুসলিম দুনিয়ায় সেকুলার জাতীয়তাবাদের উত্থান ঔপনিবেশিকতার সূত্রে। জাতীয়তাবাদকে যদি আত্মপরিচয়ের সঙ্গে এক করে দেখা হয় তবে মুসলিমপ্রধান সমাজের পরিচয় এতকাল ইসলামের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হতো। কেবল ঔপনিবেশিকতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় পুঁজিবাদ অনুবর্তী যে সেকুলারিকরণের ধারা শুরু হলো তাই আজকের মুসলিম দুনিয়ায় আত্মপরিচয়ের সঙ্কটকে তীব্র করে তুলল। পশ্চিম এশিয়ার আরব জাতীয়তাবাদ বনাম ইসলামী শক্তিগুলোর দ্বন্দ্ব কিংবা আমাদের এখানকার বাঙালি জাতীয়তাবাদ বনাম মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মুখোমুখি অবস্থান কিন্তু সেই ঔপনিবেশিক সিলসিলার অংশ।

সেকুলার জাতীয়তাবাদ প্রথম থেকেই পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি-জীবনচর্যার সঙ্গে এক ধরনের মৌলিক আপস করে চলেছে, কারণ তার উদ্ভব ও বিকাশ পশ্চিমেই। তাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে সেকুলার জাতীয়তাবাদীদের অবস্থান ঠিক ইসলামিক শক্তিগুলোর মতো নয়। কারণ পাশ্চাত্যে শত শত বছর ধরে ইসলাম সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করা হয়েছে তার ফলে এসব দেশজ সেকুলার জাতীয়তাবাদীদের ভেতরও একটা সাম্প্রদায়িক চেতনা কাজ করে। বিশেষত যারা নিজেদের আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক এমনকি নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করেন তাদের মধ্যেই এই সাম্প্রদায়িকতা প্রবল। আধুনিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতি-রাষ্ট্রবিষয়ক ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সব কিছুই সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি, পশ্চিমা দার্শনিক ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ–এই সত্যটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিটা ধরতে পারব। এটাও বুঝতে পারব 'আধুনিক', 'সেকুলার' মানেই আমাদের এখানে কেন ইসলামবিরোধী হওয়া। কিন্তু আধুনিক হওয়া মানেই ধর্মনিরপেক্ষ কিংবা অসাম্প্রদায়িক হওয়া নয়। পশ্চিমা আধুনিকতাকে তার খ্রিস্টীয় মনোগাঠনিক ভিত্তি থেকে তফাৎ করা যায় না। আধুনিক হওয়া মানে আধুনিকতার সেই খ্রিস্টীয় সাংস্কৃতিক ও মনোগাঠনিক ভিত্তিকে একই সঙ্গে স্বীকার করে নেয়া। পাশাপাশি আমাদের দেশীয় আধুনিকতা যে

www.pathagar.com

ইসলামকে অস্বীকার করে মাথা তুলতে চেয়েছে সেটাও একই সঙ্গে কবুল করা। এই কারণেই সেকুলার জাতীয়তাবাদীরা পশ্চিমা পুঁজিবাদ, আধুনিকতা, প্রগতি, উন্নয়ন, বিকাশের ধারণার সঙ্গে ইসলামের বিরোধের জায়গাটায় তারা মূলত পশ্চিমেরই ধ্বজাধারী। কারণ সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ইউরোপীয় মডেলটির বিশ্বজনীনতার (?) তারা ঘোরতর সমর্থক। আজকের অনেক উত্তর-ঔপনিবেশিক, উত্তর-আধুনিকরা এই পশ্চিমা মডার্নিটির বিশ্বজনীনতাকে খারিজ করে এর অন্তর্গত হিংসা, জবরদস্তি, জাত্যাভিমান, আধিপত্য কায়েমের জালটি ফাঁস করে দিলেও এসব সেকুলারবাদীর আধুনিকতার প্রতি বিশ্বাস রীতিমতো অন্ধত্বে পরিণত হয়েছে। তবে মুশকিল হচ্ছে, মুসলিম দুনিয়াজুড়ে আজকের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সেকুলার জাতীয়তাবাদীদের রীতিমত বিভ্রমে ফেলে দিয়েছে। একদিকে তারা দেশের মানুষের আবেগের কথা বিবেচনা করে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা না করেও পারছে না, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য তাদের ষোল আনা।

এখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, তসবিহ গোনা, শ্মশ্রুধারী মুসলমানরাও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকছেন না। আগে মিছিলে, সমাবেশে বিপ্লবী শ্লোগান উঠত। এখন ইসলামী শরিয়তের সরকার গড়ার দাবি উঠছে। এক সময় যারা ধর্ম জনগণের আফিম এই আপ্তবাক্যের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছিলেন, তারা এখন বিপন্ন বোধ করছেন। এখন রেজি দব্রের ভাষ্য মোতাবেক, 'ধর্ম দুর্বলের ভিটামিন' হয়ে উঠেছে। আজ তামাম মুসলিম দুনিয়ায় এক নতুন আন্তর্জাতিকতাবাদ, আত্মীয়তার স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। এই নতুন জাতীয়তাবাদী শক্তিকে এখন থেকেই মোকাবিলা করতে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পো ধরা দেশীয় সেকুলার মিত্রদের। এই নতুন জাতীয়তাবাদের আঁটিতে থাকছে কোরআন-হাদিসের নীতিভিত্তিক ইসলামের প্রতি আনুগত্য আর বাইরে থাকছে পশ্চিমা ধনতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষী বিষোদগার। সেকুলারবাদীদের গলায় কাঁটা ফুটলেও এই ইসলামী শক্তি রাষ্ট্র ও ধর্মের বিভাজনের ঘোর বিরোধী। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক জ্ঞানদীপ্তি, রেনেসাঁ, রিফরমেশন জাত সেকুলারিজম তথা জাতি, রাষ্ট্রচেতনা তাদের না-পছন্দ।

www.pathagar.com

মনে রাখা দরকার, ঔপনিবেশিকতার জঠর থেকেই উঠে এসেছে আজকের বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত জাতি-রাষ্ট্র। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের নিজেদের ছাঁচে এসব মুসলিমপ্রধান অঞ্চলকে জাতি-রাষ্ট্রে গ্রথিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এসব জাতি-রাষ্ট্র তৈরি করার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একটাই উদ্দেশ্য ছিল– যাতে ঐক্যবদ্ধ ইসলামী শক্তি আর কখনও মাথা না তুলতে পারে।

কিন্তু ইউরোপের ছাঁচে জাতি-রাষ্ট্ররূপে বিকশিত, বিবর্তিত হওয়ার মতো অনুকূল পরিস্থিতি কিংবা উপাদান মুসলিম সমাজে কখনোই ছিল না। মানবদেহে বাইরের জিনিস প্রবেশ করলে যেমন প্রতিক্রিয়া হয় ও দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি মুসলিম সমাজের ওপর আরোপিত এই ইউরোপীয় মতাদর্শ ঠিকমত কাজ করতে পারেনি। উল্টো মুসলিম সমাজ এক বিভ্রম ও মরীচিকার মধ্যে পড়ে গেছে এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই যেসব তথাকথিত জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী পশ্চিমের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতাসীন হলো, তারা দ্রুত অধঃপতিত হয়ে পড়ল। জাতীয়তাবাদীদের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ জনসাধারণকে তাদের প্রতি বিরূপ করে তুলল। পশ্চিমের তল্পীবহন ছাড়া নিজ সমাজের জন্য বড় একটা ভূমিকা এরা পালন করতে পারল না। তামাম ইসলামী দুনিয়ায় আধুনিক পাশ্চাত্যমুখী জাতীয়তাবাদীরা ইসলামী শক্তির সামনে আজ তাই ক্রমাগতভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন ও রাজনৈতিকভাবে পরাভূত হচ্ছেন। আর তখনই এদের গণতন্ত্রপ্রেম কর্পূরের মতো হাওয়ায় উবে যাচ্ছে। ব্যারাক থেকে মিলিটারি ডেকে পাঠানো হচ্ছে। গণতন্ত্র ইসলামী শক্তিকে শক্তিশালী করছে দেখে সামরিক কিংবা আধা-সামরিক স্বৈরাচারকে আবাহন করা হয়। অতঃপর এই রাজনৈতিক স্বৈরাচারই হয়ে ওঠে পাশ্চাত্যমুখী এবং মার্কিন-ইউরোপীয় স্নেহপুষ্ট জাতীয়তাবাদী শাসকদের শাসনপ্রণালী। পশ্চিমের আলো ঝলোমলো ধনবাদী চাকচিক্য ও বিলাস-ব্যাসনের হাতছানি মুসলিম দুনিয়ার শেখ, আমির, সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরাচারী শাসকদের কাছে যত অপ্রতিরোধ্য হোক না কেন, দরিদ্র আমজনতার কাছে অনাড়ম্বর ইসলামী জীবনযাপনই এখনও কাঙ্ক্ষিত। তাই ইসলামবিরোধী, পাশ্চাত্যমুখী, পুঁজিবাদী ও ইহুদি মিত্র শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলিম জনতা আজ মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ। এসব ঘৃণিত শাসকরা টিকে আছে শুধু পশ্চিমাদের আশীর্বাদে এবং নানারকম দেশীয় কায়েমি স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীর সমর্থনে।

www.pathagar.com

ধন্দ হচ্ছে আলজেরিয়া থেকে সৌদি আরব সর্বত্রই আজ নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে ইসলামিক শক্তি ক্ষমতায় চলে আসবে। পশ্চিম এশিয়ায় গণতন্ত্রের দাবিতে জনকণ্ঠ ধ্বনিত হয় মূলত ইসলামিক শক্তির মঞ্চেই। জুজু হিসেবে এই শক্তিকে হাজির করেই মার্কিন তাবেদার শেখতন্ত্র ও রাজতন্ত্রগুলো টিকে আছে। পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউসও 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের' তত্ত্ব ফেরি করে ইসলামিক শক্তির জনপ্রিয়তা আন্দাজ করে। আলজেরিয়ায় নির্বাচনে জয়ী ইসলামী শক্তির ক্ষমতালাভ ঠেকাতে সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান সমর্থন জানায় প্রগতিশীল সেকুলার জাতীয়তাবাদীরা, এমনকি মার্কসবাদীরাও আগে মুসলিম দুনিয়ায় যারা কমিউনিস্ট আন্দোলন করতেন তারা আজকাল মৌলবাদ ঠেকানোর নামে সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসে পরিণত হয়েছেন। ইতিহাসের এটাও একটা কৌতুক বৈকি।

২.

আজ ইসলামকে একটি পশ্চিমাবিরোধী রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। এই সূত্রে পশ্চিমারা দুনিয়াজুড়ে সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব ফেরি করেছে। পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিরোধের জায়গাটা মতাদর্শে, পশ্চিমা জনগণের সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। ইসলাম তার উত্থান পর্ব থেকেই জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সব মানুষের মুক্তির ধর্ম হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছে। বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব হচ্ছে ইসলামের গোড়ার কথা। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আজকের ইসলামের লড়াই মানুষে মানুষে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে কেবল সফল হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। সুতরাং ওই পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার রূপান্তর ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে না। কমিউনিজমের সঙ্গে লড়াইয়ে পশ্চিমা সভ্যতার পতন ঘটেনি। এর একটা কারণ কমিউনিজম পশ্চিমা সভ্যতার ফসল। কমিউনিজম পাল্টা কোনো সভ্যতার শর্ত পূরণ করেনি। পশ্চিমা সভ্যতার ধারাবাহিকতা হিসেবে এটা উপস্থিত হয়েছে। এটা শুধু পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির একটা বিকল্প পদ্ধতির কথা বলেছে। পুঁজিতান্ত্রিক বা পশ্চিমা সভ্যতার বিপরীতে নতুন সভ্যতা, নীতি-নৈতিকতা, আশা-স্বপ্ন-কল্পনা ইসলামই আজ জাগিয়ে তুলেছে। দুনিয়াজুড়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধে

www.pathagar.com

ইসলামের এই নতুন ভূমিকার উপর নির্ভর করছে মানব প্রজাতির ভবিষ্যৎ। ইসলাম ঐতিহাসিকভাবেই অনেক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। আজকের প্রেক্ষিতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ গোত্রবাদী, বর্ণবাদী, ভাষাবাদী, তরিকাবাদী, ফেরকাবাদী কলহ ও বিবাদের অবসান। এছাড়া ইসলামের মুক্তি নেই। ইসলামপ্রধান সমাজে হামলার মুখে একটা নবজাগরণের সম্ভাবনা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বিজয়ী করতে হলে মুসলমানদের আজ ইসলামের ভেতর ও বাইরে দ্বিমুখী লড়াই চালাতে হবে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী জালিমের বিরুদ্ধে দুনিয়ার তাবৎ মজলুম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

ঔপনিবেশিক পর্বে পশ্চিমা আধিপত্যের পথে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল মুসলিম সমাজে উত্থিত ওয়াহাবি, ফরায়েজি, ব্রেলভি, সানুসি প্রভৃতি আন্দোলন। পরাক্রান্ত ঔপনিবেশিকতাবাদকে আটকানোর চেষ্টায় এগুলো ছিল পিউরিটান সংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আপসহীন ভূমিকা। এ কারণেই আফ্রিকা থেকে ভারত পর্যন্ত উপনিবেশ বিস্তারের যুগে এসব আন্দোলন বিপুল জনসমর্থন পায়। কিন্তু এ আন্দোলনের নেতারা শুধু পিউরিটান সংস্কারের পথে গিয়ে ইসলামকে একটা আত্মমুখী প্রবণতা দিয়ে দেন। শুধু ধর্মতত্ত্বের আঁটি দিয়ে আজকের পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প-সভ্যতার সামনে বড় রকমের বিকল্প তারা হাজির করতে পারেননি। ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ইসলামের নীতিভিত্তিক দার্শনিক, ভাবগত, রাজনৈতিক মোকাবিলার কথাও যদি তারা ভাবতেন তাহলে ভালো হতো।

এই ব্যর্থতার স্মৃতিকাতরতা থেকে উঠে আসে পরবর্তীকালের পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনগুলো। এখানে আমরা দেখি, সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানি, তদীয় ভাবশিষ্য মুফতি আবদুহু, রশিদ রিদা, এরপর ইকবাল, সাইয়েদ কুতুব, মওদূদি হয়ে আজকের আলী শরিয়তি, হাসান আল তুরাবি, রশিদ আল ঘানুসির মতো মুখ। পাশ্চাত্য ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত এরা ও এদের সহযোগীরা কোনো গেঁয়ো কাঠমোল্লা নন। এরা বুঝিয়ে দিলেন ইসলামিক শাসন মানে মোল্লাতন্ত্রের জবরদস্তি নয়। ইসলামিক ঐতিহ্যে গণতন্ত্র, বহুস্বর, শাসিতের অধিকার, নারী অধিকারের উপস্থিতির কথাও তারা জানিয়ে দিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান

www.pathagar.com

চর্চার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার কথা বললেন তারা। পশ্চিমা আধুনিকতাকে অন্তঃসারশূন্য, ভোগবাদী, নৈতিকতাহীন ও সমাজ বিচ্ছিন্নতার আকর বলে নিন্দা করে এরা রাজনীতি ও ধর্মের মিলন চান জনজীবনে নৈতিকতা পুনরুজ্জীবনের চিন্তা থেকে। অমুসলিমদের প্রতি সহিষ্ণুতা, সম্মান ও কথোপকথনের পক্ষপাতী তারা। এই রিফরমিস্ট ইসলাম নিয়ে পশ্চিম ও তার মিত্র সেকুলার জাতীয়তাবাদীদের আজ যত রকমের মাথাব্যথা।

৩.

মুসলিম দুনিয়ায় সেকুলার জাতীয়তাবাদের গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্য পশ্চিম এশিয়ার আরব জাতীয়তাবাদ ও আমাদের এখানকার বাঙালি জাতীয়তাবাদকে একটু ফিরে দেখার তাগিদ অনুভব করছি। আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মিলের জায়গা যেমন আছে তেমনি অমিলও আছে। তবে উভয়েই ভাবনার দিক দিয়ে পাশ্চাত্যমুখী ও ধর্মবিমুখ।

অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ও পশ্চিমা উপনিবেশবাদের সঙ্গে আরব ঐতিহ্য চেতনার টানাপড়েন থেকে আরব জাতীয়তাবাদের জন্ম। ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের টানা কষ্টকল্পিত সীমানায় বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত আরবদের সমাজবাদী আরব জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এ আন্দোলনের নেতারা। এ আন্দোলনকে তখন বলা হতো বাথ বা পুনরুজ্জীবন। বাথ আন্দোলন থেকেই বাথ পার্টির জন্ম। এ আন্দোলনের তাত্ত্বিক গুরু ছিলেন একজন গ্রিক অর্থডক্স খ্রিস্টান, নাম মিচেল আফলাক। তার সহযোগী সিরিয়ার সালাহউদ্দিন আল বিতর একজন মুসলিম। এরা বললেন, আরব বাথ জাতীয়তাবাদ শিয়া, সুন্নি, দ্রুজ, খ্রিস্টান সব আরবকেই ঐক্যবদ্ধ করবে। বাথ আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে ইরাক, সিরিয়া ও ইজিপ্টে। জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক ধারণা হলেও আরব জাতীয়তাবাদীরা ধর্মবিশ্বাসী আরব সমাজে টিকে থাকার জন্য কিছুটা ইসলামিক ঐতিহ্যবাদ এবং তখনকার বিশ্বব্যবস্থার চাপে সোভিয়েত ব্লকের সহযোগিতার আশায় কিছুটা সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনাও আত্মস্থ করে নেয়। এজন্যই পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা এটাকে একটা খিচুড়ি আখ্যায়িত করেছিলেন।

www.pathagar.com

এই আরব জাতীয়তাবাদে ভর করেই ইজিপ্টের গামাল আবদুল নাসের সুয়েজ ক্যানেল জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার, ভারি শিল্পের জাতীয়করণ, কমিউনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দান ও ইসরাইলের সঙ্গে টক্কর দেয়ার চেষ্টা করেন এবং আরবদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে সুয়েজ প্রশ্নে ইঙ্গ-ফরাসিদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর দুঃসাহস আরব জাতীয়তাবাদকে ৫০ ও ৬০-এর দশকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছে দেয়। যদিও ইসলামিক শক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রক্তারক্তি পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে আরব জাতীয়তাবাদ, মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও লিবারেল সেকুলারবাদী পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা আরবরা পুরোপুরি মেনে নেয়নি। এই অনীহার পেছনে আরবদের ইসলামিক শিকড়ের প্রবল টানই আসল কারণ।

ইসরাইল ও পশ্চিমা আধিপত্যের মুখোমুখি হওয়ায় আরব জাতীয়তাবাদীরা যে সফলতা প্রথম দিকে পেয়েছিল, পরপর দুটি আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়, নেতাদের কোন্দল আরব জাতীয়তাবাদের ঐক্যের ফানুসটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। পাশাপাশি নাসেরীয় সমাজবাদের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ঘিরে নেতা-আমলাদের মৌরসী পাট্টা, স্বজন-পোষণ, ঠিকাদার চক্র ও পেট্রোডলারের কারণে শেখতন্ত্রের ফুলে-ফেঁপে ওঠা আরব জাতীয়তাবাদকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য করে তোলে। আর এই শূন্য স্থান ভরিয়ে তুলতে আরবরা আবার নবী মুহাম্মদের আদর্শের দিকেই ফিরতে শুরু করে। আজকে পুরো পশ্চিম এশিয়ায় যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ চলছে তার নেতৃত্বের দড়ি এই ইসলামিক শক্তির হাতেই।

আরব জাতীয়তাবাদের মতো বঙ্গীয় আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদও এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এই জাতীয়তাবাদের দুটি পর্ব।

ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে উনিশ শতকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ, গড়ন আর চরিত্রের দিক দিয়ে যার পুরোটাই হিন্দুয়ানি ও সাম্প্রদায়িক, কারণ এর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের কোনো উপস্থিতি ছিল না।

দ্বিতীয় পর্বে এসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয় পাকিস্তান আমলের মুসলিম জাতীয়তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করে। ফলাফল হিসেবে

www.pathagar.com

কলকাতাকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভয়ানক রকমের এক ইসলামবিরোধী চেতনা, মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণাকে বদ্ধমূল করে দেয়। এখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল প্রতিপক্ষ হচ্ছে ইসলাম ও ইসলামকেন্দ্রিক ভাবাদর্শ। রাজনৈতিক চিন্তার দিক দিয়ে বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা অবিভক্ত ভারতের কংগ্রেসের মতাদর্শেরই আনুগত্য করে। ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যার দ্বন্দ্ব ছিল সুস্পষ্ট। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিরা '৪৭ সালের ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাঙালি পরিচয় ধুয়ে-মুছে বৃহত্তর ভারতের অবাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আড়ালে হিন্দু জাতীয়তাবাদের গর্তে ঢুকে গেছেন। কিন্তু পূর্ববাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা সরাসরি এরকম কিছু না করতে পারলেও বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িকীকরণের জন্য রীতিমত উঠেপড়ে লেগেছেন। বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু ইসলামী আছে তা উৎখাতের জন্য এরা রীতিমত ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে যান। পূর্ববঙ্গের মানুষের অতি পরিচিত আরবি, ফারসি ও উর্দুর ব্যবহার এরা রীতিমত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অন্যদিকে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলারও চর্চা চলছে। কিন্তু হিন্দুত্বটা বহাল-তবিয়তে আছে। পহেলা বৈশাখের উৎসবে উলুধ্বনি, মঙ্গল প্রদীপ, সিঁদুর-চন্দন সব কিছু চলে কিন্তু ইসলামী কিছু মাত্রই এখানে নিষিদ্ধ। তার মানে ইসলাম আর বাঙালি সংস্কৃতি অভিন্ন নয়। হিন্দুয়ানি রীতিনীতিই হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতির গোড়ার কথা। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, আকারে ইঙ্গিতে যদি ইসলামের সঙ্গে কারও কোনো যোগসূত্র দেখা যায় তাহলে তাকে পাকিস্তানপন্থী, মৌলবাদী বলে গালি দিয়ে একটা সন্ত্রাসী পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টাও চলে। তথাকথিত বাঙ্গালীর ভাষা-সংস্কৃতি-জাতীয়তাবাদ এখন হয়ে উঠেছে রীতিমত সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের মত। এই হিংস্র ফ্যাসিবাদের আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্য বাঙালি মুসলমানকে আরও লড়াই করতে হবে সন্দেহ নেই।

পশ্চিম এশিয়ার মুসলমানদের আজ লড়তে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্র ইসরাইল রাষ্ট্রটির সঙ্গে। অন্যদিকে বাঙালি মুসলমানকে লড়তে

www.pathagar.com

হচ্ছে একদিকে আধিপত্যবাদী পশ্চিম, অন্যদিকে আঞ্চলিক পরাশক্তি ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রটির সঙ্গে। বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদ টিকে আছে এই ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রটির সব রকমের সহায়তা ও সমর্থনে। এই রাষ্ট্রটির সমর্থন ব্যতীত বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিলীন হয়ে যাবে। এই জন্যই ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রটি বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য-সংস্কৃতি-আইডেনটিটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের আড়ালে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এই নিশ্চিহ্নকরণের উৎসাহী সমর্থক হচ্ছে এখানকার বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা, যাদের চরম হিন্দুত্ববাদী কলকাতা কিংবা ইউরোপীয় আধুনিকতার অনুকরণ করে অথবা সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের কাছে বুদ্ধি বন্ধক দিয়ে মানসিক গোলাম কিংবা নিকৃষ্ট দালালে পরিণত হতে আপত্তি নেই। ইসলামের প্রতি আমাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির এই দিকগুলো বুঝতে না পারলে আমরা বুঝবো না কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের গিলে খেতে আসছে।

৪.

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মূলস্রোতে আজ ইসলামী শক্তিগুলোই অবস্থান করছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে জিততে হলে ইসলামের দার্শনিক রাজনৈতিক ভাবগত প্রজ্ঞাকে এমন স্তরে উন্নীত করতে হবে, যাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই ধর্ম-বর্ণ-জাত-সংস্কৃতি নির্বিশেষে একটা গণসংগ্রামে পরিণত হয় এবং ইসলাম যেন কোনোভাবেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত না হয়। ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবেই বিপ্লবী রাজনীতির পরিপোষক এবং সঠিক রাজনীতির সন্ধান পেলে তারা সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিতে পারবে। দেখতে হবে জনগণকে নানারকম ফেরকা-তরিকায় যেমন ইসলামবাদী বনাম ইসলামবিরোধী, প্রগতিবাদী বনাম মৌলবাদী, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ প্রভৃতিতে ভাগ করতে না পারে। কারণ এই ভেদ-বিভাজন মার্কিন-ইহুদি-ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির যুদ্ধনীতির অংশ। ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠী আজ পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং মজলুমের এই গণসংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম

১.

আমাদের দেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে যারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছিলেন তাদের অনেককেই ব্রিটিশ শাসক ও তার দেশীয় অনুচররা সন্ত্রাসী বলত। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সর্বাত্মক লড়াই শুরু করে ওহাবিরা। এদেরই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তিতুমীর যার 'নারকেলবাড়িয়ার জঙ্গ' বিপ্লবী ইতিহাস হিসেবে এখন সমাদৃত। এই তিতুমীরকে ব্রিটিশরা বলত 'ধর্মোন্মাদ ও বোকা'।

পরবর্তীকালে বিশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দু ধর্ম থেকে প্রেরণা পেয়ে সূর্যসেন ও ক্ষুদিরামরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন দেন। এদের ব্রিটিশরা বলত টেররিস্ট। স্বাধীনতার লড়াই আর সন্ত্রাস কি একই কথা? এ দুটোকে গুলিয়ে ফেলছি না তো আমরা? আবার ধর্মীয় ভাবাদর্শকে আশ্রয় করে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা কি ফ্যানাটিসিজমের মতো কোনো ব্যাপার? কাকে বলব সন্ত্রাস, কাকে বলব মৌলবাদ আর কাকে বলব স্বাধীতার লড়াই, এর বিচার ইতিহাসকার ও সমাজ বিজ্ঞানীরা আজও ঠিকমত করতে পারেননি।

সন্ত্রাসবাদের কারণ হিসেবে পশ্চিমারা আজকাল মানুষের ধর্মবিশ্বাসের দিকে বিশেষ করে ইসলামের দিকে আঙ্গুল তুলেছে। পশ্চিমের মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীরা এ নিয়ে অনেক সময় খরচ করছেন। তারা এখন ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে প্রায় সমার্থক বানিয়ে ফেলেছেন। পশ্চিমের অনেকে এসব কথাও বলেছেন, ইসলাম এমন একটা ধর্ম যার কাঠামোর মধ্যে নাকি সন্ত্রাসবাদী চিন্তা-ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে। এসব চিন্তা-ভাবনার দুর্বলতা হচ্ছে অন্য ধর্ম ও ভাবাদর্শের আশ্রয়ে থাকা যে সন্ত্রাসবাদ তা এটা ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

বিন লাদেন কিংবা হামাসের অনেক আগে সুইসাইড স্কোয়াড কিংবা মানববোমা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল শ্রীলংকার এলটিটিই। এরা কিন্তু ধর্মে হিন্দু এবং বিশ্বের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে পরিচিত নেপালের মাওবাদীরাও কিন্তু হিন্দুদের হাতে তৈরি।

www.pathagar.com

নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি যাদের ব্রিটিশরা বলত সন্ত্রাসী, তারাও কিন্তু খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাসকে আঁকড়ে বেঁচেছিল। খ্রিষ্টধর্মে গভীর অনুরাগী বাস্করা স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। স্পেন কিন্তু এদেরও সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করে। কম্বোডিয়ায় পলপটের আমলে খেমাররুজরা ছিল বৌদ্ধ, যাদের সন্ত্রাসী বলা হতো। ইহুদি Irgun, Haganah এবং Stern group-এর মতো সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলগুলো ইসরাইল প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই আরবদের উৎখাত করতে শুরু করে এবং এক সর্বাত্মক Ethnic cleansing-এ মত্ত হয়, যার সঙ্গে সাম্প্রতিককালের বসনিয়ার গণহত্যার তুলনা চলে। লাতিন আমেরিকার ইতিহাস ঘাঁটলেও মৌলবাদী খ্রিস্টানদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অনেক নজির মিলবে। সুতরাং সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর হিসেবে ইসলামকে চিহ্নিত করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সব ধর্মেই সন্ত্রাসবাদী আছে। শুধু তাই নয়, সেকুলার জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শগুলোও সন্ত্রাসবাদকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে। নাজিজম-ফ্যাসিজম এর বড় উদাহরণ। সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতার আড়ালে বিশ্ব সন্ত্রাস চালিয়েছে আজকের সেকুলার ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো। হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞের স্মৃতি এখনও বিবর্ণ হয়ে যায়নি। যে ওসামা বিন লাদেনের তথাকথিত ইসলামী সন্ত্রাস নিয়ে আমেরিকা আজ দুনিয়াজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার ব্যাপারটা দেখা যাক। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার সহযোগীরা ছিলেন রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে ইভানজেলিক্যাল খ্রিস্টান। এরা Dooms day তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। এদের বিশ্বাস পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারা সশরীরে স্বর্গে যাবেন। নাইন-ইলেভেনের বিমান হানার পর প্রেসিডেন্ট বুশ মার্কিন নাগরিকদের উদ্দেশে দেয়া ভাষণে সন্ত্রাসের শিকারদের জন্য প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার কথাগুলো ছিল এরকম : আমি প্রার্থনা করি এমন একটি শক্তি আজ তাদের পাশে দাঁড়াবে যে সমস্ত শক্তির চেয়ে বড়। যুগ যুগ ধরে ২৩তম সমাচার (বাইবেলের) যা বলে এসেছে... যদিও আমি মৃত্যুর ছায়াময় উপত্যকার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, তবু আমার কোনো ভয় নেই। কারণ আপনি (ঈশ্বর) আমার সঙ্গে আছেন।

www.pathagar.com

একই ভাষণে তিনি বলেছিলেন : আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রবল শক্তিশালী। এই কাজ (সন্ত্রাসবাদী হামলা) যারা করেছে তার সঙ্গে যারা তাদের আশ্রয় দিচ্ছে তাদের কোনো ফারাক আমরা করব না। যেখানেই থাকুক, তাদের আমরা খুঁজে বের করব। তাদের বিচার করব।

এই বিচারের পরিণতি হচ্ছে ইরাক ও আফগানিস্তানকে দোজখে পরিণত করা। লাখ লাখ নিরীহ নারী ও শিশু হত্যা। জর্জ বুশ এই যুদ্ধকে ক্রুসেড ও ইনফিনিটি জাস্টিসের সঙ্গেও তুলনা করেছেন-এগুলো খ্রিস্টান ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, জর্জ বুশও খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শকে আশ্রয় করে এক সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং ধর্ম থেকেই তার যুদ্ধের বৈধতা সংগ্রহ করেছেন। সন্দেহ নেই জর্জ বুশ একজন ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদীও। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এভাবে বিন লাদেন থেকে শুরু করে জর্জ বুশ-সব মুখ একাকার হয়ে যায়।

২.

সন্ত্রাসবাদ আসলে জিনিসটা কী? এটা আজকের দিনে একটা অতি ব্যবহৃত শব্দ এবং বিশ্বের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের জীবনের কাছে এটি প্রত্যক্ষ বাস্তবতার অংশ।

সন্ত্রাস মানে হচ্ছে ভয় বা আতঙ্ক। আর সন্ত্রাসবাদ হলো সন্ত্রাসকে ব্যবহার করে কোনো লক্ষ্য হাসিলের চেষ্টা। আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে বিশেষ করে নিজের জীবনের বিনিময়ে অন্যের জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস করতে মানুষ বেশি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। এ নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। পণ্ডিতরা এর কারণ অনুসন্ধানে গলদঘর্ম হচ্ছেন। আসল কারণ হচ্ছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সন্ত্রাসবাদীকে তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে সন্ত্রাসের কার্যকারণ খুঁজতে গেলে সমস্যার আসল চেহারাটা অধরা থেকে যায়। আজকে পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলামী সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে সবচেয়ে চর্চিত বিষয় এবং এই সন্ত্রাসের আইকন হিসেবে পশ্চিমা মিডিয়া বিন লাদেনকে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। কিন্তু বিন লাদেনকে আজ পর্যন্ত তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে কেউ বিচার করার চেষ্টা করেনি। কারণ মহাশক্তিমান যুক্তরাষ্ট্রে তার বিশ্বজোড়া কুকীর্তি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে ঢাকার জন্যই বিন লাদেনকে বারবার সামনে এনে খাড়া করে দেয়।

www.pathagar.com

আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বরাবরই সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতার আড়ালে সন্ত্রাসকেই নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। ৯/১১-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত একদিনে তৈরি হয়নি এবং লাদেনের মনও একদিনে আমেরিকার বিরুদ্ধে বিষিয়ে ওঠেনি। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় থেকে ইসলামের পবিত্রভূমি সৌদি আরবে বিধর্মী মার্কিন সেনাবাহিনীর উপস্থিতি, যুদ্ধের পর ইরাক অবরোধের কারণে সে দেশের মানুষের অসীম দুর্দশা এবং অবশ্যই ফিলিস্তিনে ইসরাইলের ভূমিকায় ন্যক্কারজনক মার্কিন সমর্থন–এসব কারণই লাদেনকে আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমেরিকা যতই চেঁচামেচি করুক না কেন লাদেনের মার্কিনবিরোধী জিহাদ কিন্তু আরব জগৎ ছাড়িয়ে পুরো মুসলিম দুনিয়ায় সাড়া ফেলে দেয়। এর কারণও কিন্তু মুসলিম দুনিয়ার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই নিহিত।

মুসলিম দেশগুলোর শাসক শ্রেণী কার্যত দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও অবক্ষয়ের অসুখে ভুগছে। ফলে এদের পক্ষে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা মেটানো অসম্ভব। এসব অপদার্থ শাসক শ্রেণীকে দেশের জনগণের ক্ষোভ থেকে আড়াল করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসছে এবং এদের দ্বারা ইচ্ছামত নিজের সুবিধা হাতিয়ে নিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই চায় না মুসলিম দেশগুলোতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। কারণ তাতে মার্কিন স্বার্থ বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। গণতন্ত্র ইসলামকে শক্তিশালী করছে এই কারণে মুসলিম দেশগুলোর রাজা-বাদশাহ, একনায়ক, সামরিক শাসক কিংবা নামকাওয়াস্তা গণতন্ত্রীই আমেরিকার কাছে প্রিয়। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষ যে সহজেই তাদের শত্রু হিসেবে আমেরিকাকে চিহ্নিত করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বিন লাদেন আজকের বিশ্বব্যবস্থার অনাচার ও বেইনসাফির ফল মাত্র। মানুষ যদি কোনো কারণে ধারাবাহিকভাবে অন্যায় ও বঞ্চনার শিকার হয় এবং প্রচলিত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তার প্রতিকার খুঁজে না পায় তবে তার নিরসনে সে অন্য কোনো পথ খুঁজে বের করবে। আজকের বহুচর্চিত ইসলামী সন্ত্রাসবাদ অনেক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ঘটনাপ্রবাহের জের মাত্র।

বিন লাদেন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক তাত্ত্বিক এই বলে যুক্তি শানান, বিশ্বের শক্তিশালী গণতন্ত্রী রাষ্ট্রটিই তো এক সময়

www.pathagar.com

সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তানে 'তাদের নিজস্ব ভিয়েতনাম যুদ্ধ' উপহার দিতে তাকে ধাইমার মতো কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিল। এখন আমেরিকা সন্ত্রাসী লালনের খেসারত দিক।

এটা ঘটনার সরলীকরণ ছাড়া কিছুই নয়। আফগানিস্তানে ইরাকে এখন মার্কিন আগ্রাসন অন্যায্য হলে সে সময় আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনও অন্যায্য ছিল। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন না হলে মার্কিনিরাও পুরনো শত্রুতার জের ধরে আসত না, আর লাদেনও তৈরি হতো না। সোভিয়েত আগ্রাসনের পর মার্কিন আগ্রাসন শুরু হলে লাদেন ঘুরে দাঁড়াল মার্কিনিদের বিরুদ্ধেই। আজ মুসলিম জগতে মার্কিন আগ্রাসন শেষ হলে লাদেনের কণ্ঠস্বরও ফুরিয়ে যাবে। তাই সন্ত্রাসবাদকে ইসলামের সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কের নিগড়ে বেঁধে ফেলার আজকের পশ্চিমা প্রচেষ্টায় কোথাও এ কথাটা উঠছে না দুই পরাশক্তির অন্যায্য কর্মকাণ্ডেই সেদিন তথাকথিত ইসলামী সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে।

৩.

পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে প্রায়ই আমরা দেখি ফিলিস্তিনি শিশু-কিশোররা ইসরাইলের আধুনিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে ঢিল আর গুলতি দিয়ে লড়ছে। একেকটি ঢিল আর গুলতির বিপরীতে স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র গর্জে উঠছে ইসরাইলি সৈন্যদের হাতে! কী অপরাধ এসব শিশু আর কিশোরের। এরা যে যুদ্ধে নেমেছে এ তো মানবজাতির লজ্জা। পশ্চিমা মিডিয়াগুলো ফিলিস্তিনি জনগণের এই লড়াই-সংগ্রামের ব্যাপারে দারুণ একচোখা। এ মিডিয়া ফিলিস্তিনের লড়াই-সংগ্রামকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করে দেখায়। এদের চোখে ফিলিস্তিনি শিশু-কিশোররা সন্ত্রাসী। আর ইসরাইলি সৈন্যরা হচ্ছে ফেরেশতা। এ অসম যুদ্ধ, একদিকে ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্রের নিষ্ঠুর মারণযজ্ঞ আর অন্যদিকে যারা নির্দোষ, ভুক্তভোগী তাদের দোষী বানানোর ক্রমাগত প্রচেষ্টা—সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা আজ পৃথিবীর সামনে পরিষ্কার। এ বাস্তবতার মধ্যেই ফিলিস্তিনের মজলুম মানুষকে একই সঙ্গে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও জায়নিজমের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। আজকের আধুনিক সভ্যতার নীতি-নৈতিকতা, বহুল আলোচিত মানবাধিকারের বিধিবিধান এবং একটা নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে যেসব

www.pathagar.com

আধুনিক চুক্তি, সনদ, ঘোষণা আছে তার মধ্যে এতদিন ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হয়নি। কারণ ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও জায়নিজম ব্যাপারগুলো এখন একাকার হয়ে গেছে এবং তার নগ্ন প্রকাশ হচ্ছে ইসরাইল রাষ্ট্রটি। পশ্চিমের খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদি জায়নিজম যৌথভাবে ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একালে বর্ণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী লড়াই শুরু করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বহু জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে মুছে দিতে পারলেও লড়াকু ফিলিস্তিনিদের ইচ্ছা ও সঙ্কল্পকে দমিয়ে দিতে পারেনি। ফিলিস্তিনি শিশুদের ওপর পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের তাই এত ন্যক্কার। ইসরাইল হচ্ছে পশ্চিমের খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক ফ্রন্টলাইন। শুধু পশ্চিম এশিয়ার তেলের খনি ও গণবিরোধী স্বৈরতন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পো ধরা শাসকদের টিকিয়ে রাখাই তার কাজ নয়। একই সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে কুৎসা রটনার মধ্য দিয়ে জায়নিস্ট ইসরাইলের নৈতিক বৈধতা অর্জন ও টিকিয়ে রাখাও পশ্চিমাদের বড় কাজ হয়ে উঠেছে।

ফিলিস্তিনের জায়নিস্টদের জুলুম, হিটলারের হলোকস্টকেও ছাড়িয়ে গেছে। হিটলারের হাতে যত ইহুদি শিশু নিধন হয়েছে, জায়নিস্টরা তার চেয়ে অনেক বেশি ফিলিস্তিনি শিশু হত্যা করেছে। হিটলারের জার্মানিতে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ইহুদিরা শুধু মনেই রাখেনি, সেই স্মৃতিকে প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত করার বদলে ফিলিস্তিনিদের দমন-পীড়নের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। হিটলারের অপরাধের জন্য নিরীহ ফিলিস্তিনিরা মাশুল গুনতে যাবে কেন? এই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার বিচার আর মানবাধিকারের নমুনা। আজ যখন বিন লাদেন এসে ইসলামী দুনিয়ার এই মনোভূমিতে দাঁড়িয়ে মার্কিন বিরোধী জেহাদের ডাক দেয় তখন তা অতি সহজে আপামর মজলুম মানুষের অনুমোদন পেয়ে যায়। বৃহত্তর ইসলামী দুনিয়ার মধ্যে আজ যে পশ্চিম বিরোধিতার মানসিকতা বিদ্যমান তার মূলে আছে এই গভীর অসুখ–যার নাম ফিলিস্তিন। আজ যে ইসলামী সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মার্কিনিরা হৈ চৈ করছে তার প্রেক্ষাপট ও বিকাশের ক্ষেত্রও এই ফিলিস্তিন।

গত কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনের মানুষ প্রধানত রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে তাদের দাবি আদায়ের চেষ্টা করেছিল। এখনকার

www.pathagar.com

দিনের সুইসাইড স্কোয়াডের জন্মও তখন হয়নি। আত্মঘাতী মানববোমার আত্মপ্রকাশ ঘটে আরও অনেক পরে ১৯৯৪ সালের ৬ এপ্রিল ইসরাইলের আফুলা শহরে। তার কিছুদিন আগে সে বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি হেরবেন শহরের cave of patriarchs-এ নামাজরত ২৯ মুসলমানকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে জায়নিস্ট নেতা বারুক গোল্ডস্টাইন। তারই বদলা নিতে এবং ফিলিস্তিনের প্রতি পৃথিবীর নজর কাড়তে মানববোমা জন্ম নেয় ফিলিস্তিনে। তারপর থেকে এ হত্যাচক্রের আবর্তন চলছেই। আত্মঘাতী মানববোমা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ফিলিস্তিনি যুবক ইউনুসের স্বীকারোক্তি এরকম : আমি ভালো করেই জানি যে, ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কিছুই করতে পারব না। মুহূর্তের মধ্যে ট্যাঙ্ক আমাকে পিষে ফেলবে। তাই আমি নিজেকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব। ওরা এটাকে বলে সন্ত্রাসবাদ, আমি বলি আত্মরক্ষার লড়াই। (Inside the World of the Palestine Suicide Bomber, The Sunday Times, London)।

দুর্বলের এই প্রত্যাঘাতকে কি সন্ত্রাস বলা যায়? আর সন্ত্রাস যদি হয় তবে তা কী ধরনের সন্ত্রাস? বৈধ না অবৈধ? পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াইরত একটা মুক্তিকামী জনগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী বলা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত? এর বিচার জরুরি।

আসলে ফিলিস্তিনের দুর্দশা আজকের বিশ্বব্যবস্থার পরিণতি। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া সন্ত্রাসের কোনো সমাধান নেই। যারা ইসলাম ধর্মের মধ্যে আত্মঘাতী মানববোমার বীজ নিহিত বলে বিশ্বাস করেন এবং যুক্তিজাল বিস্তার করেন তাদের অবগতির জন্য এটাও বলা যেতে পারে, ইরাকের ইতিহাসেও এই আত্মঘাতী বোমার নজির ছিল না। মার্কিন সেনাবাহিনী সে দেশ দখল করে জুড়ে বসার পরই এর সূত্রপাত। আফগানিস্তানেও তাই। পশ্চিমা আধিপত্যবাদ ও হানাদারির মধ্যেই আজকের সন্ত্রাসবাদের বীজ লুকিয়ে আছে একথা স্বীকার করতেই হবে।

৪.

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ইরাকের ওপর জাতিসংঘের অন্যায় অবরোধের ফলে খাদ্য ও ওষুধের অভাবে শিশুরা মারা যায় বেশি। এ নিয়ে ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘে মার্কিন প্রতিনিধি ক্লিনটন জামানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে একটি মার্কিন টিভি চ্যানেল

www.pathagar.com

(CBS, 60 minutes) প্রশ্ন করে : We have heard that a half a million children have died . I mean, that's more than died in Hiroshima. Is the price worth it? অলব্রাইটের উত্তর : I think, this is a very hard choice, but the price, we think the price worth it.

এ ধরনের সভ্যতা বিনাশী ও ক্রিমিনাল কথা অলব্রাইটরাই বলতে পারেন। আবার সভ্যতা নিয়ে এদের দাপাদাপিটাই আমাদের সহ্য করতে হয়। অলব্রাইট ও সমসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা নিশ্চয়ই তাদের পূর্ব-পুরুষ ঔপনিবেশিক যুগের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড স্যালিসবারির কথা মনে রেখেছিলেন ঃ One can roughly divide the nations of the world into living and the dying. এই ম্যাডেলিন অলব্রাইটরাই তাদের সেনাবাহিনীর আক্রমণে নিহত নির্দোষ অসামরিক মানুষকে আবেগবর্জিত নিষ্ঠুর ভাষায় বলেন–এটা নাকি Collateral Damage-আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি। আজকের বিশ্বব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের এই পাষণ্ড চেহারার মধ্যে ইউনুসদের মতো নিরীহ ফিলিস্তিনির মানববোমা হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া বিকল্প কী?

ইরাকে Collateral Damage হলেও ৯/১১-তে World Trade Centre-এ বিমান হানায় যখন নিজেদের মানুষ মারা যায় তখন তা হয়ে দাঁড়ায় সভ্যতাবিরোধী অশুভ শক্তির হাতে নিরীহ জনগণের হত্যাকাণ্ড।

আজকাল পশ্চিমের কিছু কিছু তাত্ত্বিক সন্ত্রাসবাদকে মনোবিকলনের সমস্যা হিসেবে তত্ত্বকথা প্রচার করছেন। আসলে পশ্চিমারা হানাদারিতেও যেমন নিপুণ, তেমনি তত্ত্ববাজিতেও সেরা। সন্ত্রাসবাদকে রোগ হিসেবে ধরে নিলে একটা বড় ঝামেলা এড়ানো যায়(?)। সমাজের রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা আজকের বিশ্বব্যবস্থার বেইনসাফির দিকগুলো আড়াল করা যায়। কিন্তু সমস্যার মূলে না গিয়ে অর্থাৎ রোগ শনাক্ত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে শুধু সামরিক দাওয়াই দিয়ে এর সমাধান অসম্ভব। ইতিহাস তা বলে না। আধিপত্যবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন। সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোকে সব সময় আধিপত্যবাদী শক্তি নষ্ট করতে চায় নানারকম মিথ্যা প্রচার-

www.pathagar.com

প্রপাগান্ডা দিয়ে। আজ ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীকে জঙ্গি-বর্বর সন্ত্রাসী বানানোর উদ্দেশ্যও তা-ই।

সন্ত্রাসবাদ আজকের বিশ্বব্যবস্থার ফল। একে আজকের পৃথিবীর সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গভীর অসুখের প্রকাশ হিসেবে দেখলে স্থায়ী সমাধান খোঁজা সম্ভব হতে পারে। এ প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা একবার মনে করতে পারি : Israel's ability to displace, repress, and rule over Palestinians, assisted by military power, has extensive and long-run, consequences that go well beyond whatever immediate political gains they may currently bringing to Israel. The sense of injustice in the arbitrary violation of the rights of Palestinians remains in readiness to be recruited for what, from the opposite end, is seen as violent retaliation.

তিনি সতর্ক করে বলেছেন : The vengeance might come not only from Palestinians but also from much larger groups of people linked with Palestinians through Arab, Muslim, or third world identities.

আজকের তথাকথিত ইসলামী সন্ত্রাসবাদের জন্ম ও বিকাশের কারণটি প্রধানত লুকিয়ে আছে এই ফিলিস্তিন সঙ্কটের মধ্যে। সেই সঙ্কট এখন বিস্তৃত হয়েছে ইরাকে ও আফগানিস্তানে। ১৮৭২ সালে আর্থর র‍্যাঁবো লিখেছিলেন : 'এখন যখন আমরা আমাদের অতীত অসঙ্গতির নৈঃশব্দের মধ্যে ফিরে যাচ্ছি... এখনই ঘাতকদের সময়।'

র‍্যাঁবোর এই হুশিয়ারি পড়তে পড়তে আজ আমাদের মনে হচ্ছে তথাকথিত সেকুলার বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মানুষের চিত্ত বৈকল্যের বিরক্তিকর বর্ণনা পড়ছি। পৃথিবী আজ তার অতীত অসঙ্গতির খেসারত দিচ্ছে। পৃথিবীতে আজ জাঁকিয়ে বসেছে বেইনসাফ, যার মোকাবিলায় পৃথিবীর 'সভ্য' মানুষরা উদাসীন থেকেছে বহুদিন। এ উদাসীনতা থেকে যে নৈঃশব্দ তৈরি হয়েছে সেই ফাঁকা ময়দানে আজ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ঘাতকের দল। কারা এরা? এই ঘাতকের জন্ম এমন

www.pathagar.com

এক জায়গায় যেখানে বাঙালি কবি বলেছিলেন : প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এই শক্তের অপরাধ আজ বিশ্বব্যাপি বিস্তৃত। ইরাকে, আফগানিস্তানে শক্তিধর আমেরিকার বোমাবর্ষণে নিরীহ মানুষের মৃত্যু, গাজায় মার্কিন-পুষ্ট ইসরাইলি ঘাতক বাহিনীর হাতে ফিলিস্তিনিদের নিধন, সমাজতান্ত্রিক চীনে উইঘুর মুসলমানদের জাতিসত্তা বিলোপের অভিযান, রোহিঙ্গা, কারেন, পাত্তানি, মোরো, চেচেন মুসলমানদের জাতিসত্তা শেষ করে দেয়ার জন্য বার্মা, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন ও রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত কর্তৃক কাশ্মীরি মুসলমানদের স্বাধীনতার দাবিকে ভূলুণ্ঠিত করা ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় আজ এক ধরনের সন্ত্রাসের আবির্ভাব ঘটছে প্রায়ই, যার শিকার নিরীহ মানুষ।

অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লবের পর মাত্র চার বছরের মাথায় এক প্রতিবিপ্লব ঘটে। গৃহযুদ্ধ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, প্রশাসনিক নৈরাজ্যের কারণে যে সঙ্কট দেখা দেয় তার ফলে ম্যাক্সিমিলিয়েন রবসপিয়েরের নেতৃত্বে বিপ্লব ঘটে। ফ্রান্সের ইতিহাসে শুরু হয় সন্ত্রাসের শাসন। এই প্রথম রাষ্ট্র যুৎসইভাবে সন্ত্রাসকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল। সেই কৌশলের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল এক কোপে মানুষের মুণ্ডচ্ছেদ করা গিলোটিন। রাষ্ট্রের বিরোধীদের শাস্তি দিতে এবং ভয় দেখিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাতে বাধ্য করার কৌশল ছিল এই সন্ত্রাস। সেদিন রবসপিয়েরের নিজের কথা ছিল : Virtue, without which terror is evil; terror, without which virtue is helpless. এখানে তিনি ন্যায় ও সন্ত্রাসকে পরিপূরক বানিয়ে ফেলেছেন। আজকের মার্কিন শাসককুলের কথাবার্তায়ও সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

সন্ত্রাসবাদের মতো দানব কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সৃষ্টিকর্তাকে গিলে খায়। মাত্র এক বছরের মাথায় রবসপিয়েরকে হত্যা করা হয় গিলোটিনেই। আজকের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা যে সন্ত্রাসবাদের আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে সেই আগুনেই অনেক কিছু ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিকে ফেলে দেয়া যায় না। ৯/১১ তার একটা ইঙ্গিত মাত্র। মানবজাতির নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য তাই এ বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের আয়নায় মুসলমানের মুখ

১.

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ আমাদের চোখে পরিয়ে দিয়েছে জগতবিচারের নানা রকমের ঠুলি। আর আমরা এখানে সেই ঠুলি পরা চোখ দিয়ে আমাদের জগত ও মানুষকে বিচার করার চেষ্টা করি। পশ্চিমা মিডিয়াগুলো আদতে সেখানকার সমাজের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা ও মনোভঙ্গির প্রতিফলন মাত্র। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী ও পুঁজিপতি শ্রেণী যখন যাকে নিজেদের স্বার্থের জন্য হুমকি মনে করে তখন তাকে মিডিয়ার মাধ্যমে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ও তার চরিত্র হননের নিকৃষ্টতম কাজে লিপ্ত হয়। প্রপাগান্ডার আড়ালে ঢাকা পড়ে প্রকৃত সত্য।

পশ্চিমা মিডিয়া সম্পর্কে আমাদের একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে—এটা বুঝি অত্যন্ত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক। সমাজের দরকারি কথা প্রচার করা, সরকার ও সমাজের উপরতলার প্রেসার গ্রুপের নানারকম অপরাধ-দুর্নীতি ফাঁস করে দেয়ার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা, তাদের স্বার্থ রক্ষা করাই হচ্ছে এদের কাজ। কিন্তু বাস্তবে এই মিডিয়াগুলো সেখানকার শাসকগোষ্ঠী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে; কারণ তারাই ওগুলোর মালিক-মোক্তার। আবার পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলো যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংগঠিত রূপ; তাই এই মিডিয়াগুলো রাষ্ট্রের সব রকমের অন্যায় আবদারেরও ঘোরতর সমর্থক। আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি সেখানকার সরকার ও মিডিয়ার একই সুর। অথচ পশ্চিমা পণ্ডিতরা আমাদের এন্তার উপদেশ দিয়েছেন মিডিয়ার কাজ নাকি সরকারের কর্মকাণ্ডের নজরদারি করা। আফগানিস্তান ও ইরাকে সামরিক অভিযানের সময় আমরা ধন্ধে পড়ে গিয়েছি, এই অভিযানের দায়িত্ব পেন্টাগনের না সিএনএনের। ভাবটা এমন, সিএনএনই যেন মার্কিন সরকারের প্রচার বিভাগের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ বা বুশের ঘোষিত ক্রুসেডের রণদামামার তালে তালে 'স্বাধীন' পশ্চিমা মিডিয়াগুলো মুহূর্তের মধ্যে ঢাকঢোল বাজানো শুরু করে দেয়। তা হলে যুদ্ধটা কার? ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের না তাদের মিডিয়ার? তারপরও এই মিডিয়া যদি কোনোভাবে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে, মিডিয়ার লোকজনকে ডেকে এনে সরকার অনেক সদুপদেশ দেয়, সাংবাদিকতা শেখায় এবং গাইডলাইন দেয়—তোমরা কিন্তু ওসামার ভিডিও টেপ হুবহু প্রচার করবে না। সংক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

করে নিজেদের ভাষায় গুছিয়ে লিখবে, কেননা ওই লোকটার মর্মভেদী উচ্চারণ অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই হচ্ছে 'স্বাধীন' নামে নন্দিত পশ্চিমা মিডিয়া আর আমাদের সদানন্দ পশ্চিমভক্তরা এই 'স্বাধীনতা'র জন্য ব্যাকুল, দিশাহারা।

আসলে পশ্চিমের প্রচারণার কৌশল এত বেশি সূক্ষ্ম ও দক্ষ যে, সারা দুনিয়ার মানুষকে এটি প্রায় বোকা বানিয়ে রেখেছে। মানুষ সেখানকার প্রচারণার কায়দাকানুনকে অত্যন্ত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও দায়িত্ববান তথ্য ব্যবস্থা হিসেবে মনে করে। আর আমরা গরিব দেশগুলো সেটাকেই নকলযোগ্য মডেল হিসেবে মান্য করি। পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে আমরাও তাদের সঙ্গে তালে তাল দিই। এই মিডিয়াগুলো আমাদের উপর এতখানি শক্তিশালী আধিপত্য বিস্তার করে আছে যে, পশ্চিমাপ্রীতিতে আচ্ছন্ন এই সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই এর বাইরে গিয়ে আমাদের জগত ও তার মানুষকে বিচার করতে পারে না। দেশ-কাল-তত্ত্ব ভুলে বসে আমরা নিজের দেশকেই বিচার করতে বসি পশ্চিমা তত্ত্ব-দর্শনে। এই কারণেই আমাদের দেশের মিডিয়াগুলোও যা বলে তা কিন্তু ওই পশ্চিমা মিডিয়ারই হুবহু নকল। পশ্চিমারা তাদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে মিডিয়াকে যেভাবে বীভৎসভাবে ব্যবহার করে তার নকলনবিসী হচ্ছে আমাদের পশ্চিমা মোহগ্রস্ত মিডিয়ার কাজ। সেদিক দিয়ে পশ্চিমা মিডিয়ার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমাদের মিডিয়ার মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। আজকের যে পশ্চিমের বহু বিশ্রুত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', তার সঙ্গে আমাদের মিডিয়ার উদ্দেশ্যেরও কোনো মৌলিক বিবাদ নেই।

ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় আমাদের মিডিয়া ও পশ্চিমা মিডিয়াগুলোর সুর একাকার হয়ে গেছে। ইরাক আর আফগানিস্তান মানেই পশ্চিমা মিডিয়ার কল্যাণে আমরা বুঝতে পেরেছি, এগুলো হচ্ছে 'সন্ত্রাসী', 'বর্বর', 'মধ্যযুগীয়', 'পশ্চাৎপদ' জনগোষ্ঠীর বাসস্থান। আর এখানে যেহেতু মুসলমানরা বাস করে, সুতরাং মুসলমান মানেই 'সন্ত্রাসী', 'বর্বর', হামেশা তলোয়ার বাগিয়ে যুদ্ধ করতে ছুটে আসে, এই বিকৃত ইমেজ আমাদের মানসপটে পশ্চিমা মিডিয়া খুব ভালোমত প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। সেই জন্যই আমরা ইসলাম ও মুসলমান 'জঙ্গি'র জুজুর ভয় এড়ানোর জন্য ইসলামকেও এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি ও মনে মনে প্রগতিশীল হওয়ার কসরত করি। ওই পশ্চিমা প্রপাগান্ডার ফাঁদে পড়ে আমরা আমাদের চোখকে আবারো পশ্চিমা মিডিয়া-চশমার ফ্রেমে জড়িয়ে নিই।

www.pathagar.com

২.

পশ্চিমা সভ্যতার স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই এর পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিই। কোনো সন্দেহ নেই আন্তর্জাতিক কর্পোরেট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাজধানী হচ্ছে এই সভ্যতা। পশ্চিমা সভ্যতাকে এইভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে সেখানকার অধিপতি ও সমাজনেতাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আধিপত্য সম্পর্কে ধারণা করা যায় বটে; কিন্তু ওই শ্রেণীর ধর্মীয়, বর্ণগত, জাতিগত, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের চেহারাটা আড়ালে থেকে যায়। আড়ালে চলে যায় আর একটা সত্য : পশ্চিমা সভ্যতা শুধু পুঁজিবাদী সভ্যতা নয়, ওটা একটা খ্রিস্টীয় সভ্যতাও বটে। পশ্চিমা সভ্যতার এই খ্রিস্টীয় মনোগঠনের ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, কেন মুসলমানদের তারা 'সন্ত্রাসী', 'বর্বর' বানায়। আমরা পশ্চিমা সভ্যতা শব্দটা যতবার ব্যবহার করি, ঠিক ততবার 'খ্রিস্টীয় সভ্যতা' শব্দটা ব্যবহার করি না। কারণ পশ্চিমা সভ্যতা শব্দটার মধ্যে আমরা একটা সেকুলার, অসাম্প্রদায়িক, নির্দোষ চরিত্রের সন্ধান করি। ভালো করে না জেনে, না বুঝে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বলে দাবিদার লোকেরা পশ্চিমা সমাজকে সেকুলার বলে ভাবতে ভালোবাসেন। এর জন্য দায়ী আমাদের মনোজগতে আধুনিকতা নামক ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের উপনিবেশ। সেকুলারিজম পশ্চিমের খ্রিস্টান সমাজের অভ্যন্তরীণ একটা ঘটনা। সেখানকার খ্রিস্টান নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য এই ধারণা সেখানে কয়েকশ' বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠন এমনই যে, সেখানকার খ্রিস্টান নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর কোনো অখ্রিস্টান নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক মোটেই সেকুলার নয়। অখ্রিস্টান, বিশেষ করে মুসলমান সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ওই মনোগঠন বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমান সম্পর্কে তৈরি করে নতুন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়। পশ্চিমের 'সুশীল' সমাজের পণ্ডিতরা সেই সমাজে মুসলমানদের 'বহিরাগত', 'অস্বাভাবিক' হিসেবে দেখেন। কারণ পশ্চিমা সমাজ একটা খ্রিস্টান সমাজ। আর মুসলমানরা খ্রিস্টান নন। ভুললে চলবে না, খ্রিস্টানরা সেখানে স্বাভাবিক, মুসলমানরা অস্বাভাবিক। মুসলমানরা ওই সমাজে শ্বেতাঙ্গ ও খ্রিস্টান নয় বলেই পরিত্যাজ্য, নিন্দনীয়। এখনো তারা 'সভ্য' হয়ে ওঠেনি। পশ্চিমা সমাজের ভাঁজে ভাঁজে এই সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া। ব্যাশি

www.pathagar.com

কুরাইশীর উদাহরণ নেয়া যাক। ভারতে জন্ম নেয়া, পাকিস্তানে বড় হওয়া, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করা, বর্তমানে ডেনমার্কে বসবাসকারী, জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা এই ভদ্রলোক তার পশ্চিমা সমাজে বসবাস করার অভিজ্ঞতা লিখেছেন রক্ত দিয়ে। মানে তার ভেতরে যে কি পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে, এ লেখাই তার বড় প্রমাণ :

যে কোনোভাবেই হোক পশ্চিমা দুনিয়ায় বসবাসের পর একটা জিনিস আমার কাছে খুবই পরিষ্কার যে, যতই কেন-না আমি সেকুলার হই, যতই কেন-না আমি ধর্মচর্চাকারী না হই তাতে কিছু যায়-আসে না। আমার চারপাশের মিডিয়া, রাজনীতিবিদরা এবং লোকজন সব সময়ই আমাকে মনে করিয়ে দেবে যে, আমি একজন মুসলমান এবং সেই জন্যেই আমি ডেনমার্কীয়, ইউরোপীয় এবং/অথবা পশ্চিম ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক অংশ নই। এটা ভাবতে আমার মন খারাপ হয়ে যায় এবং আঘাত লাগে যে, ডেনমার্কের আইনমান্যকারী, ট্যাক্সপ্রদানকারী, শান্তিকামী ও সাধারণ-স্বাভাবিক শরিফ একজন নাগরিক হয়ে ওঠার জন্যে আমার সব প্রচেষ্টার কোনো দামই এই সমাজের কাছে নেই। আমাকে আমার ধর্ম পরিচয়ের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা হয়। আমি জানি, আমার একারই শুধু এই অবস্থা নয়। পশ্চিমা জগতের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের একই অবস্থা। ব্যাশির লেখা পড়ে মনে হলো ভারতের বিখ্যাত অভিনেত্রী, চিন্তার দিক দিয়ে উদারপন্থী শাবানা আজমীর কথা। গুজরাট দাঙ্গার পর তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন : এতদিন পরে মনে হচ্ছে, আমি একজন মুসলমান।

তথাকথিত 'উদারপন্থী', 'মুক্ত' সমাজে এভাবে মুসলমান পরিচয়টা বড় হয়ে ওঠাটাই প্রমাণ করে আসলে ওই সমাজ কতখানি উদার ও মুক্তমনা। আর পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম ওই পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠনের অনিবার্য প্রতিফলন ঘটায় মাত্র। ৯/১১-এর ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট বুশ ক্রুসেডের কথা বলেছিলেন। ওই কথাটা তিনি এমনি এমনি বলেননি; কারণ খ্রিস্টীয় মনোগঠনের ভেতরে ক্রুসেড ব্যাপারটা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। পশ্চিমা সমাজের ভেতরে রয়ে গেছে ইসলামবিদ্বেষের দীর্ঘ ইতিহাস। এই বিদ্বেষের শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত। পশ্চিমা চেতনার গভীরেই আছে ইসলাম সম্পর্কে ১৪ শতকের জিইয়ে রাখা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রেসিডেন্ট বুশ সেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোগঠনের নবায়ন করেছিলেন মাত্র।

www.pathagar.com

৩.

ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পশ্চিমা মিডিয়া ও পণ্ডিতকুল যে নতুন এক ক্রুসেড শুরু করেছেন, সে সম্পর্কে আজ অনেকেই একমত। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর কেন নতুন করে প্রতীচ্য তার অসূয়াকে ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে ধরেছে, তার কারণ হচ্ছে গত শতাব্দীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানের আগে ইসলাম ছাড়া প্রতীচিকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি ধরে এমন কোনো সুসংঘবদ্ধ ব্যবস্থা আর কিছু ছিল না। ইসলামের প্রতি এই সাবেক ঘৃণাই আবার নতুন করে পশ্চিমা বিশ্বে জাঁকিয়ে বসেছে।

সাম্প্রতিককালে ইসলামের প্রতি এই আনুষ্ঠানিক ঘৃণার প্রথম লক্ষণ দেখি ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়কার তাত্ত্বিক স্যামুয়েল হান্টিংটন কৃত সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্বের মধ্যে। এই তত্ত্ব আজ শুধু হান্টিংটনের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রতিফলন নয়, এটা পুরো পশ্চিমা সমাজের গোপন ইচ্ছার প্রতিফলন। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত সেই তত্ত্বে হান্টিংটন লিখেছেন : পশ্চিম ও ইসলাম ১৩০০ বছর ধরে সংঘাতে লিপ্ত। এই সংঘাত থামার আশা নেই।

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ও তাদের মতাদর্শিক সহযোগী পণ্ডিত প্রবররা এই সংঘাত বন্ধ করতে চান না, এটার স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতে চান। তারা এই ক্রুসেডকে এগিয়ে নিতে চান এই কারণে, যাতে সারা পৃথিবীর উপর আধিপত্য কায়েম করা যায়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের শেষে হান্টিংটন সবক দিচ্ছেন, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতন ঘটলেও ইসলাম ও কনফুসীয় সভ্যতার মতো হোস্টাইল সভ্যতাগুলো এখনো টিকে আছে। সুতরাং এদের সামরিক দিক দিয়ে বাড়তে দেয়া যাবে না। তাই যে কোনো মূল্যে পশ্চিমাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে এবং পশ্চিমের দিক দিয়ে ক্রুসেডের প্রস্তুতিও চলবে সমান তালে। অথচ ক্রমাগতভাবে অভিযুক্ত করতে হবে ইসলামকে–এটি সহিংস, সন্ত্রাসী, সভ্যতার জন্য বড় রকমের হুমকি। লক্ষ্য করুন, ওসামা বিন লাদেন জীবিত কি মৃত এটা কেউ আজ নিশ্চিত নয়। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া তাকে যে কোনো মূল্যে বাঁচিয়ে রাখতে চায়; কেননা তাকে ছাড়া তো আমেরিকার এই ক্রুসেড চলবে না।

পশ্চিমে হান্টিংটনের ক্রুসেড যুদ্ধের আর এক সহযোগীর নাম হচ্ছে বার্নার্ড লুইস। ইসলাম বিশেষজ্ঞ ওরিয়েন্টালিস্ট হিসেবে তিনি সেখানে বেশ নাম কামিয়েছেন। আসলে তিনি একজন ঘোরতর ইসলামবিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। এই ভদ্রলোকের ১৯৯০ সালে লেখা একটি প্রবন্ধ, যার শিরোনাম

www.pathagar.com

হচ্ছে, The Roots of Muslim Rage- মুসলমানদের দুর্বার ক্রোধের শিকড়–সেখানে তিনি লিখেছেন, মুসলমানদের ক্রোধের কারণ হলো, তারা ভেতর থেকেই পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধী, পশ্চিমের নীতি ও মূল্যবোধকে তারা গ্রহণ করতে পারে না–তাই তারা সন্ত্রাসী। এই লেখার শিরোনামটাই বলে দেয় পাশ্চাত্যের এই পণ্ডিতের চিন্তাভাবনা কতখানি তমসাচ্ছন্ন। শুধু হান্টিংটন বা লুইস নন, ইসলামের বিরুদ্ধে লেখালেখি, অবিরত মিডিয়া প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে সেখানে এর একটি নেতিবাচক ইমেজ তৈরির কাজটা নিরলসভাবে একদল বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়াকর্মী করে যাচ্ছেন। দেখা গেছে, তথাকথিত সভ্য পশ্চিমের দেশগুলোর টিভি চ্যানেল ও মিডিয়া কাভারেজের একটা বড় অংশ ইসলাম সম্পর্কিত এবং তা অবশ্যই নেতিবাচক। এই সব প্রচারণার মোদ্দা কথা হলো, পশ্চিমের অস্তিত্বটাই ইসলামী মৌলবাদের উদ্ভবের গোড়ার কারণ; কাজে কাজেই পশ্চিমকে সতর্ক থাকতে হবে এমন একটা মুসলিম মৌলবাদ সম্পর্কে, যারা পশ্চিমকে ঘৃণা করে; শুধু তাই নয়, এর বিরুদ্ধে পশ্চিমের যুদ্ধ করা ছাড়া কোনো রাস্তাই খোলা নেই–যেখানে এদেরকে দেখা যাবে, সেখানেই এদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এখনো কেন যে পশ্চিম সেটা পর্যাপ্তভাবে করছে না!

প্রচারণার ধরনটা দেখার মতো। মুসলমান মানেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধ পক্ষ। ওদের রক্তের মধ্যেই আছে বিরোধিতার বীজ। ৯/১১'র ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট বুশ বললেন ক্রুসেডের কথা। ইতালির প্রধানমন্ত্রী বারলুসকোনি বললেন ইসলামী সভ্যতা খ্রিস্টান সভ্যতার চেয়ে হীন।

এসব কথা কোনো বিচ্ছিন্ন আলাপচারিতা নয়। খ্রিস্টীয় মনোগঠন ও ওই সমাজের সাম্প্রদায়িক প্রেক্ষাপটের মধ্যে এই ইসলামবিদ্বেষের পরম্পরা জড়িয়ে আছে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ও তার প্রচার মাধ্যমের আর একটা কৌশল হচ্ছে মুসলমান মানেই মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসী–এই সমীকরণটা প্রতিষ্ঠা করা।

মৌলবাদ ব্যাপারটা খ্রিস্টীয় প্রোটেসট্যান্ট ধারার একটা পুনরুজ্জীবনবাদী ঘটনা। এরা বাইবেলের সত্যকে অকাট্য ও অপরিবর্তনীয় হিসেবে বিবেচনা করে। এরা পশ্চিমের বহুল আলোচিত সেকুলার ও আধুনিক প্রবণতাসমূহের বিরোধী। মজার ব্যাপার হলো, আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার রাজধানী খোদ আমেরিকাতেই অসংখ্য চার্চ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংস্থা রয়েছে, যারা মৌলবাদের নানা রূপের চর্চা করে। কিন্তু পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের

www.pathagar.com

কেরামতিতে এখন সারা বিশ্বের মানুষকে এমন ধারণা দেয়া হচ্ছে–মৌলবাদ মানেই ইসলাম আর ইসলাম মানেই প্রগতিশীলতার বিপক্ষ শক্তি। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব থেকে পাওয়া মৌলবাদ প্রত্যয়টি এখন পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের জোরে ইসলামের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাম্প্রতিক উত্থান একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা এবং মুসলিম সমাজের উপর পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যিক অভিঘাতের ফল। এই ধরনের একটা রাজনৈতিক ঘটনাকে শুধু শাস্ত্রীয় ব্যাপারে হিসেবে বিবেচনা করা মস্ত বড় ভুল। মৌলবাদ শব্দটা এখন রীতিমত গালিতে পরিণত হয়েছে। এই শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল একজন সহিংস, সন্ত্রাসী মুসলমানকে (?) বোঝায়। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম এমনভাবে মুসলমানের সামাজিক পরিচয়টা নির্মাণ করেছে, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়াটা মুসলমানদের একমাত্র কাজ। ভাবটা এমন–এ রকম কাজে মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের একান্তই অরুচি। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের, গুজরাটে হিন্দুদের, ইরাকে খ্রিস্টানদের জঘন্য হামলা, সন্ত্রাস, নরহত্যাকে কিন্তু পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে ইহুদি, হিন্দু ও খ্রিস্টান সন্ত্রাস হিসেবে অভিহিত করে না। শুধু মুসলমানের সন্ত্রাসকে মোটা দাগে দেখানো হয়। এই পরিচয় এমনি এমনি পয়দা হয়নি। এটিকে তৈরি করা হয়েছে। তৈরি করেছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রচার মাধ্যম এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মতাদর্শিক হাতিয়ারসমূহ।

৪.

পশ্চিমা বা খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের পোষিত প্রচার মাধ্যম মুসলমানদের সঙ্গে এরকম করে কেন? একটা কারণ মুসলমান, মুসলমান বলে। আর একটা কারণ তারা ইসলাম অনুসারী বলে। ইসলামের উত্থানকে খ্রিস্টীয় সভ্যতা কখনোই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। এই কারণে ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমের একটা সামরিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রুসেড বরাবরই অব্যাহত আছে।

আবার দীর্ঘদিনের পশ্চিমা উপনিবেশ মুসলিম সমাজকে 'সেকুলার-আধুনিক-সভ্য' বানাতে পারেনি। এর মানে হচ্ছে, পশ্চিমে খ্রিস্টীয় সভ্যতার জগতবিচারের দৃষ্টিভঙ্গিটার সঙ্গে ইসলামের জগতবিচারের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক তফাৎ রয়েছে। এই তফাতের কারণে মুসলিম সমাজ পশ্চিমা রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাসের ধরন অত সহজভাবে গ্রহণ করেনি।

www.pathagar.com

পশ্চিমারা বিস্মিত হয়, কেন মুসলমানরা তাদের তথাকথিত 'সার্বজনীন' মূল্যবোধকে গ্রহণ করে না। কাজেই ইসলামকে ইসলাম বলেই তার বিরুদ্ধে বিষোদগারের প্রবণতা, তাকে বাঁকাভাবে দেখানোই সেখানকার মিডিয়ার একটা প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়।

হাল-আমলের পশ্চিমের মুসলমানবিদ্বেষের পিছনে আরো একটা শক্ত কারণ আছে বলে মনে হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় কমিউনিজম বিরোধিতা পুঁজিবাদী দুনিয়ার জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়েছিল। তারা সর্বত্র কমিউনিজমের ভূত দেখে বেড়াত। সেই শত্রুর বিরুদ্ধে সভ্যতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ের দোহাই দিয়ে এতদিন পশ্চিমা বিশ্ব তার আধিপত্য কায়েমের লড়াই চালিয়ে গেছে। কমিউনিজমের পতনের পর খ্রিস্টান দুনিয়ার এক নতুন ছায়াশত্রুর দরকার হয়ে পড়ে। কমিউনিজমের অবর্তমানে ইসলামকেই খাড়া করা হয় সেই শত্রু হিসেবে। হান্টিংটন, বার্নার্ড লুইসরা সুপরিকল্পনার ভিত্তিতে পশ্চিমের সেই মতাদর্শিক শত্রুকে উপস্থিত করেন।

৯/১১-এর ঘটনার পর বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আমেরিকা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছে, তা আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সন্ত্রাসবাদের নাম ভাঙিয়ে একালে পশ্চিমের মতাদর্শিক প্রতিপক্ষ ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীকে কুপোকাৎ করাই হচ্ছে এর বড় উদ্দেশ্য।

মুসলমানদের বেলায় পশ্চিমের বিশেষ মনোযোগের আর একটা কারণ হচ্ছে তেল। এই বিপুল সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য মিডিয়াতে মুসলমানদের খারাপ ইমেজ তৈরি করা হয়, যাতে তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আক্রমণের পক্ষে প্রচ্ছন্ন একটা জনমত সব সময়ের জন্য জিইয়ে রাখা যায়। পুঁজিবাদী দুনিয়ার মিডিয়া পাশ্চাত্য বনাম ইসলাম—এই যে নতুন প্যারাডাইম খাড়া করছে, মানব জাতির জন্য এ এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এটা গোষ্ঠীতন্ত্রকে উসকে দেবে। মানবজাতির ভেতরে গভীর এক দেয়াল সৃষ্টি করে দেবে। ক্রুসেডের স্মৃতি কোনো মঙ্গলজনক স্মৃতি নয়। ক্রুসেড পারেনি মিথ্যাকে প্রতিহত করতে। ক্রুসেড যা পেরেছে, তা হচ্ছে, মানবজাতির দু'টি বিশেষ ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সীমাহীন বিতর্ক ও অমোচনীয় পার্থক্য জিইয়ে রাখতে। এই পার্থক্য মোচন করতে পারে মানুষের অবিনাশী মানবিকতা, মানুষে মানুষে জানা-শোনা, লেনদেন ও পারস্পরিক পরিচয়। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ও মূল্যবোধ নয় বরং বি-উপনিবেশায়িত (de-colonized) পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির বোধ। সভ্যতায় সভ্যতায় সংঘাত নয়; দরকার সভ্যতায় সভ্যতায় কথোপকথন; সম্প্রীতির বিনিময়।

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম

সাম্প্রদায়িকতা বলতে এ দেশে এক সময় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে বোঝাত। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ সরকার এই বিরোধ প্রসারে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। 'বিভেদ কর ও শাসন কর' এই নীতি প্রয়োগ করে চতুর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের সুবিধার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখত। ইংরেজ আসার আগে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক তফাৎ ছিল, কিন্তু বিরোধ ছিল না। সেই কালে ভারতবর্ষের সামাজিক স্তরে তেমন কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। মোগলদের সঙ্গে মারাঠা, শিখদের বড়-বড় সংঘর্ষ হয়েছে; কিন্তু তার কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক। মোগল শাসন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ছিল পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক ও বহুত্ববাদী। যে আওরঙ্গজেবকে ফ্যানাটিক বলে গাল দেয়া হয়, তার সময়ও সামাজিক স্তরে সাম্প্রদায়িকতা ও পরধর্ম নিপীড়নের নজির নেই। কেবল ব্রিটিশরা এ দেশে জাঁকিয়ে বসার পর নিজেদের শাসন-শোষণকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেয়া হয়। সব দেশে সবকালে এটাই সাম্রাজ্যবাদের খাসলত এবং বিভিন্ন জনসমাজে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতাকে স্ফীত করে তোলাই তাদের রাজনীতি-রণনীতির কৌশল।

সাম্রাজ্যবাদ সব সময় তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এক কল্পিত শত্রু খাড়া করে এবং ডন কুইকসোটের মতো সেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো এর মাধ্যমে একদিকে নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য আদায় করে, অন্যদিকে পরদেশ লুণ্ঠনের জন্য যে যুদ্ধ প্রয়োজন তার ক্ষেত্র তৈরি করে। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার জন্যই এ রকম একটি কল্পিত শত্রুর প্রয়োজন হয় এবং সেই শত্রুকে রীতিমত একটা দানবে পরিণত করা হয়। এই দানবে পরিণত করার কাজটা করে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া। কারণ যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের জন্য প্রতিপক্ষকে দানব বানানো জরুরি। ভালো মানুষের বিরুদ্ধে তো যুদ্ধ করা যায় না।

কল্পিত শত্রুকে দানব নির্মাণের পাশাপাশি তারা এক ধরনের সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিকাশ ঘটায়। এই রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো প্রতিপক্ষকে কদর্যরূপে হাজির করা, হেয় প্রতিপন্ন করা ও প্রতিপক্ষের ভেতরে হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করা, যাতে তাদের আত্মপরিচয় দুর্বল হয়ে পড়ে। আত্মপরিচয় দুর্বল করে ফেলতে পারলে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি সহজ হয় এবং প্রতিপক্ষ কোনো

www.pathagar.com

প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে না। ঔপনিবেশিক আমলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশিত জনগণের ভেতরে এই হীনম্মন্যতা সৃষ্টির রাজনীতি চালু রেখেছে। মরহুম এডওয়ার্ড সাঈদ তার মশহুর কেতাব Orientalism-এ সাম্রাজ্যবাদের এই চেহারা দিগম্বর করে দিয়েছেন। ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কিভাবে তারা ভাবনা-চিন্তা করে, প্রচার-প্রপাগান্ডা চালায়, তার একটি রূপরেখা তিনি আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন। পাশ্চাত্য যেভাবে ইসলামকে দেখে ও বিচার বিবেচনা করে, সেই দেখা ও বিচার বোধের মধ্যে অন্যরা বিশেষ করে মুসলমানদের সম্পর্কে এক বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির তাড়নায় পাশ্চাত্য ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে দুশমনি করে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও মিডিয়া সব ফ্রন্টেই পাশ্চাত্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করে।

যাই হোক, ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় পাশ্চাত্যের এই ইসলাম বিরোধিতা কৌশলগত কারণে ভাটা পড়ে। পশ্চিমারা তখন কমিউনিজমের ভূত দেখতে শুরু করে এবং এই ভূতের বিরুদ্ধে রীতিমত লড়াই চালিয়ে যায়। দেশে দেশে সামরিক জোট গঠন করে এবং সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পশ্চিমা দুনিয়া কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এক আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সূচনা করে। একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়ার তখন প্রধান কাজ হয়ে ওঠে সমাজব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র কত খারাপ তা চিত্রিত করা।

সমাজতন্ত্রের পতনের পরও পশ্চিমাদের এই ভূত দেখা শেষ হয়নি। কারণ ভূত না থাকলে তো সাম্রাজ্যবাদ থাকে না। এ কারণেই একালে একদিকে তারা হাজির করেছে 'সভ্যতার সংঘাতের' তত্ত্ব, অন্যদিকে নির্মাণ করেছে 'স্পেক্টার অব ইসলামের' ইমেজ। কারণ ইসলাম আজও এক মতাদর্শগত শক্তি। এর আছে আন্তর্জাতিক চরিত্র। এটি পশ্চিমের পুঁজিতান্ত্রিক করপোরেট বৈশিষ্ট্য ও ভোগবাদী লাইফ স্টাইলের আদৌ অনুমোদক নয়। আদর্শের জায়গা থেকে সে পশ্চিমা রাজনৈতিক ও নৈতিক ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ করার যথেষ্টই ক্ষমতা রাখে।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর স্যামুয়েল হান্টিংটনের মতো পশ্চিম থেকে আরেকজন বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। তার নাম ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা। তিনি হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের মতো 'ইতিহাসের ইতি' নামে আরেকটি তত্ত্ব হাজির করেছিলেন। তার তত্ত্বের প্রতিপাদ্য ছিল কমিউনিজমের পতনের পর পশ্চিমের পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মোকাবিলা করার মতো আর কোনো আদর্শ নেই। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এখন মানুষের শেষ নিয়তি এবং এই ব্যবস্থা উন্নয়ন ও বিকাশের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে। সুতরাং পুঁজিতান্ত্রিক

www.pathagar.com

ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই মানুষের ভবিষ্যত মুক্তি লেখা হবে এবং এই পৃথিবীর মানুষ মর্ত্যেই স্বর্গের সুখ ভোগ করবে। যুদ্ধ, বিগ্রহ, বিরোধ থাকবে না। মানুষ হবে এক পৃথিবী ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। বোধ হয় একেই তখন বলা হয়েছিল নতুন বিশ্বব্যবস্থা।

ফুকুয়ামার এসব চিন্তা-ভাবনা শুনতে যতই মনোরঞ্জক হোক না কেন, তিনি কিন্তু এখানে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের অস্তিত্বই স্বীকার করেননি। এর মধ্যে আছে পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী অহং, প্লুরাল পৃথিবীকে মনোলিথিক চিন্তা-ভাবনায় মুড়িয়ে ফেলার এক চেষ্টা এবং নিজেদের অপকর্মকে জায়েজ করার কৌশল। যাই হোক, ফুকুয়ামার চিন্তার পথ ধরে কিন্তু ইতিহাস এগোয়নি। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইরাক ও আফগানিস্তানের ওপর। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের ইতি হয়নি। পশ্চিমারা এখন কমিউনিজমের পতনের পর আদর্শের জায়গা থেকে ইসলামকে মোকাবিলা করতে শুরু করেছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে ভিন্ন কোনো মত ও আদর্শের জায়গা নেই বলেই ইসলাম আজ নিষ্ঠুর আক্রমণের শিকার। একই কারণে পশ্চিমা মিডিয়া ও সমাজপতিরা প্রাণপণে ইসলামের চরিত্র হনন করে চলেছে। এই কাজে বোধ হয় সবচেয়ে এগিয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে ইউরোপের খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশগুলোও তাদের জাত ভাইদের তুলনায় মোটেই পিছিয়ে নেই।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে ফেসবুকে Everyday Draw Muhammad শিরোনামে আমাদের প্রিয় নবীর ওপর ব্যঙ্গচিত্র আকার প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে। রাসুল (সা.)-এর কোনো ছবি নেই, আর কল্পনা করে তাঁর ছবি আঁকা গর্হিত অপরাধ। তাও আবার ব্যঙ্গচিত্র। এটা পৃথিবীজুড়ে ইসলাম বিশ্বাসীদের ব্যথিত করবে সন্দেহ নেই। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত একটি জনগোষ্ঠীকে মানসিকভাবে আহত করা যায় কি না তা পশ্চিমের সেক্যুলার জগতের পণ্ডিত ও পুরোহিতরাই ভালো করে বলতে পারবেন।

পাশ্চাত্যের দেশগুলো কি যিশুখ্রিস্টের অবমাননা প্রসন্নভাবে মেনে নেবে? বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ম্যাডোনা যিশুখ্রিস্টকে নিয়ে একটি গানে গলা দিয়ে কিভাবে হেনস্তা হয়েছিলেন, তা অনেকেরই মনে থাকার কথা। ভারতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হোসেন হিন্দু দেবীর ছবি আঁকতে গিয়ে দেশছাড়া হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মা কালীকে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আদালতের পরওয়ানা পেয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত বা পশ্চিমা জগত তাদের ক্ষমা করেনি। এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নটাও ওঠেনি। অথচ

www.pathagar.com

মুসলমানরা সালমান রুশদির অন্যায় কাজের যখন সমালোচনা করেছিলেন, তখন পশ্চিম থেকে তারস্বরে বলা হচ্ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তাহলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বস্তুটি কী? হিন্দু বা খ্রিস্টানের জন্য যা খাটে, মুসলমানের জন্য তা খাটে না। কারণ ওইসব সমাজও ধর্মনিরপেক্ষ নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতারই সেখানে রমরমা।

মার্কিন সমাজ কতদূর সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে কিংবা মার্কিন সমাজপতিরা তাদের রণনীতির স্বার্থে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়ে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটাচ্ছেন, তার প্রমাণ হচ্ছে ফ্লোরিডার এক গ্রাম্য প্রটেস্টান্ট ধর্মযাজক চেয়েছিলেন এ বছর ৯/১১-তে কোরআন শরীফ পুড়িয়ে দিনটি উদযাপন করতে। সামাজিক পরিবেশ যথেষ্ট অনুকূলে না থাকলে ওই গ্রাম্য ধর্মযাজকের এই সাহস হতো না।

কিন্তু গ্রাম্য ধর্মযাজকের সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টাকে এখন ছাড়িয়ে গেছে নিউইয়র্কের যমজ টাওয়ারের কাছে কর্ডোভা সেন্টার নামে একটি ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাবে। এ ঘটনায় পুরো আমেরিকা যেন ফুঁসে উঠেছে এবং একে কেন্দ্র করে ইমলামবিরোধী প্রচারণাও তুঙ্গে উঠেছে। দক্ষিণপন্থী রিপাবলিকান, ডেমোক্র্যাটিক দলের একাংশ, প্রতিক্রিয়াশীল খ্রিস্টান ও ধর্মযাজকরাও মাঠে নেমেছেন এবং প্রচার করছেন মসজিদ নির্মাণের ফলে নাকি যমজ টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনায় যারা মারা গেছেন তাদের আত্মীয়স্বজন মানসিকভাবে আহত হবেন। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তাই মসজিদ নির্মাণে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু প্রচারণায় যারা অংশ নিয়েছেন তারা মার্কিন সমাজের উপরতলার প্রতিনিধি। রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী, সাংবাদিক সবাই এখানে আছেন। এরাই ওই সমাজের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এ ঘটনা প্রমাণ করেছে, সামাজিক স্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অত সবল নয়। তা খাতা-কলমে, শাসনতন্ত্রে যাই লেখা থাক না কেন। ব্যক্তি বা সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ না হলে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য।

মনে রাখা দরকার, পাশ্চাত্যে এক সময় ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়েছিল খ্রিস্টান ধর্মের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সংঘাত এড়াতে। সেই হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা খ্রিস্টীয় সমাজের ভেতরকার একটা ঘটনা। ঔপনিবেশিকতার সূত্রে এই ধারণা আমাদের দেশে আসে এবং এই সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণা চিন্তা ও মস্তিষ্ককে গ্রাস করার ফলে আমাদের সমাজেও বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা জায়মান হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যে যখন ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা-ভাবনা দানা বাঁধতে থাকে, তখন সেখানে ইসলাম কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেনি বা সেখানে মুসলমানরা একটা বড় সামাজিক শক্তি হিসেবেও হাজির হয়নি। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা সেখানে একটা সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে ফেলেছে। এটাই হয়ে উঠেছে পাশ্চাত্যের সমাজপতিদের মাথাব্যথার কারণ। এ কারণে আজ সেখানে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কাজ করছে না। ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পশ্চিমের খ্রিস্টান জগত রীতিমত সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে জোড়া টাওয়ারের ঘটনার সঙ্গে কর্ডোভা সেন্টার নির্মাণের প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়ে এখন আমেরিকায় যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে ও খ্রিস্টান জিহাদের প্রচারণাটা চলছে, তার মূল কিন্তু আরও পেছনে। ৯/১১-এর ঘটনাকে বলি করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা আফগানিস্তান ও পরে ইরাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়াররা তখন তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন রেডিক্যাল ইসলামের হাত থেকে সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্য তারা যুদ্ধে যাচ্ছেন। কিন্তু জোড়া টাওয়ারের ঘটনার পর মোল্লা ওমর যখন বলেছিলেন, বিন লাদেন ঘটনার জন্য দায়ী এর প্রমাণ দিতে পারলে তিনি তাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবেন। তখন আমেরিকার কথা হলো, কোনো প্রমাণের দরকার নেই, তদন্তেরও প্রয়োজন নেই। তার কথামত মোল্লা ওমরকে কাজ করতে হবে। মোল্লা ওমর আমেরিকার কথায় সায় না দেয়ায় আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাতারাতি বুশ-ব্লেয়াররা সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় আফগানিস্তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মুসলিম দুনিয়ায় আগ্রাসন আধিপত্যের ছলছুঁতো পেয়ে গেলেন। কথায় বলে দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। বিন লাদেন না থাকলেও মার্কিনিরা আরেকটা লাদেন নামের ভূত তৈরি করে নিত। না হলে এ কথা দুগ্ধপোষ্য শিশুও জানে : লাদেন মার্কিনবিরোধী। সে ও তার দলবলের ছোটখাটো হামলা চালানোর ক্ষমতা হয়তো আছে; কিন্তু ৯/১১-এর মতো ভয়ানক গতিসম্পন্ন ও পরিকল্পিত কিছু করা কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রাযুক্তিকভাবে অগ্রসর দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করার ক্ষমতা আদৌ নেই।

এখন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে, ইরাক আক্রমণ করার জন্য গণমারণাস্ত্রের যে অজুহাত খাড়া করা হয়েছিল, তেমনিভাবেই মার্কিন রণনীতি বিশারদদের গোপন কিন্তু শক্তিশালী একটি অংশ জোড়া টাওয়ারে হামলার পরিকল্পনা করে সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছিল। এটা পুরোপুরি মার্কিনিদের চক্রান্তমূলক অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার অংশ। মোহাম্মদ আতার মতো কয়েকজন আরবকে চক্রান্তমূলকভাবে ব্যবহার করে ও ট্রেনিং দিয়ে তারা অতি

www.pathagar.com

সহজেই এ কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল। যেহেতু আক্রমণকারীরা আরব ও মুসলমান এই কারণ দেখিয়ে লাদেনকে এর জন্য দায়ী করে আফগানিস্তান আক্রমণের জোরালো অজুহাত তখন খাড়া করা হয়েছিল। এসব নিয়ে এরই মধ্যে বিশদ লেখালেখি হয়েছে ও নানা তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে; সে আলোচনা এখানে বাহুল্য। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে দেশে দেশে কত যে বেশুমার হামলা, ষড়যন্ত্র, অন্তর্ঘাত, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ রপ্তানি করেছে, তা লিখে শেষ করা যাবে না। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ জাতিসংঘে দেয়া ভাষণে যথার্থ বলেছেন পারলে আমেরিকা প্রমাণ করুক ৯/১১-তে সত্যি কী ঘটেছিল; আর তার জন্য তিনি তদন্তের দাবিও তুলেছেন। ৯/১১-এর রহস্য কি আদৌ উদঘাটিত হবে?

৯/১১-এর প্রেক্ষাপটে অরুন্ধতী রায় প্রশ্ন করেছিলেন মার্কিন শিশুর মূল্য কি আফগান শিশুর চেয়ে বেশি? জোড়া টাওয়ারের ঘটনায় মাত্র তিন হাজার লোক মারা গিয়েছিল। এর প্রতিশোধের কথা বলে আফগানিস্তান ও ইরাকে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত আছে, তা কী ধরনের Infinity Justice-অনন্ত ন্যায়?

সাম্রাজ্যবাদের এই যুদ্ধ, সংঘাত ও সাম্প্রদায়িকতার মুখে আজ দেশে দেশে প্রতিরোধ জেগে উঠেছে। আশার কথা, ইরাক ও আফগানিস্তানে আজ যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই চলছে, সেটাকে আর প্রতিক্রিয়াশীল জঙ্গি মোল্লা মুসলমানদের কান্ড কারখানা বলে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না এবং এই প্রতিরোধের মুখে মার্কিনবাহিনী কুপোকাত হয়ে পড়ছে। প্রতিরোধ যোদ্ধারা যদি সন্ত্রাসী হয়, তাহলে আপামর জনগণের সমর্থন ছাড়া এরা কী করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছে? মার্কিনিদের কথা হলো, তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে, যখন-তখন অন্য আরেকটা দেশ দখল করে নিতে পারবে; কিন্তু এর বিরুদ্ধে কেউ টুঁ-শব্দটিও করতে পারবে না। কেউ করতে গেলে তাকে রাতারাতি সন্ত্রাসী বানিয়ে দেয়া হবে। মগের মুল্লুক আর কী! সভ্যতার সংঘাত ও ইতিহাসের ইতির তত্ত্ব অনুযায়ী যতই ইরাক ও আফগানিস্তানে জবরদখল প্রতিষ্ঠা হোক না কেন, প্রতিরোধের মুখে আজ তা আর টিকে থাকার উপায় নেই। শুধু তাই নয়, মুসলিম বিশ্ব থেকে এই দখলদারি উচ্ছেদ এমন এক বিশ্বব্যবস্থার সূচনা করবে, যা বিশ্বের মজলুম মানুষের জন্য নতুন খবর নিয়ে আসবে এবং নতুন ইতিহাস তৈরি করবে।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের লড়াই

আজকের ইসলামী রাজনীতির আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সংস্কারপন্থীরা বুঝতে পেরেছিলেন মধ্যযুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। যুগের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে তাদেরকে নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যুগের নেতৃত্বে চলে এসেছে ইসলাম বিরোধী পশ্চিমা খ্রিস্টান শক্তি যারা পুঁজিবাদ ও সেকুলারিজমের আড়ালে মুসলিম সভ্যতাকে ঝাঁঝরা করে ফেলতে চায়। আজকের যে ইসলামী রাজনীতি ও পুনর্জীবনবাদী ভাবনা চিন্তা মুসলিম বিশ্বের আত্মাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে তা আসলে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইসলামিক জবাব। অন্যদিকে পশ্চিমা ভোগবাদের প্রতিক্রিয়া। আফ্রিকা থেকে এশিয়া পর্যন্ত ইউরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারের যুগে ইসলামী শক্তির পশ্চাদপসরণ ক্রুসেড বনাম জিহাদের পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। মুসলিম খেলাফতের স্মৃতি, গৌরবগাঁথা, হারানো খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও খ্রিস্টীয় পশ্চিমের প্রতিস্পর্ধী হওয়ার শ্লাঘা মুসলিম সমাজে বড় রকমের তোলপাড় ও টানাপোড়েন সৃষ্টি করে। এ পথ ধরেই জন্ম হয় সংস্কারবাদী ও পুনর্জীবনবাদী আন্দোলনগুলোর।

ভারতবর্ষে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তার ছেলে শাহ আবদুল আজিজের সংস্কার আন্দোলন, সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ে পরিণত হয়। এতে শামিল হয় মুসলিম সমাজের নানান শ্রেণীর মানুষ। বেরেলভীর ভাবশিষ্য সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর ব্রিটিশ রাজ ও তার দালাল হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেয়ে শাহাদৎ বরণ করেন ১৮৩১ সালে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার আর একটা নমুনা হচ্ছে বাংলাদেশের ফরায়েজী আন্দোলন। তবে মুসলিম দুনিয়া জুড়ে উনিশ শতক এবং তারপর বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে যে মুসলিম চিন্তানায়কের কাজকর্ম সাড়া জাগায় তিনি হচ্ছেন সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী, যিনি কার্যতই বুঝতে পেরেছিলেন সমসাময়িক মুসলমানদের কাছে সাম্রাজ্যবাদই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম দুনিয়ার সামনে এই প্রশ্নটিকে তিনি জোরালোভাবে উপস্থাপনও করেছিলেন। নিজেকে আফগানী দাবী করলেও তিনি ছিলেন ইরানি। কিন্তু এই ভৌগলিক পরিচয়ে আসলে তার আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন পুরোপুরি একজন আন্তর্জাতিক মানুষ। কান্দাহার থেকে কায়রো, হায়দারাবাদ থেকে হামাদান, সেন্ট পিটার্সবুরগ থেকে প্যারিস ছুঁটে বেড়ানো এই মানুষটিকে আধুনিক কালের প্রথম ইসলামী

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীর সম্মান জানানো যায়। যিনি খ্রিস্টীয় পশ্চিম ও ইসলামের মধ্যে সংঘাতের স্পষ্ট রূপরেখা হাজির করেন। খ্রিস্টীয় পশ্চিমা আগ্রাসনের মোকাবেলায় তিনি মুসলিম সমাজে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির পুনরুজ্জীবনের উপর জোর দেন এবং প্যান ইসলামী ঐক্যের কথা জোরে শোরে তুলে ধরেন। তার এই নিদান মুসলিম মানসে ঢেউ তোলে এবং পরবর্তীকালে ইসলামী পুনর্জীবনবাদী আন্দোলনগুলোর পশ্চিমের বিপরীতে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ নির্মাণে বড় ভূমিকা রাখে।

তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পাশাপাশি আফগানীর মুসলিম শাসক বিরোধী কষাঘাত, যাদেরকে তিনি মনে করতেন সাম্রাজ্যবাদের নিকৃষ্ট দালাল, তাকে আফগানিস্তান, ইজিপ্ট, ইরান বা ভারতে রীতিমত বিপজ্জনক করে তোলে।

ভারতে এসে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্মম দমন-পীড়নের ছবি দেখতে পান। এই কারণে তার রোষানলে পড়েন ইংরেজের মুসলিম মিত্র স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তিনি এতটাই ক্ষিপ্ত হন, খান ব্রিটিশ নাইট হুডে ভূষিত হলে তাকে 'দাজ্জাল' বলে গাল দিয়ে বিস্ফোরক এক সমালোচনা লেখেন আফগানী। আবার এই আফগানি প্যারিসে থাকাকালে এর্নেস্ত রেনঁর (Ernest Renan) ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি পাল্টা যুক্তি বিস্তার করেন বিখ্যাত জুর্নাল দে দেবাত পত্রিকায়। তবে তার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যে সব মুসলিম ভাবুক পশ্চিমা আধুনিকতার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সকে প্রগতির অগ্রদূত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আফগানী মুসলিম মানসে আধুনিকতার এই প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও তার দুই বিপরীত অভিঘাতের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তার কাছে সমস্যাটি ছিল এরকম: একদিকে মুসলমানদের আধুনিক বিজ্ঞান চাই। কিন্তু সেটা তাদের ইউরোপের কাছ থেকে নিতে হবে। অন্যদিকে ঐ প্রয়োজনটাই বলে দিচ্ছে মুসলিম দুনিয়ার দুরবস্থা। কারণ আমরা নিজেদের যুগোপযোগী করতে ইউরোপীয়দেরই অনুকরণ করছি। আফগানী অনুভব করেন এই সংকটের মূলে আছে ঔপনিবেশকতা। যদি আধুনিকতা বলতে মানুষের সৃজনশীলতা ও মৌলিক চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্ত মত প্রকাশের কথা বুঝায় তাহলে উপনিবেশিত কোন সমাজ নেহাত অনুকরণের মাধ্যমে কি করে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে। এক অর্থে এটা ঔপনিবেশিকতা ও স্বাধীনতার বিতর্কও বটে। স্বাভাবিকভাবেই আফগানী আগে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তির উপর জোর দেন পাশাপাশি ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে পরিবর্তন, পুনরুজ্জীবন ও উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয় রসদ অনুসন্ধানেরও তাগিদ দেন।

www.pathagar.com

আফগানীর ভাবশিষ্য মিশরের মুফতী মোহাম্মদ আবদুহ্ তার গুরুর থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে বললেন, সময়ানুগ আধুনিকতা ও ইসলামের মূলনীতিগুলোর সাথে কোন মৌলিক তফাৎ নেই। শরিয়তের কাঠামোর মধ্যে ইসলামী আইনের নবমূল্যায়ন ও সংস্কার সম্ভব। এই সংস্কারের আরেকজন সমর্থক হলেন রশিদ রিদা। যদিও তিনি খলিফার নেতৃত্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন যেখানে দেশ পরিচালনায় উলামাদের বড় ভূমিকা থাকবে।

আফগানীর আর এক ভাবশিষ্য হলেন উপমহাদেশের কবি ও চিন্তা নায়ক ইকবাল। আফগানীর মতই ইকবাল সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জকে মুসলিম দুনিয়ার বড় সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা ও দর্শন মুসলিম সমাজের 'দীনি' ঐক্যকে যে ব্যাহত করবে তার কথা তিনি স্পষ্ট করে বলতে ভোলেননি। ইকবাল নিজে ছিলেন দর্শনের ছাত্র এবং উত্তরকালে দার্শনিক ও ভাবুক হিসেবে তার আন্তর্জাতিক খ্যাতির কথাও আমরা জানি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যকে তিনি গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন পাশ্চাত্যের প্রাযুক্তিক সমৃদ্ধি যত ব্যাপক হোক না কেন এর নৈতিক ভিত্তি দুর্বল। পাশ্চাত্যের নৈতিক ভিত্তি শক্ত না হওয়ায় সেখানকার সামাজিক অব্যবস্থা ও অস্থিরতার মধ্যে জন্ম নিয়েছে পুঁজিবাদী জুলুম ও আধিপত্যবাদী হানাহানি। ইকবাল খেয়াল করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম দেশগুলোতে আগ্রাসী থাবা বিস্তার করেছে। শুধু তাই নয় মুসলিম আদর্শের অবক্ষয় ও পশ্চিমা জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণার অনুপ্রবেশের ফলে মুসলিম দুনিয়া দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তাভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। ইকবাল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এভাবে:

Very early from the writings of the European scholars. I had come to know that the basic scheme of Western imperialism was to dismember the unity of the Muslim world by popularizing territorial nationalism among its various components.

উপমহাদেশে ইউরোপীয় শাসনের পর থেকে মুসলিম সমাজ বিশেষত মুসলিম তরুণ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনের অনুরাগী হতে শুরু করে। এ অনুরাগ পরবর্তীতে পাশ্চাত্য প্রীতিতে পরিণত হতে শুরু করলে ইকবাল এ প্রক্রিয়াকে আত্মঘাতী হিসেবে বিবেচনা করেন।

www.pathagar.com

ইকবালের সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী মানসিকতা তৈরিতে মুসলিম সমাজের সমকালীন ঘটনা প্রবাহ একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সন্দেহ নেই এবং তিনি তার লেখালেখিতে আমৃত্যু মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও প্যান ইসলামী ঐক্যমতের উপর জোর দিয়ে গেছেন। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ও বিকৃত স্বাদেশিকতার অনিষ্টকর দিকসমূহ, যা ইসলামের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাহত করে। ইকবাল মুসলমানদের রাজনৈতিক পরিচয়কে কোন জাতি-রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে আটকে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তার কাছে এই অভীষ্ট পরিচয় ছিল সীমান্তহীন একই সংস্কৃতির শরিক মানুষজনের সমাজ বা উম্মাহ। ইকবাল পশ্চিমা সভ্যতাকে মনে করতেন বনিক সভ্যতা এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী লোভের পিপাসা মিটাতে পৃথিবী একটা নিষ্ঠুর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এই ছিল তার বিবেচনা।

ইকবাল যেমন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদকে ঠেকানোর কথা বলেছেন, তেমনি মুসলিম সমাজের ভিতর যে পচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার নিদানের কথাও তিনি বলেছেন। সমসাময়িক ইসলামের সবচেয়ে শক্তিশালী এই ভাবুক ইসলামী ব্যবস্থার সংস্কারের উপরও জোর দিয়েছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে মিলিয়ে আধুনিকতাবোধের নব কাঠামোটি তিনি নির্মাণ করেন এবং এই ধারার বিতর্কগুলোকে সমাধানে পৌছাতে সাহায্য করেন।

বিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, পুনরুত্থানবাদী, সংস্কারকামী ইসলামের অপর দুই প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন, মিশরের সাইয়েদ কুতুব ও উপমহাদেশের মওলানা মওদুদী। ইসলামী রাজনীতির এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভাবনার বিকাশকে বুঝা যাবে মুসলিম সমাজের ঔপনিবেশিকতা থেকে ঔপনিবেশিকতা পরবর্তী যুগে উত্তরণপর্বকে খুঁটিয়ে দেখলে । এর বড় উদাহরণ হচ্ছে মিশরের সোসাইটি অফ মুসলিম ব্রাদার্স নামের গণসংগঠনটি।

ইসমাইলিয়া শহরের শ্রমিকদের আরজিতে সাড়া দিয়ে আল আফগানীর আদর্শে উজ্জীবিত তরুণ শিক্ষক হাসান আল বান্না ১৯২৮ সালে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। আফগানীর মত তিনিও দাবী করেন অন্যদের অনুকরণ করার বদলে নিজেদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের মধ্যেই মুসলমানদের উন্নতির পথ খুঁজতে হবে। অনুকরণ প্রবৃত্তির নিন্দা করে তিনি বলেন এর মানে হচ্ছে নিজেদেরকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে 'দোআশলা সারমেয়ের স্তরে' নামিয়ে আনা। কিন্তু ভাবুক হিসেবে বান্নার চেয়ে সাইয়েদ কুতুব ছিলেন অগ্রণী। তিনি বান্নার চিন্তাকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল সেকুলার শাসকদের সাপেক্ষে নতুন করে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি ইসলামের মৌলিক বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার যেমন দাবী করলেন তেমনি ইউরোপীয় আধুনিকতাকেও নিন্দা করলেন। অনেকের মতে

www.pathagar.com

কুতুবের এসব চিন্তা ভাবনা উজ্জীবিত করার কৃতিত্ব মওলানা মওদুদীর। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মওদুদীর অগ্নিবর্ষী রচনাগুলো আরবীতে তরজমা হয়ে ইজিপ্ট ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে সাড়া ফেলে দেয়। সাইয়েদ কুতুব আসলে মওদুদীরই ভাবশিষ্য বলে অনেকে দাবী করেন। সাঈয়েদ কুতুব কায়রোর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে সরকার থেকে তাকে গবেষণার জন্য আমেরিকা পাঠানো হয়। আমেরিকাতেই তার প্রথম বই সোশাল জাস্টিস ইন ইসলাম প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি তার উদ্দেশ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন ঃ

একবার আমাদের চারপাশে চোখ মেলে তাকালেই বুঝতে পারব যে আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি যতটা খারাপ হওয়া সম্ভব, ততটাই খারাপ। দেখাই যাচ্ছে, আমাদের সমাজের নিয়ম কানুনের সঙ্গে ন্যায়বিচারের কোনও সম্পর্ক নেই, সে জন্যই আমরা ইউরোপ, আমেরিকা বা রাশিয়ার দিকে তাকাচ্ছি। আশা করছি, ওই সব দেশ থেকে আমাদের সমাজের সমস্যাগুলোর সমাধান আমদানি করতে পারব। ...আমাদের যা কিছু আধ্যাত্মিক সম্পদ ছিল, যা কিছু বৌদ্ধিক ঐতিহ্য ছিল, সে সবই আমরা দূরে ছুড়ে ফেলছি। সেই সঙ্গে ছুড়ে ফেলছি সেই সব সমাধানের চাবিকাঠিও। যা ঐ সব ঐতিহ্যের দিকে তাকালে পরে আমাদের চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। আমাদের নিজস্ব শাস্ত্র, ধর্মীয় নীতি সবই ছুড়ে ফেলে দিয়ে বরণ করে আনছি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমকে।

এভাবে ইসলামের ভিতরে থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশের পথ খোঁজার চেষ্টায় কুতুব, আফগানী ও আল বান্না সমগোত্রীয় হয়ে ওঠেন।

আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি মুসলিম ব্রাদার্সের সঙ্গে যুক্ত হন। তার বিপ্লবী কার্যক্রমে ভীত হয়ে প্রেসিডেন্ট নাসের তাকে জেলে ঢুকান এবং তার প্ররোচনাতেই এই বিপ্লবী ভাবুককে ১৯৬৬ সালে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। জেলে বসেই তিনি তার বিখ্যাত বই 'মাইল স্টোনস' লেখেন যার লাখ লাখ কপি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। এ বই মূলতঃ বিপ্লবী ইসলামী রাজনীতির ইশতেহার হয়ে ওঠে। মার্কসের যেমন মেনিফেস্টো, তেমনি সাইয়েদ কুতুবের মাইল স্টোনস।

কুতুব মওদুদীর চিন্তাকে পুষ্ট করেছিলেন সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে তিনি তার চিন্তাকে একটি বিপ্লবী খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। তিনি আধুনিকতা ও পশ্চিমা করণের মধ্যেও সীমারেখা টেনেছিলেন। তিনি আধুনিকতাকে বরণ করার পাশাপাশি পশ্চিমাকরণকে খারিজ করতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞান ও মতাদর্শের মধ্যেও তিনি পার্থক্য রেখা টেনেছিলেন। তার কথা জাগতিক জ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞান এই দুই ধরনের উপাদানে আধুনিকতা তৈরি হয়েছে। তার মতে জাগতিক উন্নতি ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কলাকৌশল মুসলমানরা আয়ত্ত করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করতেই পারে। জাগতিক বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে তারা যুগের চাহিদা মেটাতে পারে। কিন্তু পশ্চিমা দুনিয়ার দার্শনিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে সেটা করতে যাওয়া আত্মঘাতী। কুতুবের বহু বিঘোষিত জেহাদটা ছিল পশ্চিমা দুনিয়ার দার্শনিক চিন্তাধারা ও সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে। বিজ্ঞান ও আধুনিকতার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি ছিল না।

অন্যদিকে মওলানা মওদুদীর বড় অবদান হচ্ছে তিনি সমকালীন ইসলামী রাজনীতির বিপ্লবী ব্যাখ্যাতা। ধর্মীয় ভাবাদর্শের পাশাপাশি ইসলামকে একটি রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার তিনি জোরালো চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। উপমহাদেশে ইকবাল প্রথমে ইসলামকে একটি রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হিসেবে দেখার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু এর প্রয়োগিক বিষয়গুলো নিয়ে তিনি ভাববার সময় পাননি। মওলানা মওদুদী ইসলামকে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হিসেবে বিশ্লেষণ করে আধুনিক যুগের প্রয়োগিক বিষয়গুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করার চেষ্টা করেছিলেন। পশ্চিমা দর্শনজাত ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ যেমন গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, কমিউনিজম প্রভৃতি তত্ত্বের বিকল্প হিসেবেও তিনি ইসলামকে উপস্থাপন করেছিলেন। মওলানা মওদুদী ও কুতুবের মধ্যে মিলের জায়গাটা হচ্ছে পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ইসলামের রাজনৈতিক ভাবদর্শকে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করার উপর উভয়ে জোর দিয়েছেন। মওদুদী এই ভাবনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: পৃথিবীতে মানুষের উপর মানুষের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে সবাইকে এক আল্লাহর অধীনে নিয়ে আসাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

আর সেই লক্ষ্যে পৌছানোর নিরন্তর প্রয়াসের নাম হচ্ছে জেহাদ। বলাবাহুল্য ইসলামবাদীদের এই জেহাদ নিয়েই আজ বিশ্বজুড়ে এত তোলপাড়। একটা জিনিস বুঝা দরকার কুতুব ও মওদুদী জেহাদকে দর্শনজগতের পটভূমিতে বিচার করে দেখতে চেয়েছেন। পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প সভ্যতার ভাবুকরা তাই কুতুব ও মওদুদীর সাথে একমত নাও হতে পারেন। কারণ জগৎ বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিটাই এখানে পুরোপুরি ভিন্ন। তাই কুতুব ও মওদুদী যেভাবে ইতিহাস পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে জেহাদের কথা ভেবেছিলেন, রাষ্ট্রের মতাদর্শ ও আইডেন্টিটি হিসেবে ইসলামকে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার সাথে পশ্চিমা বিশ্ব একমত না হওয়ারই কথা। এই কারণেই তারা ইসলামের জেহাদ নিয়ে নানা অপপ্রচার চালায় এবং ইসলামবাদীদের সন্ত্রাসী বলে হাক ডাক করে কারণ তারা পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোর পরিবর্তন চান।

আধুনিক ইসলামের আর একজন শক্তিশালী প্রবক্তা হলেন, ইরানের আলী শরিয়তি। শরিয়তি তার লেখায় মানবিক ও ন্যায়পরায়ন ইসলামী সমাজ গড়ে

www.pathagar.com

তোলার লক্ষ্যে নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে শিয়াদের একটা বিপ্লবী পরিচয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পাশাপাশি শিয়াদের বিপ্লবী ঐতিহ্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে ইমাম হোসাইনের শাহাদতের আদর্শকে আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সাথে একাত্ম করবার চেষ্টা করেছিলেন। সোরবোর্নে পড়া এই বিপ্লবী ভাবুক একবার বলেছিলেন ইরানীরা যদি ইসলামকে হারায় তাহলে তাদের আত্মাকেও হারাবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল রেজা শাহর অগণতান্ত্রিক নিষ্ঠুর শাসনের তলায় পড়ে একদিকে যেমন ইরানীদের নাভিশ্বাস উঠেছিল তেমনি তার ইসলাম বিরোধী নানা রকম পদক্ষেপে ইরানী মানস প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হয়ে উঠছিল। সেই সময় শরিয়তি পশ্চিমা মনস্ক ইরানী তরুণদের সামনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক বিপ্লবী শিয়া আদর্শের মডেলকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একমাত্র তৌহিদই পারবে পশ্চিমা ভারাক্রান্ত ইরানী মানুষের বিচ্ছিন্নতার নিদান দিতে। তিনি ডাক দেন ইসলামের দিকে ফিরে আসার– বাজগাশত বে খিশতান – নিজের আত্মার কাছে ফিরে আসো।

রাজতন্ত্র বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই বিপ্লবী ভাবুককে মরতে হয় রেজা শাহর গোয়েন্দা সংস্থা সাভাকের হাতে। কোন সন্দেহ নেই তিনি ছিলেন ১৯৭৮ সালে ইরানে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থান ও ইসলামী বিপ্লবের ঘটনা ঘটে তার অন্যতম আত্মিক প্রাণপুরুষ।

আলী শরিয়তির এই ফিরে আসার ডাক কিন্তু নতুন কোন ঘটনা নয়। উনিশ ও বিশ শতকের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তাদের মতাদর্শগত বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় তারা মুসলিম সমাজের সংস্কারের কথা বলেছেন। এ প্রক্রিয়ায় তাদেরকে ঐতিহ্যবাহী উলামাদের বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। অন্যপক্ষে তাদের সেই সব ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের সাথেও লড়তে হয়েছে যারা কিনা ইসলামী ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে প্রধানত পশ্চিমা ভাবাদর্শ বা মার্কসবাদ থেকে অনুপ্রেরণা যোগাড় করেছিলেন। এ দুমুখী লড়াই লড়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ইসলামী রাজনীতির যে মতাদর্শগত ভিত্তি তৈরি করেন তা কিন্তু আজ ইসলামী দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশের রাজনীতির মূলস্রোতে মিশে গেছে। আফগানী, ইকবাল, মওদুদী, সাইয়েদ কুতুব, শরিয়তি– এই সব বুদ্ধিজীবী মোটের উপর সবাই ইতিহাসের চালিকা শক্তি হিসেবে ইসলামের কথা খোলাখুলিভাবে বলেছেন। আধুনিক কালে পশ্চিমের ভাবাদর্শগত আধিপত্যের মুখে তারা এক বিকল্প ভাবাদর্শগত চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নবচেতনা সৃষ্টিতে একালে এটাই হচ্ছে এই সব বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী, মাদ্রাসা ও সাম্রাজ্যবাদ

পৃথিবীর সব দেশেই বুদ্ধিজীবীদের একটা ভূমিকা থাকে। তাদের কাজ সাধারণ মানুষের বিবেকী চেতনাকে নাড়া দেয়া, তাদের বোধ-বুদ্ধি জাগিয়ে তোলা। বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব হচ্ছে আপামর জনসাধারণের কাছে তাদের কথা পৌঁছে দেয়া। সাধারণ মানুষের চেয়ে বুদ্ধিজীবীর জানার ও ভাবার সুযোগ বেশি। তিনি যা জেনেছেন বা শিখেছেন তা দেশের লোককে জানানো তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

মুশকিল হচ্ছে আজ যখন নয়া সাম্রাজ্যবাদ তার পুরনো উলঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের চেহারা নিয়ে ফিরে আসার চেষ্টা করছে তখন তাদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার কিংবা তাদের ভাষায় কথা বলার জন্য কিছু বুদ্ধিমান মানুষ আমাদের মতো দেশগুলোয় সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকছেন বলেই মনে হয়। তারা বুদ্ধিজীবী নন, তাদের বলা যায় দুর্বুদ্ধিজীবী। সাম্রাজ্যবাদের সব অপকর্মকেই হামেশা তারা বৈধতা দেয়ার জন্য তৈরি থাকেন।

বিবেকের চোখ খোলা থাকলে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এমন সাফাই গাওয়া যায় না। ইউরোপ-আমেরিকার কোনো কোনো বিদ্বান-বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেটা করলে করতে পারেন। কিন্তু ২০০ বছরের গোলামি ও বীভৎসতম জুলুমের পর গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে তাদের কোনো নাগরিকের জন্য নয়া সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার মতো বেশরম কাজ আর হতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদ তার প্রতিটি অন্যায় কাজের জন্য কুযুক্তি হাজির করে। তথ্যের বদলে ছড়ায় মিথ্যা। একটা মিথ্যা বারবার প্রচার করলে সত্য বলে প্রতিভাত হয়। এই একটানা মিথ্যা প্রচার মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। সেই কুযুক্তির মুখোশ খোলা, সেগুলো লোকের সামনে হাজির করা আজকের সৎ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের সত্যিকারের কাজ।

সাম্রাজ্যবাদের মিত্র বুদ্ধিজীবীদের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে ইংরেজ কবি ডবলু এইচ অডেনের কথা। ইংরেজির জগতে তার সাহিত্য খ্যাতি প্রচুর। ১৯৩০-এর দশকে যুগের হাওয়ায় তিনি কিছুটা বামপন্থী হয়েছিলেন। সৌখিন বামপন্থীও বলা যায়। সেই সুবাদে স্পেনের

www.pathagar.com

গৃহযুদ্ধের সময় সেখানে তিনি ঘুরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে অডেনের মনো পরিবর্তন হয়। ১৯৩৯-এর দিকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আস্তানা গাড়েন আর ক্রমেই সেখানকার রক্ষণশীলদের কাজকর্মের উৎসাহী সমর্থক বনে যান।

এর ফলে অডেনের প্রচুর লাভ হয়। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ডাক পড়তো বক্তৃতা দেয়ার জন্য। পয়সা-কড়ির আমদানিও হতো প্রচুর। ১৯৪৬-এর দিকে তিনি পুরোদস্তুর মার্কিন নাগরিক হয়ে যান এবং অস্ট্রিয়ায় একটি খামারবাড়ি কেনেন। তিনি সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতেন। অস্ট্রিয়ার কর বিভাগ একবার অডেনের কাছে তার বাড়ি বাবদ ৯০ হাজার ডলারের মতো পাওনা দাবি করেছিল। সরকারের কাছে ধরাধরি করে সেই পাওনা কিছুটা কমিয়ে অডেন পরিশোধ করে দেন।

এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অডেন যদি জীবনব্যাপি বামপন্থী থাকতেন তবে তার পক্ষে এত সম্পত্তি করা সহজ হতো না। হয়তো মাঝে মাঝে মস্কো, বেইজিং ও হাভানায় নিঃখরচায় সফর করতেন অথবা দুই-একটা পুরস্কার মিলত। এই অডেন ১৯৬০-এর দশকে ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনকে খোলাখুলি সমর্থন করেছিলেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিনি কৃতঘ্ন হতে চাননি। (Humphrey Carpenter, W. H. Auden/ A Biography, London: George Allen and Unwin, 1991 বইতে।)

এখন দেশ-বিদেশের যেসব বুদ্ধিজীবী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সব রকমের কাজকর্মকে সমর্থন করছেন, তারা কি সবাই অডেনের মতো ভাগ্যবান। একটা সময় ছিল এ ধরনের লোককে তৎক্ষণাৎ সিআইএর দালাল হিসেবে ছাপ মেরে দেয়া হতো। তখন এক মেরু বিশ্বে এদের গলার স্বর সবচেয়ে উঁচু।

যেসব বুদ্ধিজীবী অডেনের মতো মাসোয়ারার লোভে বা দক্ষিণার প্রতিদান হিসেবে নয়, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সাম্রাজ্যবাদের মোসাহেবি করছেন তাদের সম্পর্কে কি বলা যায়। এরা কি জানেন সাম্রাজ্যবাদ মাঝে মাঝে তথাকথিত 'ফ্রিডম', 'ডেমোক্রেসির' মুখোশ পরেও ঘোরে। তারা কি সেই মুখোশকেই মুখ বলে মনে করেন। তারা হচ্ছেন মেকলের সেই কালা

www.pathagar.com

সাহেব, যাদের চিন্তার জগত উপনিবেশিত হয়ে গেছে। যারা সাম্রাজ্যবাদকে পশ্চিমা সভ্যতা থেকে পৃথক হিসেবে দেখেন। অডেনের মতো বুদ্ধিজীবী আমাদের দেশে আগেও কম ছিল না এবং এখনো কম নেই। সেই উনিশ শতকে কলকাতায় ব্রিটিশের প্রেরণায় তৈরি হয়েছিল বাবু বুদ্ধিজীবীদের এক জগত। তারা পরাধীনতাকে স্বাধীনতা আর স্বাধীনতাকে গোলামি হিসেবে প্রচার করেছিলেন। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সময় এই বুদ্ধিজীবীরাই লড়াকু স্বাধীনতাকামীদের উদ্দেশ্যে বহু খিস্তি-খেউর করেছিল। সেসব এখন আমাদের ইতিহাসের অংশ। কালে কালে সেই বাবু বুদ্ধিজীবী আর মেকলের চোখ দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছেন আমাদের এখানকার অনেকেই। তাই আফগানিস্তানে, ইরাকে মার্কিন হানা কিংবা মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নিয়ে তাদের মুখে রা নেই। তারা নির্বিবাদে দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদের 'সভ্যকরণ' অভিযানের সহমর্মী। কারণ সাম্রাজ্যবাদ মনে করে মুসলিম সমাজ হচ্ছে 'মধ্যযুগীয়', 'পশ্চাৎপদ' ও 'বর্বর'। তাই এই সমাজকে 'আধুনিকতা', 'প্রগতিশীলতা', 'সভ্যতার' আলোয় আনা তাদের একটা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামরিক কর্তব্য। ঔপনিবেশিককালে যেমন বলা হতো সাদা মানুষের বোঝা– হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন। এটা বলতে রাডইয়ার্ড কিপলিং বুঝিয়েছিলেন আধুনিক জ্ঞান, দর্শন, নীতি ও মূল্যাবোধের শিক্ষা যার ফলে 'অসভ্যরা' 'সভ্য' হবে। এখন নয়া সাম্রাজ্যবাদের যুগে কথাটার মানে দাঁড়িয়েছে ফ্রিডম, ডেমোক্রেসি, সিভিল সোসাইটি, জেন্ডার এমপাওয়ারমেন্ট ইত্যাকার জিনিস। এগুলোর সঙ্গে বাছ-বিচার নির্বিশেষে মৈত্রীর সম্বন্ধ করলে অসুবিধা নেই। মুসলিম সমাজের যে অংশ বা শ্রেণী এই মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে বা সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শ, চিন্তা ও জীবন পদ্ধতিকে খোলাখুলি অনুসরণ করতে উদ্যোগী হয়েছে, তাদের আধুনিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই 'আধুনিকতার' নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে মুসলিম সমাজের ইসলামবাদী অংশের চিন্তা, আদর্শ ও জীবনচর্চা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সেটা 'মৌলবাদী' বলে নিন্দিত ও ঘৃণিত। মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার জায়গা। জীবনের বিচিত্র বিষয়ে ইসলামের যেমন একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে; তেমনি শিক্ষা ও জ্ঞান

www.pathagar.com

নিয়েও আছে ইসলামের বিশেষ দৃষ্টিকোণ। মাদ্রাসাগুলোয় এর কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে বলা চলে।

সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের এই মতাদর্শিক কেন্দ্রগুলোকে সহ্য করতে পারে না কিংবা এগুলোকে ভেঙে নতুনভাবে পুনর্গঠনের তাগিদ দেয়। এর কারণ পরিষ্কার। এই কেন্দ্র থেকে যে মানুষগুলো বেরিয়ে আসে তারা আর যাই হোক পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পসভ্যতাকে সভ্যতার একমাত্র আদর্শ বলে বড়াই করে না, বহুজাতিক কোম্পানির কর্পোরেট সংস্কৃতি, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, টাটকা ফ্যাশন আর মুক্তবাজারের লুটেরা অর্থনীতিকে কবুল করে না। বিশেষ করে এই মানুষগুলোই আজ দুনিয়াব্যাপি সাম্রাজ্যবাদের পরদেশ লুণ্ঠন ও পরজাতি পদানত করার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। এ কারণেই মাদ্রাসার প্রতি সাম্রাজ্যবাদের এত অরুচি। আর সাম্রাজ্যবাদের দোসর আমাদের আধুনিকতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা সঙ্গত কারণেই মাদ্রাসাগুলোকে 'মৌলবাদ' ও 'জঙ্গিবাদ' তৈরির কারখানা বলে এক জুজু তৈরি করেছেন, যা এখন রীতিমতো উন্মাদের প্রলাপে পরিণত হয়েছে। একই কারণে আমাদের আধুনিকতাবাদীরা মাদ্রাসায় যে মানুষগুলো পড়াশোনা করে নানা কৌশলে তাদের ওপরে ওঠার সব পথ বন্ধ করে রেখেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগ এন্তার। এ শিক্ষা আমাদের পিছু টেনে রেখেছে। এ হচ্ছে পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা। এসব যুক্তি কবুল করেই বলছি, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল কি এই কারণে কোকোকোলা-পেপসি-লিভাইস-ইউনিলিভার-ম্যাকডোনাল্ড-কেএফসি-গ্রামীণফোন-বাংলালিংক নিয়ন্ত্রিত জীবন কল্পনার শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এটা একটা চপেটাঘাত। মাদ্রাসার তালেব এলেমদের নেই 'ডিজুস জীবন', 'হরলিক্স প্রতিভা', 'লাক্স সুন্দরী', তাদের তৃষ্ণায় পেপসির বোতলে ঝাঝ ওঠে না, সুবেহ সাদেকের সময় পেপসোডেন্টের ফেনার বদলে মিছওয়াকই তাদের সই, তাদের দিকে তো আধুনিক সভ্যতা ঘৃণা আর সন্দেহে তাকাবে–যখন তখন তাদের জঙ্গি, বর্বর, সন্ত্রাসী বানাবে। এটাই আধুনিক সভ্যতার 'ইনসাফ'।

মাদ্রাসা শিক্ষা যদি আমাদের পেছনে নিয়ে যায় তাহলে আধুনিক শিক্ষা আমাদের কী দিচ্ছে। ওটাতো ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষারই নামান্তর। আধুনিক শিক্ষার মানে করা হয় প্রগতি ও অগ্রসরতা। এই

www.pathagar.com

প্রগতি ও অগ্রসরতার শিক্ষা যে ঔপনিবেশিক শাসন ও গোলামির সম্পর্কই দীর্ঘস্থায়ী করে, আমাদের চেতনার জগতে সাম্রাজ্যবাদের পরিধি বিস্তৃত করে সে সম্পর্কে কে বিতর্ক করবে। আধুনিকতার সন্তানরাই সেকালের মতো একালেও মানসান্তো- ইউনিলিভার-নেসলে-মটোরোলার চাকরির জন্য লাইন দিচ্ছে, নিজেদের মনের কোণে নিউইয়র্ক-লন্ডনের জন্য একখণ্ড জমিন প্রস্তুত রাখছে, যাতে সুবিধা বুঝে ওখানে অভিবাসী হওয়া যায়, যারা চিন্তা ও বিশ্বাসের জায়গা থেকে নিজভূমে পরবাসী তাদের এ ব্যাপারটা আলোচনায় কেন উঠে আসে না। অনেক সময় আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা যুগোপযোগী করার কথা বলে থাকি, যুগের প্রয়োজনে এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলি, কিন্তু আধুনিক শিক্ষার সাম্রাজ্যবাদী পরিপ্রেক্ষিতকে ভাঙবার কথা একবারও বলি না।

যুগের প্রয়োজন কথাটার মধ্যেই একটা ফাঁক আছে। যেমন আছে আধুনিকতা কথাটার মধ্যে। যুগের প্রয়োজন মানে তো এ কালে সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞান কাঠামোর ছাতার তলে আমাদের যাবতীয় ব্যবস্থাকে অধীন করে দেয়া। কারণ যুগের নেতৃত্বে আছে পুঁজিতান্ত্রিক, ভোগবাদী এক শিল্পসভ্যতা, যার লক্ষ্য ঔপনিবেশিকতা, পরজাতিপীড়ন এবং বিশ্বব্যাপি মানব অস্তিত্বের সংকটকে ঘনীভূত করা। আমাদের আধুনিকতাবাদীদের কথামতো মাদ্রাসা শিক্ষাসহ যাবতীয় ব্যবস্থাকে তাহলে কি সভ্যতা নামধারী সিন্দাবাদের এই দৈত্যের কাছে জিম্মি রাখতে হবে।

না। যুগের প্রয়োজন হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষিত এই মানুষগুলোকে ইসলামের মৌলবানীর ভিত্তিতে সেই দার্শনিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অর্জন করতে হবে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার ভোগবাদী ও আগ্রাসি চরিত্রের রূপান্তর সাধন করে এক মানবিক সভ্যতার পত্তন করা যায়। মাদ্রাসার তালেব এলেমরা যতক্ষণ না এই দার্শনিক প্রজ্ঞা অর্জন করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে আধুনিকতাবাদীদের এই গোয়েবলসীয় প্রচারণা চলতেই থাকবে।

আজকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আড়ালে যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তা আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই। জর্জ বুশ, টনি ব্লেয়ার ও খ্রিস্টীয় জগতের কর্তাব্যক্তিদের দিক দিয়ে আসলে সেটা ক্রুসেড।

www.pathagar.com

মোটকথা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধ। মধ্যযুগের ক্রুসেডের সঙ্গে হাল জামানার ক্রুসেডের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। সেই কালে ক্রুসেডের নেতৃত্বে ছিলেন পোপ, এই কালে বুশ, ব্লেয়ার আর তাদের সাঙ্গরা। সিজার আর চার্চের তফাৎ এই কালে আবার মুছে গেছে। শুধু 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', 'মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ইত্যাদি কুকথা, কূটতর্ক করে বিশ্ববাসীর চোখকে একটা ধন্ধে ফেলে দেয়া মাত্র।

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিজমের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদীদের ঝগড়াটা ইসলামের সঙ্গে কেন? তাও আবার গায়ে পড়ে ঝগড়া। কারণ একটাই। আজকের আগ্রাসী শিল্পসভ্যতাকে মতাদর্শিকভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে কেবল ইসলাম। শিল্পসভ্যতার আগ্রাসি চরিত্রকে বদলে ফেলে সেই জায়গায় বিশ্ব মৈত্রী ও বিশ্বভাবনার প্রশ্রয়ও দিতে পারে ইসলাম। এ কারণেই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের ইসলামের ওপর এত গোস্বা। একই কারণে ইসলাম ও ইসলাম অনুসারীরা সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, অসভ্য, বর্বর ও মধ্যযুগীয়। কাউকে সন্ত্রাসী, ডাকাত না বানাতে পারলে তো তাকে গরু-ছাগলের মতো মেরে ফেলা যাবে না। এই কালে মতাদর্শিকভাবে ইসলামের সামগ্রিক জাগরণ ঘটবার মুহূর্তে তাই তাকে ঝাড়ে-বংশে বিলকুল খতম করার জন্য আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা উঠেপড়ে লেগেছে।

পশ্চিমা বিশ্ব ইহুদিবাদী– মৌলবাদী রাষ্ট্রটিকে মানতে পারে, কিন্তু ফিলিস্তি -নের স্বাধীন অস্তিত্ব মেনে নিতে চায় না কেন, এর উত্তর এইখানে লুকিয়ে আছে। মুসলমানরা মৌলবাদী হিসেবে নিন্দিত। কিন্তু এ ধরনের ভাবনা-চিন্তা অন্য সংস্কৃতি-সভ্যতায় তো ভূরি ভূরি। তারা নিন্দিত নয় কেন? এর উত্তরও ওই একই জায়গায় মিলবে। জায়নিজম আধুনিক সভ্যতাপন্থীদের কাছে মৌলবাদ হিসেবে নিন্দিত নয়। ক্রিশ্চিয়ান ফান্ডামেন্টালিজমের প্রভাব এখন পশ্চিমা সমাজে দিন দিন বাড়ছে। (আগ্রহী পাঠক এ সম্পর্কে জানতে Karen Armstrong-এর Battle for God বইটা উল্টাতে পারেন।) এসব নিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যম নিশ্চুপ।

পশ্চিমের রথিদের মতে, একমাত্র সাদ্দাম হোসেনই বায়লজিকাল অস্ত্র তৈরি করেছে। ইরান ও পাকিস্তান আণবিক অস্ত্র উৎপাদন করে নিকৃষ্টতম ভুল কাজটি করেছে। কিন্তু ইসরাইলের কাছে যে প্রচুর নিউক্লিয়ার ও

www.pathagar.com

বায়লজিকাল অস্ত্র মজুত আছে তাহলে তাকে ধ্বংস করার প্রশ্ন ওঠে না কেন? বরং ওটি রক্ষা করাই সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার অঙ্গীকার। এই হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার আসল চেহারা। ইরাক ও আফগানিস্তানে লাখ লাখ মানুষকে খুন করেও তারা সুশীল। তারা সন্ত্রাস করে না। যুদ্ধ করে না। যুদ্ধ করে শুধু মাদ্রাসার ছাত্ররা। মাদ্রাসা মানেই জেহাদি মুসলমান তৈরির কারখানা। যাবতীয় 'অসভ্যতা', 'বর্বরতা', 'হিংস্রতা' শেখানোর জায়গা হচ্ছে ওই মাদ্রাসা।

মাদ্রাসার ছাত্রদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রত্যয় নতুন কোনো ঘটনা নয়। সেই ওহাবি-ফরায়েজিদের আমল থেকেই এদেশের মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অন্য দেশে গিয়ে অস্ত্র ধরেছে। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট হান্টার সাহেবের বই পড়লে বোঝা যায়–এই আন্দোলন ছিল সারা ভারতের এক ধরনের মুক্তি আন্দোলন। কিন্তু সেকালেও ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই মুক্তি আন্দোলনকে যথার্থ মূল্যায়ন করেনি। কারণ স্পষ্ট। আধুনিক শিক্ষার নামে যে গোলাম শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদীরা তৈরি করেছিল তারা ইংরেজের মুখেই ঝাল খেয়েছিল। রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র সবাই একযোগে ব্রিটিশদের শাসনকে সেদিন 'ঈশ্বরের শাসন' হিসেবে প্রত্যয়নপত্র দিয়েছিলেন। সেই 'ঈশ্বরের শাসনের' বিরুদ্ধে যারা লড়াই সংগ্রাম করেছিল ইতিহাসে তাদের আন্দোলনের যে যথার্থ মূল্যায়ন হবে না, তাদের যে অবধারিতভাবে 'সন্ত্রাসী', 'বর্বর' ইত্যাকার গালাগালি হজম করতে হবে, এটাতো খুব স্বাভাবিক। আজকে এক মেরু বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেই 'ঈশ্বরের' আসনে অধিষ্ঠিত। আর সেই 'ঈশ্বরের শাসনের' বিরুদ্ধে একালে যারা লড়াই সংগ্রামের কথা বলছে তাদের জন্যও একই বিধিলিপি অপেক্ষা করছে। আমাদের দেশে এ মুহূর্তে মাদ্রাসা শিক্ষার আমুল বিরোধিতার এই হচ্ছে তাৎপর্য। রামমোহনের শিষ্যরা আজও সোচ্চার এবং 'ঈশ্বরের শাসনের' পক্ষে প্রত্যয়নপত্র হাজির করতে রীতিমতো ক্লান্তিহীন।

রামমোহন মরেননি। আজকের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে রামমোহন এই ভাবে মিত্র ভাব স্থাপন করেছেন এবং নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন।

www.pathagar.com

ইসলামোফোবিয়া

১.

পাশ্চাত্যের মিডিয়া, বিদ্বৎসমাজ ও নীতি-নির্ধারকরা এখন নতুন একটি পরিভাষা চালু করেছেন : ইসলামোফোবিয়া (Islamophobia)। বাংলা করলে এর অর্থ দাঁড়ায় ইসলাম আতঙ্ক। কমিউনিজমের পতনের পর থেকে এই পরিভাষাটির ব্যবহার শুরু হয় এবং ৯/১১-এর ঘটনার পর থেকে এর ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পায়।

British Runnymede Trust ইসলাম আতঙ্কের একটি সংজ্ঞা খাড়া করেছে এভাবে : Dread or hatred of Islam and therefore, to the fear and dislike of all Muslims–ইসলামকে ঘৃণা করে বলে মুসলমানকে অপছন্দ করার নীতি।

ভাবতে অবাক লাগে 'সভ্য', 'অসাম্প্রদায়িক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে পরিচিত পশ্চিমা ব্যবস্থার মধ্যে এই বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। পশ্চিমারা দুনিয়াজুড়ে 'অসাম্প্রদায়িক,' 'সভ্য' ও 'প্রগতিশীল' চেহারা নিয়ে নিজেদের জাহির করে আর মুসলমানরা 'বর্বর', 'অসভ্য', 'সন্ত্রাসী' বলে ক্রমাগত নিন্দিত হয়। তাদের কপালে আজ জুটেছে 'ইসলামী মৌলবাদ' নামের কলঙ্ক। পশ্চিমা প্রচার-প্রপাগান্ডা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কোনো মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করাই আজ রীতিমত অপরাধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামমাত্রই 'সন্ত্রাসী ধর্ম,' 'বর্বর' আর অসভ্যদের বিধান। তাদের নবী তরবারির জোরে এ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছে। অতএব এরা সন্ত্রাসী না হয়ে আর কী হবে!

ইসলাম আতঙ্ক শব্দটি পশ্চিমা মস্তিষ্কপ্রসূত। খ্রিস্টান আতঙ্ক, বৌদ্ধ আতঙ্ক, ইহুদি আতঙ্ক ইত্যাদি পরিভাষা আমরা এ যাবৎ শুনিনি। ভাবটা এমন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই কেবল মানুষ খুন করে, বোমা ফাটায়, সন্ত্রাসী হামলা চালায়। আর অন্য ধর্মাবলম্বীরা 'সুশীল', 'সভ্য', বোমা ফাটায় না, সন্ত্রাস করতে জানে না। স্মর্তব্য, পাসপোর্টে নামের আগে 'মোহাম্মদ' শব্দটা থাকলে পশ্চিমের ইমিগ্রেশন কর্তারা এখন এমনভাবে চোখ তুলে তাকায় যেন এই বোধ হয় কোনো সন্ত্রাসী তার ওপর বোমা নিয়ে হামলে পড়বে। ইউরোপে এক সময় Anti-Semitism-এর মতো বর্ণবাদী ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমের সেই বর্ণবাদী মানসিকতা আজ Islamophobia-র রূপ নিয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামোফোবিয়া শব্দটি প্রতিষ্ঠা করার পেছনে পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে একটি দানবীয় শক্তি হিসেবে হাজির করা। পশ্চিমা মিডিয়ার ইসলামকে এভাবে হাজির করার পেছনে কারণ হচ্ছে ইসলামের মতাদর্শিক শক্তি এবং ইসলামপ্রধান দেশগুলোর প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষত তেলের ওপর ভাগ বসানো।

মতাদর্শিকভাবে ইসলাম পশ্চিমের করপোরেট ব্যবস্থা, বাজার অর্থনীতি, ভোগবাদ, আত্মস্বার্থপরতা, লাভ ও লোভকে চূড়ান্ত বিবেচনা করার চিন্তাভাবনাকে আদৌ সমর্থন করে না। এই কারণেই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ একদিকে তেলের ওপর দখলদারিত্ব কায়েমের জন্য সামরিকভাবে সব সময় প্রস্তুত, তেমনি তাদের মিডিয়াও সমান তৎপর, যাতে প্রমাণ করা যায়, ইসলাম একটা দানবীয় ধর্ম এবং মুসলমানমাত্রই সন্ত্রাসী। তাহলে মুসলমান দেশগুলোর ওপর দখলদারি কায়েম করা সহজ হয়। কারণ কাউকে 'সন্ত্রাসী', 'বর্বর' প্রমাণ করা গেলে তাদের দেশ দখল করে নেয়া, তাদের ওপর সবরকমের জুলুম ও বেইনসাফিকে বৈধ প্রমাণ করা সহজ হয়। মূলত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পুরো পশ্চিমা বিশ্বের ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর প্রতি এই হচ্ছে সাধারণ নীতি ও বিবেচনা। সেই প্রেক্ষিতেই আজকে ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও সামরিক–প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য হামলা ও পশ্চিমা প্রচার-প্রপাগান্ডাকে বিবেচনায় নিতে হবে।

২.

মার্কিন লেখক Stephen Schwartz-এর মতে, ইসলামোফোবিয়া হচ্ছে : ... the condemnation of the entirety of Islam and its history as extremist–সমগ্র ইসলাম ও তার ইতিহাসকে ঘৃণা করার নীতি। শোয়ার্টজের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এ হচ্ছে নিরেট মুসলিমবিদ্বেষী বর্ণবাদী চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ, যা কিনা পশ্চিমের Anti-Semitism, Xenophobia, Racism, Intolerance প্রভৃতি পরিভাষার সমার্থক। অন্যথায় একটি সভ্যতার ইতিহাসকে রাতারাতি 'জঙ্গি', 'বর্বর' বানিয়ে দেয়া কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। ইংরেজি Phobia শব্দটার বাংলা হচ্ছে অহেতুক, অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক রকমের ভীতি। এ ধরনের ভীতি অনেক সময় অসুস্থতার পরিচায়ক। যেমন Hydrophobia (জলাতঙ্ক), Zoophobia (পশুভীতি), Social phobia (সামাজিক ভীতি)। পুরো পশ্চিমা সভ্যতা কি আজ ইসলামকে নিয়ে সেরকম কোনো

www.pathagar.com

অসুস্থতায় ভুগছে? তারই নাম কি ইসলামোফোবিয়া? অথবা ইসলাম কি কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি বা জন্তু-জানোয়ারের মতো কোনো একাট্টা জিনিস, যাকে ভয় পেতে হবে?

মানবেতিহাসে ইসলামের অবদান একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। সাম্য, মানবাধিকার ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যুগান্তকারী অবদান ইতিহাস থেকে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। বিপ্লবী ভাবুক এমএন রায় একবার লিখেছিলেন, ইসলামের বিদ্রোহ মানবতাকে রক্ষা করেছে। সেই ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে আজকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের কেজো যুক্তির শেষ নেই।

ইসলাম আতঙ্ক কেন আজ পশ্চিমাদের তাড়া করে ফিরছে সেখানকার পণ্ডিতরা তার একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন। অরুচিকর ঠেকলেও সেগুলোর উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

১. ইসলাম হচ্ছে একমার্গী (Monolithic) ধর্ম, যা কিনা নিশ্চল ও পরিবর্তনবিমুখ।

২. এই ধর্ম অন্যের মূল্যবোধের সঙ্গে শরিক হতে চায় না। এটা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, অন্যকেও প্রভাবিত করে না।

৩. পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় ইসলাম অনেক নিচুস্তরের। এই ধর্মাবলম্বীরা বর্বর, যুক্তিহীন, আদিম ও যৌনতাড়িত।

৪. ইসলাম প্রকৃতিগতভাবে উত্তেজিত, মারমুখী, হুমকিস্বরূপ, সন্ত্রাসের সমর্থক, সভ্যতার সংঘাতের জন্য দায়ী।

৫. এটি একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ, যা কিনা রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

৬. মুসলিম কর্তৃক পশ্চিমের কোনো সমালোচনাকে সহজে গ্রহণ করা হয় না।

৭. ইসলামের প্রতি শত্রুতাকে, মুসলমানের প্রতি বৈষম্য ও মূলধারা থেকে মুসলমানদের অপসারণের পক্ষে যৌক্তিক কারণ হিসেবে দেখানো হয়।

৮. মুসলমানদের প্রতি শত্রুতাকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইসলামের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের উত্তর অনেকেই বিভিন্নভাবে দিয়েছেন; কিন্তু অজ্ঞানতা, অযৌক্তিকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, লুটেরা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র কি কখনও যুক্তিসঙ্গত বিচার-বিবেচনার প্রশ্রয় দেয়? সুতরাং পশ্চিমের বিবেচনায় এই ইসলামকে ঘৃণা করতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে, প্রয়োজনে শক্তির জোরে ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

www.pathagar.com

এই ইসলাম আতঙ্কের ব্যাপারটা এত রগরগে হয়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা হচ্ছে পশ্চিমা গণমাধ্যমের। যে কোনো যুদ্ধাবস্থার মতো তারাই ইসলামের চরিত্র হননে সবার আগে হাজির থাকে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী করপোরেট ব্যবস্থার স্বার্থ হাসিল করাই এই মিডিয়ার কাজ। মিডিয়াই ইসলামকে অবিরত 'জঙ্গি', 'বর্বর' হিসেবে চিত্রিত করছে এবং Islamic Jerrorism, Islamic Bomb, Violent Islam প্রভৃতি পরিভাষার নিপুণ ব্যবহার করে ইসলামের একটি নেতিবাচক ইমেজ খাড়া করেছে।

অনেকের ধারণা, সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেসের প্রতিবাদে ব্রিটিশ মুসলমানদের ভূমিকা এবং ৯/১১-এর ঘটনা ইসলাম আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, পাশ্চাত্যে বেশি বেশিসংখ্যক মুসলমানের উপস্থিতিও ইসলাম আতঙ্কের স্ফীতি ঘটিয়েছে। যে কারণই হোক না কেন, পাশ্চাত্যের খ্রিস্টীয় মানসিকতার কাছে ইসলাম কখনোই সমাদর পায়নি। ক্রুসেডের জামানা থেকেই পশ্চিমাদের ইসলামবিদ্বেষ গোপন কিছু বিষয় নয়। শুধু অবস্থা বৈগুণ্যে এই বর্ণবাদী চরিত্র বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নিয়েছে মাত্র। তথাকথিত সেকুলার পশ্চিমের আচরণ ইসলামের ক্ষেত্রে রাতারাতি কম্যুনাল হয়ে যায়। ইসলামোফোবিয়ার কারণে সামাজিকভাবে পাশ্চাত্যের মুসলমানদের আজ নানাভাবে নিগ্রহ ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়। পুরো পশ্চিমা জগতে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ ও ভয়ভীতির মতো ঘটনা এখন অহরহ ঘটছে এবং তাদের সংস্কৃতিকে অনবরত কটূক্তি করা হচ্ছে। যেমন : পশ্চিমা দেশগুলোতে পর্দানশীন মেয়েদের অনেক সময় হিজাব টেনে খুলে ফেলা হয়, মুসলমানদের লাদেন হিসেবে ডাকা হয়। এমনকি তাদের দিকে থুথু নিক্ষেপ করা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফ্রান্সে সেকুলারিজমের কথা বলে আইন করে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ডেনমার্কের পত্রিকা Jyllands Pasten রাসূলকে (সা.) ব্যঙ্গোক্তি করে কার্টুন প্রকাশ করেছে!

ইসলামোফোবিয়ার সাম্প্রতিক নমুনা হচ্ছে নিরপেক্ষ বলে পরিচিত সুইজারল্যান্ডের মানুষ রীতিমত গণভোট দিয়ে মসজিদের মিনার নির্মাণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, এটা মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত; কিন্তু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় গণভোট দিয়ে মসজিদের মিনার নির্মাণে নিষেধাজ্ঞার মতো ঘটনা প্রমাণ করেছে ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতা এমনকি রাষ্ট্রের সেকুলার হওয়ার দাবি কতখানি হাস্যকর। এটা আর যাই হোক, সেখানকার বিঘোষিত ধর্মীয় স্বাধীনতা, পরমতসহিষ্ণুতা

www.pathagar.com

ও বহুত্বের দাবির কোনো প্রমাণ হতে পারে না। এটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে পশ্চিমা সমাজ ও সংস্কৃতি মুসলমানদের প্রতি কতখানি বৈষম্যমূলক। তাদের সেখানকার স্রেফ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই মনে করা হয়।

Islamophobia'র মতো পশ্চিমের বিদ্বৎসমাজ Islamo Fascism নামে আরেকটি শব্দ ইদানীং চালু করেছেন। Stephen Schwartz, Christopher Hitchens, Malise Ruthven প্রমুখ লেখক তাদের লেখায় এ শব্দটা অহরহ ব্যবহার করেন। বিশেষ করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নায়করা প্রচার-প্রপাগান্ডার উদ্দেশ্যে এই শব্দটা চালু করতে বেশি আগ্রহী হন। ইসলামকে ফ্যাসিবাদী আদর্শের সঙ্গে তুলনা করার পেছনে পশ্চিমের উদ্দেশ্য হলো এর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখার বৈধতা প্রতিপন্ন করা।

এই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতা আর তার মানবাধিকার বিষয়ক বিচার-বিবেচনা। এডওয়ার্ড সাঈদ ইসলামোফোবিয়া সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন, এটি হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতার ঐতিহ্যের অংশ : Secret sharer in more general, antisemitic, western tradition.

আজকের বিশ্বব্যবস্থা যেহেতু ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, তাই সঙ্গত কারণেই ইসলাম আতঙ্ক শুধু পশ্চিমের খ্রিস্টীয় সমাজে সীমিত নেই। এই বর্ণবাদ আজ অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও প্রভাবিত করছে। ভারতে বিখ্যাত সাচার কমিটি দেখিয়ে দিয়েছে সেখানকার মুসলমানরা কিরকম ভয়াবহ অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার। শুধু তাই নয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে যেখানে প্রগতিশীল বলে পরিচিত বামপন্থীরা গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে দোর্দণ্ডপ্রতাপে শাসন করছে সেখানকার মুসলমানদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও চাকরি-বাকরিতে তাদের অবস্থান মাত্র ৩ শতাংশ।

সমাজতান্ত্রিক চীনে উইঘুর মুসলমানদের অবস্থাও তথৈবচ। তারা আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ হান চীনাদের জুলুমবাজির শিকার। তাদের ধর্মীয় আজ্ঞা পালনে বিভিন্ন সময় বাধা দেয়া হয়। হজ ও রোজা পালনকে নিরুৎসাহিত করা হয়। কোরআনের ওপর সেন্সর আরোপ করার চেষ্টা করা হয়। মোটকথা, সেখানকার কমিউনিস্ট প্রশাসন আজ সন্ত্রাস বিরোধিতার নামে মুসলমানবিরোধী অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যাতে দুনিয়ার মানুষের চোখে ধুলো দেয়া যায়।

উল্লেখ্য, ইসলামোফোবিয়া আজ শুধু অমুসলিমদের ব্যাপার নয়, ইসলামের প্রতি এই ঘৃণা মুসলিম সমাজের ভেতরকার সেই অংশের মধ্যেও আছে, যারা

www.pathagar.com

কিনা ইসলাম ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমা ব্যবস্থাকে উৎকৃষ্ট বিবেচনায় আপন করে নিয়েছে। এরাই মুসলিম সমাজে কমবেশি সেকুলার ও প্রগতিশীল বলে পরিচিত।

৩.

ইসলামোফোবিয়া নামের আধুনিক বর্ণবাদ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার অবধারিত পরিণাম। এটা আজকের বিশ্বব্যবস্থা কর্তৃক ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর ওপর আরোপিত একটা ঘটনা। সুতরাং এই বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং একে অসম্ভব করে তোলাই হচ্ছে এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় জরুরি কাজ। আজকে ইসলামপ্রধান ভূখণ্ডগুলো সারা দুনিয়ার মজলুম জনগণের প্রতীক হয়ে ওঠেছে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই-সংগ্রামের আন্তর্জাতিক ভরকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর পক্ষে না দাঁড়ালে একালে কেউ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই করার দাবি করতে পারবে না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সেই ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্য বিমূর্ত কথাবার্তায় পর্যবসিত হবে। অনেক ইসলামবাদী নেতা, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী বলে থাকেন বহুত্ববাদী বিশ্বব্যবস্থায় টিকে থাকতে হলে মুসলমানদের আজ ইসলামোফোবিয়ার কারণ দূর করতে হবে। একথা তারা সজ্ঞানে না অজ্ঞানে বলেন জানি না, তবে এর মাধ্যমে পুরো মুসলিম সমাজকেই যেন ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ছকের মধ্যে নিয়ে আসার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইসলামোফোবিয়া নামের বর্ণবাদ মুসলিম সমাজের কোনো সমস্যা নয়। সব ধরনের বর্ণবাদ, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্ধত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ আজ তার হীনউদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামকে 'বর্বর', 'জঙ্গি' ধর্ম হিসেবে প্রচার করে। তার শরীরে ইসলামোফোবিয়ার লেবেল সেঁটে দেয়। এই কলঙ্ক মোচনের দায় মুসলমানরা নেবে কেন? এই মুহূর্তে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে–এই কলঙ্কলেপনকারী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়া এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা। একই সঙ্গে আমাদের ভেতরকার সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী শ্রেণীগুলো বিনাশের জন্য লড়াই করা। মনে রাখতে হবে, আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই কখনও শেষ হয় না, যতক্ষণ না সাম্রাজ্যবাদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলা যায়।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের হামাস হিস্টিরিয়া

১৯৭৯ সালে ঘটে যাওয়া ইরান বিপ্লবের পর লড়াকু বুদ্ধিজীবী মরহুম এডওয়ার্ড সাঈদ Covering Islam নামে এক কেতাব লিখে হইচই ফেলে দেন। সেই কেতাবের প্রতিপাদ্য ছিল কিভাবে পশ্চিমা মিডিয়া ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীকে বিকৃত, বিচ্যুত ও উল্টাপাল্টা করে দুনিয়ার সামনে হাজির করে। ওই কেতাবে ইরান বিপ্লব ও তার আধ্যাত্মিক নেতা ইমাম খোমেনির ওপরও কথাবার্তা আছে। বিশেষ করে খোমেনির বার্তাকে কিভাবে মিডিয়া বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্করভাবে পরিবেশন করে তার ব্যাপারটা। আমেরিকার টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা সর্বত্র ইমাম খোমেনিকে যেন খোদ শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে প্রচার করতে থাকে। আজো ইয়াঙ্কিদের মিডিয়া ইরানকে Axis of Evil-এর অংশ হিসেবেই হাঁকডাক করে। সেই সময় পশ্চিমের বিচারে মুসলিম বিশ্বের জন্য যা কিছু অশুভ, অপবিত্র ও মন্দ, মিডিয়ার জোরে এর সবকিছুর ভাবমূর্তি হয়ে ওঠেন ইমাম খোমেনি। ইয়াঙ্কিদের মতে, মুসলিম বিশ্বের সব রকমের শয়তানি তৎপরতার নেতা হলেন খোমেনি, আমেরিকার শত্রু খোমেনি, গণতন্ত্রের শত্রুও খোমেনি। খোমেনির চেহারাটা রাতারাতি গোটা পশ্চিমা সভ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে গেল ইবলিসের মতো। এটাই ছিল তখনকার মার্কিন মিডিয়ার কৃতিত্ব।

এর কারণটা আজ আমাদের সবার জানা। ইমাম খোমেনির জন্যই ইরানের সাধারণ মানুষ আমেরিকার দাসানুদাস রেজা শাহর স্বৈরাচারী ও জালিম শাসন থেকে মুক্তি পায়। ইমামের কারণেই যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বে তার এক নির্ভরযোগ্য বরকন্দাজ হারায়। সবশেষে আজকের এক মেরু বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রটির গালে কড়া একটা চড়ের মতো এসে লাগে ইরানি ছাত্রদের দ্বারা তেহরানে মার্কিন দূতাবাস দখল। আজ যেমন ইরাকের তরুণ ও সাহসী সাংবাদিক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের গালে জুতা ছুড়ে একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের চোখে ইমাম খোমেনি হচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্বৃত্ত ও ইরান হচ্ছে সবচেয়ে শয়তানি রাষ্ট্র। যে ইরানের সাধারণ মানুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা ইমাম খোমেনিকে মনে করে মুক্তির দূত; আর ইরান

www.pathagar.com

বিপ্লবকে মনে করে, শিকল ভাঙার হাতিয়ার; সেই খোমেনি পশ্চিমের চোখে হয়ে ওঠেন শয়তানের প্রতিভূ।

পশ্চিমের এই হিস্টিরিয়া নতুন কিছু নয়। যে বা যারা পশ্চিমের অপকীর্তি, অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, মোকাবিলা করার কথা বলে সে-ই দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসী। এ যাবতকাল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদী জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে, হত্যা-সন্ত্রাস-যুদ্ধ ও দুনিয়াব্যাপি প্রাণের সঙ্কট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যেই রুখে দাঁড়িয়েছে তার কপালে একই তকমা জুটেছে। ল্যাটিন আমেরিকার চে গুয়েভারা, আফ্রিকার নক্রুমা কিংবা আমাদের তিতুমীরদের কি একইভাবে সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্ত বলা হয়নি? আজ হামাসের ভাগ্যেও ইতিহাসের একই পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

হামাস কোনো ভুঁইফোড় সংগঠন নয়। ফিলিস্তিনের মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসাকে পুঁজি করেই গড়ে উঠেছে এই দলটি। এদের বিভিন্ন রকমের সামাজিক কার্যক্রম সেখানকার মানুষকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে। ইয়াসির আরাফাতের এক সময়কার ফাতাহ দলটির মতোই এটি দারুণভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফাতাহ'র বিপ্লবী কর্মসূচি থেকে পশ্চাদপসরণ, এর নেতাদের দুর্নীতি, দুর্বিনীত আচরণ, বিশেষ করে আমেরিকার পো ধরা নীতি ফিলিস্তিনের মানুষকে বিকল্প নেতৃত্বের সন্ধানে উজ্জীবিত করে এবং তখনই হামাস এগিয়ে আসে। আমেরিকার দ্বারা সরাসরি ইন্ধনপ্রাপ্ত ইসরাইলের মতো একটি শক্তিধর ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও ভিন্নমতাবলম্বী হামাস ব্যাপক সাফল্য পায়। নির্বাচনের ফলাফল সামান্য উল্টাপাল্টা করার সুযোগ থাকলে ইসরাইল তা করতে ছাড়ত না। তারপরে অবশ্য নানা ছলচাতুরিতে ক্ষমতায় যাওয়ার পরও হামাসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। হামাসের মতো ডানপন্থী ও ইসলামবাদী দলগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সহযোগিতায় ক্ষমতায় এলেও এদেরকে ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হয় না। কারণ আমেরিকার ভাষায় এরা দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসী। তাই এদের দমন করাই ন্যায্য। আজকে গাজায় রক্তস্নান চলছে সেই 'ন্যায্যতা' প্রতিপন্ন করার জন্য। হামাস কেন দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসী–তার উত্তরও আমাদের জানা আছে। কারণ হামাস মনে করে, ভূমিপুত্রদের সরিয়ে দিয়ে আধুনিক সভ্যতার মহাপুরুষরা তাদের ইনকিউবিটরে ইসরাইল নামক অবৈধ দখলদার সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রটিকে পেলেপুলে বড়

www.pathagar.com

করেছে। আজকের মধ্যপ্রাচ্যের রক্তস্নানের জন্যও দায়ী আধুনিক সভ্যতার এই বরকন্দাজরা। এই কারণেই হামাসের ওপর পশ্চিমাদের এত গোস্বা।

সভ্যতার রথীরা এতকাল আমাদের পাঠ দিয়েছেন আধুনিক সভ্যতা নাকি সেকুলার, উদার, মানবিক ও বহুত্ববাদী। যে সভ্যতা চারদিনের শিশুকেও রেহাই দেয় না, শিশুহত্যা, নরহত্যা, প্রাণের সঙ্কট সৃষ্টি ছাড়া যে সভ্যতার আত্মা শান্তি পায় না; মারণাস্ত্রের ভার ছাড়া যে সভ্যতা মাজা খাড়া করতে পারে না, সেই সভ্যতাকে এখন আমাদের পুনর্পাঠ করে দেখা দরকার। অনেক সময় আমরা সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান থেকে কিংবা যুগোপযোগিতা ও বহু সাংস্কৃতিকতার ধোঁয়ার আড়ালে ইসলামের পুনর্পাঠ বা সংস্কার কিংবা যুগোপযোগী পরিবর্তনের প্রস্তাবের কথা শুনতে পাই। এসবই আসলে সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্যের কাছে ইসলামকে সহনশীল ও মানানসই করে তোলার কৌশল। বিদ্যমান সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার জ্ঞানগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্যই ইসলামের পুনর্পাঠের কথা এসেছে। ইসলামের পুনর্পাঠের কথা তোলা হলেও আধুনিক সভ্যতা ও তার সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পুনর্পাঠের কথা একবারও কেউ বলেনি। অথচ এটাই আজকের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিসকোর্স হওয়া চাই। কেননা বিদ্যমান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে ভাঙা, বদলানো কিংবা রূপান্তর ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়।

গাজার রক্তস্নান থেকে দুটো জিনিস অন্তত পরিষ্কার হয়েছে। হামাসের ওপর ইসরাইলি তাণ্ডবকে বরাবরের মতো খোলাখুলি সমর্থন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস। প্রেসিডেন্ট বুশের মতও তাই। এ রকম যে হবে এটা সবাই স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে; কিন্তু নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ওবামা দিন বদলের গান গেয়ে এ বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি। তার মানে যুক্তরাষ্ট্রের খোলাখুলি ইসলাম বিদ্বেষের তিনিও ব্যতিক্রম নন। এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক পার্থক্য বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব বোধ হয় থাকছে না। আমেরিকার জাতীয় রাজনীতিতে রিপাবলিকান-ডেমোক্র্যাটদের ভেতর মৌলিক পার্থক্য সেভাবে নেই। আবার বিশ্বায়নের এই যুগে সবকিছু মার্কিনিকরণের ভয়ে ভীত একদা কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে অনেক জায়গায়ই দেখা গেছে পশ্চিমের

www.pathagar.com

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় সমর্থক। বিশেষ করে ইসলামবাদীদের মোকাবিলা করতে কমিউনিস্টরা আজ আমেরিকার সমব্যথী-সহমর্মী। ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরে শত্রু-মিত্রের সব সংজ্ঞা রাতারাতি পাল্টে গেছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্নিহিত সব নিয়ম-কানুনও ভেঙে পড়ছে। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'সেকুলার' পাশ্চাত্য রীতিমত সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছে আবার আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলো গণতন্ত্রের দোহাই দিলেও ফিলিস্তিনের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে তোয়াক্কা করছে না। তাহলে এটা কিসের গণতন্ত্র বা সেকুলারিজম?

গাজার হলোকস্ট থেকে আর একটা জিনিস উঠে এসেছে। ইসরাইল হানা দিয়েছে হামাস-প্রধান এলাকায়। ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নয়। তার মানে ফাতাহ ইসরাইলের প্রতি সহনশীল অথবা ইসরাইলের দৃষ্টিতে ফাতাহ কোনো হুমকি নয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাঙ্গাত ইসরাইল চাইছে হামাস ও ফাতাহকে ভাগ করে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধাতে। এর সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই পক্ষের মিল আছে। একপক্ষ স্বাধীনতা ছাড়া আপস করবে না, আরেক পক্ষ আপসের চুক্তিতে রাজি। দেখার বিষয় হচ্ছে, সেকুলার চুক্তিবাদীরা (ফাতাহ) ইসরাইলের সহায়তায় ইসলামবাদী চুক্তিবিরোধীদের (হামাস) নির্মূল করতে চাইছে। এটাই আজ মুসলিম দুনিয়ার সার্বিক চিত্র। সেকুলার ও ইসলামবাদীরা পরস্পর মুখিয়ে রয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বতোভাবে এটাই চাইছে। কারণ একটা গৃহযুদ্ধের অবস্থাই সাম্রাজ্যবাদকে তাদের পা ফেলার জন্য প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করে দেয়। বলাবাহুল্য সেকুলারবাদীরা আজ প্রায় সবক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছে এবং পশ্চিমের আধিপত্যকে স্থায়ী করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে যে ইসলাম আজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করছে, সেই ইসলামের বিরোধিতা করতে তাই আধুনিক সভ্যতা ও আধুনিকতাবাদীদের এত উৎসাহ।

গাজার আগ্রাসন নিয়ে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমে যে রকম বয়ানই পরিবেশিত হোক না কেন, সেগুলো যে কেজো যুক্তি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমেরিকা, ইসরাইল ও তার সাঙ্গাতরা যুক্তি দিচ্ছে হামাসের ছোড়া রকেটের নৃশংসতার জওয়াব দিতেই নাকি এই আগ্রাসন। গত ২০ বছরে (আজ অবধি) গাজা থেকে ছোড়া হাজার খানেক রকেটে

www.pathagar.com

সর্বসাকুল্যে ২০ ইসরাইলি মারা যাওয়ার ভয়াবহতা নাকি পৃথিবী বুঝতে পারছে না। তার মানে এবারকার গাজা আগ্রাসনে ২০ দিনে সহস্রাধিক ফিলিস্তিনি হত্যার কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। আধুনিক সভ্যতা আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে। আমাদের অনেক আধুনিকতাবাদীও এসব কেজো যুক্তিতে মজেছেন বোধ হয়। অনেকেই বলেন, হামাস কেন রকেট ছুড়তে গেল? এসব কথায় করুণা বোধ করা ছাড়া আর কীইবা করার আছে। ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের যে বদ্ধমূল ভীতি, সাম্প্রদায়িক মনোগঠন, ঔপনিবেশিক ভাবনা, তার প্রকাশ রয়েছে এসব প্রতিক্রিয়ায়।

দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের মোসাহেবদের অথবা কালা সাহেবদের কথা হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী বলে পশ্চিমা সভ্যতাকে গালি দেয়া অর্থহীন। কারণ এর আগে ঔপনিবেশিকতা যেমন অসভ্য দেশগুলোকে 'সভ্য' করেছে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদও 'অনুন্নত' দুনিয়াকে 'আলোকিত' করবে, 'উন্নত বিশ্বে' পরিণত করবে। তার 'ফ্রিডম', 'ডেমোক্র্যাসি', 'হিউম্যান রাইটস', 'সিভিল সোসাইটি' কায়েমের জন্য সাম্রাজ্যবাদের দরকার আছে। এই জন্যই দরকার তালেবানদের হাত থেকে আফগানিস্তান, সাদ্দামের হাত থেকে ইরাক, 'সন্ত্রাসী' ও 'বর্বর' মুসলমানদের হাত থেকে নারীদের 'মুক্ত' করা। ঠিক এই জন্যই ভোটে সাম্রাজ্যবাদের খুবই না-পছন্দ হামাসকে নির্বাচিত করার জন্য ফিলিস্তিনের জনগণকে শাস্তি দেয়াই 'ইনসাফ'। গণতান্ত্রিক ফলাফল মানা তো দূরে থাক, গাজার রক্তস্নানের ভেতর দিয়ে মানুষ হত্যার যে উৎসব আমেরিকার মদতে ইসরাইল চালিয়ে যাচ্ছে তার গোড়ায় আছে এই তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিবাদকে নির্মূল করা। অর্থাৎ যে ইসলাম বা মুসলমানদের যে অংশ সাম্রাজ্যবাদের এই 'সভ্যকরণ' অভিযানে হাত মিলিয়েছে অথবা সাম্রাজ্যবাদের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছে, তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দোস্তি চলছে; কিন্তু এই তথাকথিত 'ফ্রিডম', 'ডেমোক্র্যাসি'র শিরোনাম সর্বস্ব সাম্রাজ্যবাদের 'সভ্যকরণ' প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে ইসলাম বা ইসলামবাদী গোষ্ঠী রুখে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকেই সাম্রাজ্যবাদ 'সন্ত্রাসী', 'জঙ্গি' বানিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকা এক সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছে। সাম্রাজ্যবাদের কথা হলো, 'ইসলামী জঙ্গিদের' নির্মূল করা খুবই জরুরি। কারণ এটা ছাড়া সভ্যতা রক্ষা পাবে না। তাই

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ একই সঙ্গে বর্ণবাদী যুদ্ধও বটে। কারণ তাদের মতে, ইসলামী 'বর্বরদের' হাত থেকে সভ্যতা রক্ষা করা শুধু রাজনৈতিক বা সামরিক দায়িত্ব নয়, নৈতিক দায়িত্বও বটে।

সাম্রাজ্যবাদের এই বিচার-বিবেচনা সমর্থন করার লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের মিডিয়া যাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করে–তালেবান, সাদ্দাম, হামাস, হিজবুল্লাহ, ইসলাম–তাদের একই রকম যুক্তি ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে শত্রু গণ্য করার মতো লোক আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলোতেও বিস্তর আছে। সেই হিসেবে আমাদের মিডিয়া অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে সাম্রাজ্যবাদের দেখভাল করে। আমাদের সমাজে যারা 'প্রগতিশীল' বলে দাবি করে তাদের প্রগতির প্রকল্প, সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের সমার্থক। ইতিহাসের গতি প্রক্রিয়ার ভেতরে যে জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ইসলাম সাম্রাজ্যবাদীদের আজ বুখে দাঁড়িয়েছে, তার কোনো বিচার-বিশ্লেষণ না করে আমাদের প্রগতিশীলরা প্রভুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হুক্কা হুয়া বলে শোরগোল শুরু করেন মাত্র। তাদের শোরগোলের কারণ অন্য। সে আলোচনায় পরে আসছি। তাই আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার শ্লোগান দিয়েই শুধু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মূল্যায়ন সম্ভব নয়। যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই মার্কা শ্লোগানের ভেতরে আসলে বিদ্যমান ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার একটা অপকৌশল কাজ করে বলেই মনে হয়। বরং আজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যারা বুখে দাঁড়াচ্ছে, অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে, তাদের লড়াই-জেহাদকে কে কিভাবে দেখছে তার দ্বারাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সত্যিকার মূল্যায়ন হওয়া সম্ভব। যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে থেকে কিংবা ফিলিস্তিন, ইরাক থেকে বহু দূরে নিরাপদ ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত আমাদের পেটিবুর্জোয়া প্রগতিশীল বন্ধুরা বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে যে ভোগবাদী আকাঙ্ক্ষা ক্রমজাগ্রত রয়েছে–সেসব আকাঙ্ক্ষার স্থানগুলোতে তথাকথিত 'জঙ্গি', 'মৌলবাদী' ইসলাম হস্তক্ষেপ করে কিনা এই ভয়ে তারা সার্বক্ষণিক তটস্থ থাকে। আর্ত-চিৎকার করতে থাকে এবং উপায়ন্তর না দেখে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কোরাসে গলা মেলাতে শুরু করে। তখনই বোঝা যায় তাদের ইসলামের প্রতি নির্বিচার বিরোধিতার আসল তাৎপর্য কী।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রগতিশীলদের আন্তঃসম্পর্ক বোঝার জন্য আর একটা জিনিস নিরীক্ষা করা দরকার। পশ্চিমা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা বুঝি যুক্তি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদার নৈতিকতা ইত্যাদি। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার কাঠামো যে সাম্রাজ্যবাদ দিয়ে তৈরি এটা কখনো আমরা ভাবি না। এ বিষয়ের দিকে মরহুম এডওয়ার্ড সাঈদ আমাদের অনেক আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আমাদের প্রগতিশীলদের মস্ত বড় ভুল হচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তারা সাম্রাজ্যবাদ থেকে পৃথক হিসেবে বিবেচনা করেন। তাদের কথা হলো, সাম্রাজ্যবাদ চাই না; কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা চাই। ভাবটা এমন পানিতে নামব; কিন্তু পা ভেজাব না। এই তথাকথিত প্রগতিশীলতা তাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হওয়ার ন্যাকামি করে; কিন্তু আধুনিক সভ্যতা যে সাম্রাজ্যবাদী গতি প্রক্রিয়ার ফল–এটা বুঝে ওঠার হিম্মত করতে পারে না। ফলে তারা ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তি, সহনশীলতার কথা বলে বটে; কিন্তু এগুলো যে সাম্রাজ্যবাদের কারখানায় তৈরি এটা বুঝে আসে না। একইভাবে বুদ্ধি বা সংস্কৃতি বা রাজনীতির জায়গা থেকে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা দূরে থাক, অনেক সময়ে সাম্রাজ্যবাদের প্রলোভনে পড়ার মতো ঘটনাও তাদের পক্ষে অবিচিত্র কিছু নয়।

সাম্রাজ্যবাদকে বোঝার জন্য এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে, তথাকথিত পশ্চিমা সভ্যতা বা আধুনিক সভ্যতা কোনো সেকুলার সভ্যতা নয়। পশ্চিমা সভ্যতা হচ্ছে খ্রিস্টীয় সভ্যতার একটা আধুনিকীকৃত রূপ। সুতরাং ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমা সভ্যতার সম্পর্কটা ঠিক সেকুলার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পশ্চিমা সভ্যতার ভেতরে নিজের মতো করে কিছু সেকুলার চরিত্র হয়তো আছে; কিন্তু ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি যেকোনো ধর্মীয় রাষ্ট্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদকে মূল্যায়ন করতে হলে খাঁটি মার্কসবাদীদের মতো শুধু একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে গণ্য করলে চলবে না কিংবা কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবেও আর চালানো যাবে না। এটা একই সঙ্গে সংস্কৃতির লড়াই হিসেবেও গণ্য করতে হবে।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই নয়, একই সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার হানাদারি ও আগ্রাসী চরিত্রের বিরুদ্ধে লড়াই। সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই তাই আধুনিক সভ্যতার কোনো মানদণ্ড গ্রহণ করে সম্ভব নয়। উল্টো আধুনিক সভ্যতা তার জুলুমবাজির ধারা ও ইতিহাসের মধ্যে মানুষের যে সব বিকল্প স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে, যা কিছু 'অসভ্য', 'বর্বর', 'অনুন্নত', 'পশ্চাৎগামী', 'প্রগতির বাধক' হিসেবে বাতিল করতে চেয়েছে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে সেসব এলাকা নতুন করে সফর করা দরকার। সাম্রাজ্যবাদকে বোঝার জন্য লক, হবস, বেন্থাম, মিল, দেকার্তের বাইরে এসে আজকে নতুন করে আফগানি, ইকবাল, মোহাম্মদ আসাদ, আলী শরিয়তি, এডওয়ার্ড সাঈদ প্রমুখকেও পাঠ করা চাই। পাঠ করা চাই তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ আহমদ শহীদ, উমর আল মুখতারের হাড় ও করোটির ভেতর লুকিয়ে থাকা ইতিহাসকে, যা কিনা এতকাল সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস প্রকল্প দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। হামাস এই ইতিহাসের করোটি থেকে জেগে ওঠা শক্তি।

কমিউনিজমের পতনের পর পশ্চিম থেকে তারস্বরে ঘোষণা করা হয়েছিল ইতিহাস ফুরিয়ে গেছে। সে পৌঁছে গেছে তার অকুতোস্থলে। যুদ্ধ, হানাদারির দিন শেষ। এখন শুধু শান্তি আর শান্তি।

না। ইতিহাস ফুরোয়নি। সাম্রাজ্যবাদ বা আধুনিক সভ্যতা বা পশ্চিমা সভ্যতা বা খ্রিস্টীয় সভ্যতা তার চরিত্র পাল্টায়নি। সাম্রাজ্যবাদের লড়াই চলছে ইরাকে, আফগানিস্তানে, গাজায়। এই বৈশ্বিক লড়াইয়ের বিরুদ্ধে ইসলাম আজ এক নতুন তাত্ত্বিক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, ইসলামের সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক ভিত্তিকে পাটাতন ধরে আরেকটি বৈশ্বিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান ঘটছে। যা কিনা সাম্রাজ্যবাদের বৈশ্বিক শক্তির বিরুদ্ধে আরেকটি প্রতিযোগী বৈশ্বিক শক্তির রূপ নিয়ে লড়ছে। এই লড়াকু বৈশ্বিক শক্তির যৌক্তিকতাকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। হামাস এই অভ্যুত্থানকামী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিবাদী শক্তির অংশ। হামাস সাম্রাজ্যবাদের হানাদারির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার প্রতীক। আজকের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে ভেঙে মানুষের সত্যিকারের মুক্তি অর্জন করতে হলে এসব অভ্যুত্থানকামী শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

ইতিহাস ও সাম্রাজ্যবাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সিরাজউদ্দৌলা ও সাম্রাজ্যবাদ

বাংলার জাফর আর দক্ষিণের সাদিক,
মানুষের লজ্জা, ধর্মের লজ্জা, দেশের লজ্জা!
না মানার, না ভরসার, না চাইবার,
একটা জাতের ধ্বংস হয়েছে তাদের কৃতকর্মে।
প্রত্যেকটা জাতিবন্ধন আলগা করে দিয়েছে একটা জাতের কূটকলা,
নষ্ট করেছে রাজছত্র ও বিশ্বাস আপন দুষ্কর্মে।
জানো না কি এ ভারতভূমি
দেশবাসীর স্পর্শময় মনের স্নেহধন!
সর্বদেশে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে যার প্রভা,
সে আজ ধুলো আর রক্তের মধ্যে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে?
কে বুনেছিল গোলামীর বীজ এই মাটিতে?
সে এই দুরাত্মার হাতে গড়া অপকৃতি।
জাবিদনামা–ইকবাল।

উপরোদ্ধৃত কবিতাটি নেয়া হয়েছে ইকবালের বিখ্যাত জাবিদনামা কাব্য থেকে। কবি মনে করতেন নিজ দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা নিকৃষ্টতম অপরাধ। কবি তার জাবিদনামা কাব্যের ভেতর দিয়ে মুরশীদ রুমীর অধিনায়কত্বে যে বিশ্বব্রহ্মান্ড সফরের কাহিনী বিবৃত করেছেন, সেখানে শনি গ্রহে স্থিত দোজখের অধঃস্তন অন্ধকার ও দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চলের এক বর্ণনা আছে, যেখানে বিশ্বাসহন্তাদের জন্য স্থান সংরক্ষিত। ইকবালের আত্মা সে স্থানে আবির্ভূত হয়ে বাংলার মীর জাফর আর দক্ষিণের সাদিক–আমাদের সাম্প্রতিকতম ইতিহাসের এই দুই বিশ্বাসহন্তা পাপিষ্ঠকে এভাবে অভিযুক্ত করেছেন। ইকবাল সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে কবিতা লেখেননি। লিখলে অবশ্যই তিনি তাকে মীর জাফরের বিপরীতে দেশপ্রেমিকের স্থান দিতেন কোনো সন্দেহ নেই, যেমন তিনি দাক্ষিণাত্যের টিপু সুলতানকে দিয়েছিলেন।

ইকবালের বিচারের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা একমত হয়নি। আশার কথা, দেশপ্রেমিক মানুষ তার সঙ্গে সহমত হয়েছে। দেশপ্রেমিক মানুষ মাত্রই

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিপক্ষ। কারণ তারা সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র ও কূটিলতার বিরুদ্ধে। যেমন সিরাজউদ্দৌলা দেশপ্রেমিকের মতো ইংরেজের ভারত জয়ের অভিযানে বাধা হয়ে দাঁড়ান। আর এই অপরাধেই তাকে ইংরেজের প্রচারাভিযানের বলি হতে হয়। সুবে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার নবাবি কেড়ে নেয়ার পর ইংরেজরা তাদের দুষ্কর্মের বৈধতা দেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগে। তাই তারা সিরাজের সব রকম ভাবমূর্তি তছনছ করতে সব শক্তি প্রয়োগ করে। এটাই সাম্রাজ্যবাদীদের খাসলত। তারা যে দেশেই উপনিবেশ গড়েছে সেখানকার পূর্বতন শাসকদের বিরুদ্ধে এই নিষ্ঠুর প্রপাগাণ্ডা যুদ্ধ তারা চালিয়েছে। আজকের সাদ্দাম হোসেন, বিন লাদেন, শেখ ইয়াসিন, ইমাম খোমেনির বিরুদ্ধেও একই কাজ করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

সিরাজ মাত্র ১৫ মাস বাংলার নবাব ছিলেন। এর আগে তার নানা আলিবর্দী খাঁ ১৫ বছর নবাবি করেছেন। নানা আলিবর্দী খাঁ ইন্তেকালের ৪ বছর আগে সিরাজকে তার ওয়ারিশ হিসেবে ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় সিরাজের উত্তরাধিকারের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হলেও তার দুশমনের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। আর তার চরিত্র হননের পাকাপোক্ত একটা ব্যবস্থা হয়। সিরাজ ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে যুদ্ধে নামতে হয়। নামতে হয় অভ্যুত্থান দমনের সংগ্রামে। সিরাজকে তিন ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়।

প্রথম দলে ছিল তার রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় ও নানা আলিবর্দী খাঁর প্রশ্রয়প্রাপ্ত অমাত্য, যারা সিরাজের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় দলে ছিল বাংলার সেকালের উঠতি হিন্দু পুঁজিপতি ও বণিকশ্রেণী, যারা 'যবনরাজ' খতম করার মহার্ঘ্য সুযোগ গ্রহণ করে। শেষতম দলে ছিল বিদেশি ইংরেজ, যারা ভারত জয়ের অভীষ্ট লক্ষ্যে সচেতনভাবে অগ্রসর হয়েছিল। এই তিনটি দলই সিরাজের পতন চেয়েছিল এবং তাদের বিভিন্ন রকম স্বার্থ সিরাজের পতনে এক সঙ্গে কাজ করেছিল। কোনো সন্দেহ নেই পুরো ষড়যন্ত্রের পিছনে ইংরেজরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং খুব পরিকল্পিতভাবে তারা এ কাজ সম্পন্ন করে, বিশেষ করে, মুর্শিদাবাদ দরবারের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও প্রভাবশালী হিন্দু বণিকদের তারা নিজেদের পক্ষে নিয়ে নেয়।

যেহেতু পুরো ব্যাপারটিই পরিকল্পিত, তাই সিরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়। সিরাজ সম্পর্কে যত কুৎসা,

www.pathagar.com

যত রটনা তার পেছনে ইংরেজেরই হাত। পতনের পর পরই এরা নবাব প্রাসাদের কতক উচ্ছিষ্টভোজী, সিরাজবিরোধী, ইংরেজ অনুরাগী ও পরবর্তীকালে ইংরেজ আশ্রিতদের দিয়ে ইতিহাস লেখায়। সিয়ারুল মুতাখখারিন, রিয়াজুস সালাতিন, মোজাফফর নামা ও তারিখে বাঙ্গালাহ এর কয়েকটা। এখানে সিরাজের আচ্ছা মতো চরিত্র হনন করা হয়। বহু বছর পর বাঙালি ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এই ইংরেজ অনুরাগীদের ইতিহাস বিচারের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। বিশেষ করে তাকে নিয়ে ইংরেজ কর্মচারী হলওয়েল প্রচারিত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীটি যে একান্তই বানোয়াট, সে কথা মৈত্রেয় মহোদয় বলতে ভোলেননি। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাদের লেখা বানোয়াট ইতিহাস গ্রন্থে দাবি করেছেন, বাংলার মানুষ সিরাজের বিরুদ্ধে ছিল, কারণ তার চরিত্র খারাপ ছিল। সুতরাং ইংরেজরা বাধ্য হয়ে সিরাজবিরোধিতায় যোগ দেয়। তারা অবশ্য এসব প্রশ্নের উত্তর দেননি বিদেশাগত ব্যবসায়ী হিসেবে এদেশে এসে তারা কেন বড় বড় সামরিক দুর্গ নির্মাণ করেছিল, বাদশাহর বিনা শুল্কে ব্যবসা করার দস্তককে তারা কেন অপব্যবহার করেছিল এবং নবাবের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীদের জেনে-শুনে তারা তাদের দুর্গে শুধু আশ্রয় দেয়নি, নবাবের দাবি মতো তাদের প্রত্যার্পণ করতেও অস্বীকার করে। কোনো স্বাধীন নবাব কি বিদেশাগতদের এরকম বেয়াদবি সহ্য করতে পারে? ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কথা শুনলে মনে হয়, নবাব ছিলেন জবর-দখলকারী; আর তারাই হচ্ছে এখানকার ন্যায়ত শাসক। তাই সিরাজের ইংরেজদের বিরোধিতা করা ছিল ভুল। এই ব্যাপারে সেকালের ঐতিহাসিক রবার্ট ওরমে, হেনরি ডডওয়েল, এস সি হিল থেকে আজকালকার সাম্রাজ্যবাদী লেখক পিটার মার্শাল, ক্রিস বেইলি, রজতকান্ত রায়, কীর্তি নারায়ণ চৌধুরী–সবার মুখেই একই রা। এরাই ইংরেজের সাফাই গাওয়ার স্বার্থে যতখানি প্রয়োজন সিরাজ চরিত্র হনন করেছেন। এসব উপনিবেশবাদের সমর্থক ঐতিহাসিকদের যুক্তি দেখুন : ইংরেজরা কোনো পরিকল্পনা করে বাংলা জয় করেনি। তার চরিত্র দোষে দেশবাসী ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ক্ষমতা ইংরেজের হাতে তুলে দেয়।

সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র আজ সবার কাছে পরিষ্কার। এদের দু'-একটা নমুনা হচ্ছে আজকের ইরাক বা আফগানিস্তান। এদের হাতে কোন দুঃখে দেশবাসী দেশের দায়ভার তুলে দেবে? যেখানে সিরাজ মোটেই অপশাসক

www.pathagar.com

ছিলেন না। বরং দেশের স্বাধীনতা নিয়ে ষড়যন্ত্রকারী ইংরেজ ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার তিনি সাহস করেছিলেন। এই ঐতিহাসিকদের প্রচারের ধরনগুলো আর একটু লক্ষ্য করা যাক।

সিরাজউদ্দৌলা মদ খায়। নারী ধরে হত্যা করে। সিরাজ জগৎ শেঠ, মহতাব চাঁদকে খতনা করিয়ে দেবে–এমন হুমকি দিয়েছে, রানী ভবানীর বিধবা মেয়ে তারা সুন্দরীর রূপে মজে গিয়ে তাকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠিয়েছে।

রবার্ট ওরমে ও ডডওয়েলের বর্ণনা আরো মারাত্মক। ওরমে লিখেছেন : মাত্রাতিরিক্ত মদে আর পরনারী চর্চায় তার আনন্দ। মদ খেয়ে তিনি এমনই মাতাল হতেন যে, যেটুকু বুদ্ধিশুদ্ধিও বা প্রকৃতি তাকে দিয়েছিল তাও লোপ পেত। (Robert Orme, A History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan, Vol II, London, 1803)

কেমব্রিজের ইতিহাসবিদ ডডওয়েল লিখেছেন : সিরাজউদ্দৌলা একটি হৃদয়হীন দানব, সে তার কৌতূহল মেটানোর জন্য গর্ভবতী ভদ্রমহিলার পেট চিরে ভেতরে কি আছে দেখত এবং মানুষভরা নৌকা ডুবিয়ে গঙ্গায় ডুবু ডুবু মানুষের আহাজারি দেখতে পছন্দ করত। (Henry Dodwell, Duplex and Clive, London, 1920)

ইংরেজ অনুরাগী রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, দেশের হিন্দু জমিদাররা সংঘবদ্ধ হয়ে দরবারের হিন্দু অমাত্যদের সহায়তায় যবন রাজত্বের অবসান ঘটাতে উদযোগী হয়েছিলেন। (রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং)। সুতরাং সিরাজের দুশমনের অভাব হয়নি। এসব দেখেই ঐতিহাসিক মোহর আলী যথার্থ উক্তি করেছেন : মীরজাফর যদি এই চক্রান্তে যোগ নাও দিত, তবু ষড়যন্ত্রকারীরা অন্য কাউকে খুঁজে নিত (M. Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol IA. Ryadh, 1985)

সিরাজের চরিত্র হনন তাই ইংরেজের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সিরাজের নানা আলিবর্দী খাঁ ছিলেন প্রশাসক হিসেবে যথেষ্ট শক্ত ও বাস্ত ববুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি তার জীবদ্দশায় সিরাজকে মাত্র ১৬ বছর বয়সে বর্গী দমনে মারাঠাদের বিরুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে বালাশোর পাঠান। আগের বছর সিরাজের পিতা জয়েনুদ্দীন ঘাতকের হাতে মারা গেলে আলিবর্দী

www.pathagar.com

তাকে ডেপুটি গভর্নর করেন। সিরাজ যদি এতই অকাল কুষ্মাণ্ড হন তবে নানা আলিবর্দীর মতো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শাসক তাকে কেন এসব যোগ্যতর পদে দায়িত্ব দিয়ে বসান! আলিবর্দী তার অন্য নাতি শওকত জংকেও এই পদে বসাননি। শওকত জং যে বিশ্বাসযোগ্য নন, তার প্রমাণ তো আমরা দেখছি ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। কোনো সন্দেহ নেই, সিরাজ সাহসী, যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ শাসক ছিলেন। তার অনমনীয়তা ও স্বাধীনচেতা বৈশিষ্ট্যের কারণেই তখনকার পরিবর্তনশীল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ইংরেজ ও স্থানীয় হিন্দু প্রভাবশালীরা একজোট হয়ে তার পতন ঘটায়। তার আত্মীয়রা ক্ষুদ্রস্বার্থে হয়ে দাঁড়ায় বিভীষণ।

তখনকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুরো ভারতের উপকূলজুড়ে তাদের নৌবাহিনীর আনাগোনা। বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্মাণ, সৈন্য ও অস্ত্র মজুত শ্রেফ বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ছিল না। তাদের এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ভাস্কো ডা গামার ভারতের সমুদ্র পথ আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে। ইতিহাস থেকে দেখছি পলাশীর মাঠে মুখোমুখি হওয়ার দুই মাস আগে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গাধিপতিরা সিদ্ধান্ত নেয়, সিরাজকে উৎখাত করতে হবে। এটা ছিল রীতিমত লিখিত প্রস্তাব। এ সময়ই তারা সিরাজের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগনামা প্রস্তুত করে।

তাদের কথা হলো সিরাজ অসৎ। এজন্য তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। তিনি ইংরেজ ব্যবসায়ীদের উৎপীড়ন করেছেন, ফরাসিদের সঙ্গে আঁতাত করেছেন এবং আলীনগরের সন্ধি ভঙ্গ করেছেন। দেশের ভেতরে বসে বিদেশাগতরা সার্বভৌম নবাব উৎখাতের ষড়যন্ত্র করবে আর এর বিরুদ্ধে নবাব কিছু বলবেন না, এটা কি করে সম্ভব? আসলে ইংরেজরা তখনকার মতো একটা পুতুল নবাব চেয়েছিল এবং তারা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল। তিনিই মীর জাফর, যাকে দেশপ্রেমিক ইকবাল তিরষ্কার করেছেন। ইংরেজরা এদেশের নওয়াবদের উদারতার সুযোগে যা করতে পেরেছিল, আজকের সাম্রাজ্যবাদীদের দেশে বসে কেউ যদি সমতুল্য কোনো কিছু করে, তবে তার তকদিরে কি লেখা হবে, তা আক্কেলমন্দকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

এদেশে ইংরেজের আগমন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। তারা মুসলিম শাসনকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। এটা ছিল তাদের আন্তর্জাতিক ক্রুসেডের অংশ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যবনরাজ উৎখাতকারীরা।

www.pathagar.com

সিরাজের কয়েক শতাব্দী আগে এখানকার 'যবনরাজ' উৎখাতের আর একটা চেষ্টা হয়েছিল। সুলতানী বাংলায় রাজা গণেশের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় নূর কুতুবুল আলম বলে এক বিখ্যাত আলেম ও বুদ্ধিজীবীর দূরদর্শী হস্তক্ষেপের ফলে। সিরাজের দুর্ভাগ্য তিনি এই ধরনের কোনো বুদ্ধিজীবীর সহায়তা পাননি। সিরাজকে নিয়ে ইংরেজের খিস্তি-খেউড়, প্রচার যুদ্ধের কারণ এখন স্পষ্ট হলো; সেই প্রচারযুদ্ধ যে কত ভয়ংকর, তাও আমরা দেখেছি। এই প্রচারে আমাদের একমাত্র নোবেল জয়ী কবিও কুপোকাৎ হয়ে গেছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন তার বই সিরাজউদ্দৌলা মারফত তার চরিত্রনাশের প্রতিবাদ জানান, তখন কবিও তার ইংরেজবান্ধবের বিরুদ্ধে অভিযোগে বিচলিত হন। রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেন, 'মৈত্রেয় মহাশয়' যদিও সিরাজ চরিত্রের কোন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিত উদ্যম সহকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।' কবির মতে, 'ইহাতে সত্যের শান্তি নষ্ট হইয়াছে এবং পক্ষপাতের অমূলক আশংকা পাঠকের মনে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইতিহাস)। কবির 'সত্যের শান্তি' কথাটা বড়ই ধোঁয়াশাপূর্ণ। তাহলে কি কবি চেয়েছিলেন–মৈত্রেয় মহোদয় সিরাজ 'উন্নত চরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না'–এই জাতীয় কিছু লিখবেন? তাহলে তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হয়তো উঠত না।

কবির ঈষৎ উদ্বেগের কারণ আমরা বুঝি। কারণ যারা এদেশে যবনদের শাসন উৎখাত করেছিল, তাদের সঙ্গে কবি পরিবারের সখ্য এবং এদেশে ইংরেজদের শাসন সংহত করতে তার পরিবারের সহযোগিতাও ইতিহাসে লেখা হয়েছে। তাই কবি দেশপ্রেমিক সিরাজের পক্ষে সর্বান্তঃকরণে দাঁড়াতে পারেননি। শুধু কবি নন, উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবীর সিলসিলাই গড়ে উঠেছে ইংরেজ তোষণ ও যবনবিরোধিতার ভেতর দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশ্বরগুপ্ত–সবার চেহারাই এক রকম। তাই এদের বিচারে সিরাজ শুধু শুধু সত্যের শান্তি নষ্টকারী হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। সিরাজের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের প্রচার-প্রচারণাই প্রমাণ করে তিনি সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত 'সত্যের শান্তি' যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য জীবন দিয়েও গেছেন। ইংরেজের প্রচারণাই প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট তিনি অন্তত সাম্রাজ্যবাদের দালাল ছিলেন না। দেশের মানুষের কাছে দেয়া ওয়াদা তিনি ভঙ্গ করেননি।

www.pathagar.com

ঈমান ও নিশান

১

ইংরেজি সাব-অলটার্ন (Sub-altern) শব্দটার বাংলা তরজমা করা হয়েছে নিম্নবর্গ হিসেবে। ইতালির মার্কসবাদী পণ্ডিত এ্যানটনিও গ্রামশি প্রথম ঐ শব্দটা ব্যবহার করেন। এই শব্দটার মাধ্যমে আজকাল বর্ণ, শ্রেণী, লিঙ্গ, নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মগত প্রভেদের কারণে উদ্ভূত সমাজের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় বেশ কিছুদিন ধরে পৃথিবীর নানা দেশের বাম ঘরানার পণ্ডিতরা একত্রিত হয়ে সাব অলটার্ন স্টাডিজ নামে জ্ঞানের এক নতুন শাখা উপস্থিত করেছেন। এর প্রথম প্রকাশ ১৯৮২-তে। ৮৩-তে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় সাব-অলটার্ন স্টাডিজ সম্মেলন। এই দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিকরা হচ্ছেন রনজিৎগুহ, জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, ডেভিড হার্ডিমান, শাহিদ আমিন, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, গৌতম ভদ্র প্রমুখ। এই সব তাত্ত্বিকরা নথিপত্র ঘেঁটে, তথ্য প্রমাণ হাজীর করে দেখাচ্ছেন যে আদতে নিম্নবর্গীয়দের ছিল স্বাধীন চৈতন্য, নিজস্ব স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা, প্রতিবাদ ও সংগ্রামের নিজস্ব ধরন, নিজস্ব সংগঠন ইত্যাদি। যে কোন সামাজিক- রাজনৈতিক রূপান্তরের পিছনে এই সব নিম্নবর্গীয়দের ভূমিকা কোন অংশেই ফেলনা নয়।

সাব-আলটার্ন স্টাডিজের তাত্ত্বিকদের মতানুসারে নিম্নবর্গীয় বা প্রান্তিকদের ভাষা ও মতামতকে উচ্চবর্গীয় বা ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের শ্রেণীগত স্বার্থে চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। উদাহরণ হিসেবে ব্রিটিশ আমলের তিতুমীরের বিদ্রোহ বা বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহের কথা বলা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক শক্তি ও তার অনুগ্রহপুষ্ট তথাকথিত সমাজের এলিট অংশ ও ইতিহাসবিদরা তিতুমীরের লড়াইকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করেনি। কারণ এই মূল্যায়ন তাদের শ্রেণীগত অবস্থানকে দুর্বল করে দিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি আমাদের উপমহাদেশ থেকে বিদায় নেয়ার পরও তিতুমীর সম্পর্কে সেই নেতিবাচক মূল্যায়নের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এর কারণ ঔপনিবেশিকতা আমাদের যে চিন্তার ছক কেটে দিয়ে গেছে তার বাইরে আজও আমরা আসতে পারিনি। সাব-অলটার্ন স্টাডিজ বা উত্তর ঔপনিবেশিক বিদ্যা ঔপনিবেশিক তথা পশ্চিমা চিন্তার আধিপত্যের জায়গাটিতে একটা বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছে বলে মনে হয়, যাতে কিনা এ যাবৎকালের প্রান্তিক ও অশ্রুত মানুষের কথা আমরা শুনতে পারি এবং তাদের বিকল্প বয়ানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ণ করতে পারি। ঔপনিবেশিক শক্তি ক্ষমতার দাপটে নিজেদের ছাঁচে ঢেলে ইতিহাস ও সংস্কৃতির পুনঃনির্মাণ করেছে এবং এই পুনঃনির্মিত ইতিহাস ও সংস্কৃতির জায়গাটিতে নিজেদের চিন্তা,

www.pathagar.com

মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে প্রচার করেছে। সেখানে অপর পক্ষের জন্য কোন জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়নি। সাব-অলটার্ন স্টাডিজের লক্ষ্য হচ্ছে এই 'অপর পক্ষের কথা' যাদেরকে শক্তির জোরে দাবিয়ে দেয়া হয়েছিল তা আবার তুলে আনা। শুধু তাই নয় পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতা উপনিবেশিত সমাজগুলোতে যে বিকৃতি তৈরি করেছে, সেই বিকৃতির ফলে যে আত্মপরিচয়হীনতা সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসার একটা ইংগিত দেয়াও সাব-অলটার্ন স্টাডিজের উদ্দেশ্য। ঔপনিবেশিকতার যে ভয়ংকর প্রভাব এককালের উপনিবেশিত দেশ ও সমাজগুলোতে এখনো রয়ে গেছে তার অবসান ঘটাতে হলে সাম্রাজ্যবাদী ও বর্ণবাদী জ্ঞানতত্ত্ব বা বয়ানের স্বরূপ উন্মোচন জরুরি। সাব-অলটার্ন স্টাডিজের তাত্ত্বিকেরা এই জিনিসটির উপর জোর দিয়েছেন বলেই মনে হয়। যদিও এই ঘরানার তাত্ত্বিকরা ইতিহাসের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু তারপরেও এটা অস্বীকার করা যাবে না ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশিত দেশের জনগণ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে বাতিল করে দেয়ার যে পৈশাচিক কর্মসূচী হাতে নিয়েছিল বা এখনও যা কিছু ক্রিয়াশীল তার বিরুদ্ধে সাব-অলটার্ন তাত্ত্বিকরা এক বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহাসিক- সমাজবিজ্ঞানীদের ভিতর এর কিছু কিছু প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসবিদ্যার গণ্ডি ছাড়িয়ে এর ঢেউ ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার অঙ্গনেও পড়েছে বলে মনে হয়।

সাব-অলটার্ন কিংবা উত্তর ঔপনিবেশিক কোন আলোচনার সূত্রপাত করতে গেলেই প্রথমেই আসবে ফিলিস্তিনের পণ্ডিত এডওয়ার্ড সাঈদের কথা। কারণ তিনিই এই ধরনের আলোচনাগুলোকে সর্বপ্রথম পণ্ডিতদের সামনে হাজির করেছেন। তার মশহুর কেতাব ওরিয়েন্টালিজম সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ভাবনা ও তর্কের ধারা পণ্ডিতদের মহলে যেমন বদলে দিয়েছে ঠিক তেমনি রাজনীতির কর্মকাণ্ডেও কিছুটা হলেও প্রভাব বিস্তার করেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে সাহেবদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ইত্যাদির মধ্যে উপনিবেশিত মানুষ ও তার সংস্কৃতিকে কিভাবে দেখা হয় তার একটা বয়ান আমরা এ বইয়ে খুঁজে পাই। পাশ্চাত্য কিভাবে প্রাচ্যকে কল্পনা করে, বিকৃত করে আর নিজের দুশমন জেনে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রচার প্রপাগান্ডা চালায় সে সবের সদর ও অন্দরের কায়কারবারগুলো সাঈদ যেভাবে ওরিয়েন্টালিজম কেতাবে তুলে ধরেছেন তার কৌশলটা বোঝা জরুরি। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে সাঈদের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পাশ্চাত্যের নিষ্ঠুর প্রচার প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি রাখা। ইসলাম মাত্রই বর্বর আর সন্ত্রাসীদের ধর্ম- পাশ্চাত্যের এবং তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের এই

www.pathagar.com

বদ্ধমূল বিশ্বাস ও প্রচার-প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে লড়াই যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের অংশ– এই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধারাকে তিনি শক্তিশালী করেছেন। আমরা একালে ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবিদ্যার রাজনীতি খুব ভালভাবে দেখছি সমকালীন যুদ্ধ-বিগ্রহে, যার নিষ্ঠুর পরিণতি হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ– যা কিনা মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে নিষ্ঠুর এক রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। সাঈদের এই রাজনৈতিক– সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের নীতিগত দিক শুধু বুদ্ধিজীবীতার ক্ষেত্রে অনন্য নয়, রাজনীতির নয়া দিগদর্শনের জন্যও জরুরি। সাব-অলটার্ন স্টাডিজের তাত্ত্বিকদের মধ্যে তার একটা প্রভাব অবশ্যই পড়েছে বলে মনে হয়। সাঈদ নিজে কত দূর মার্ক্সবাদী চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তা ঠিক স্পষ্ট নয় তবে তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লেখালেখি ও চিন্তা ভাবনা একালের বামঘরানার বুদ্ধিজীবীদের যে আলোড়িত করেছে সন্দেহ নেই এবং তাদের চিন্তার বুনিয়াদকে আরও শক্তিশালী করেছে তা বলাই বাহুল্য।

২

বাংলাদেশের ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যিনি প্রথম অস্ত্র তুলে নেন তার নাম তিতুমীর। পুরো নাম সৈয়দ নিসার আলী। ১৯ নভেম্বর, ১৮৩১ এ চব্বিশ পরগনা জেলার নারকেল বেড়িয়ার প্রান্তরে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে তিতুমীর শহীদ হন। সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুগ্রহপুষ্ট ইতিহাসকাররা তিতুমীরের সংগ্রামের প্রকৃত মূল্যায়ন করেননি। কারণ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে জনযুদ্ধ ও কৃষক বিদ্রোহের এই নায়ক ইংরেজ মুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঔপনিবেশিক প্রভুরা তার এই 'অপরাধ' ক্ষমা করেনি। এমনকি আমাদের তথাকথিত আধুনিকতাবাদীরাও তিতুমীরের লড়াইয়ের যথার্থ মূল্যায়ন করেননি। যা করেছেন তা ঔপনিবেশিক প্রভুদেরই চর্বিত চর্বন। এরা তিতুমীরের কথা লিখতে গিয়ে তাকে অত্যাচারী হিসেবে দেখেছেন। কেউ কেউ তাকে দস্যু আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন ধর্মোন্মাদ বিদ্রোহী অথবা Religious Bandit – ধর্মীয় দস্যু।

তিতুমীরকে ইতিহাসের এই আবর্জনার তলা থেকে তুলে এনেছেন পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র। গৌতম পরিশ্রমী গবেষক। সাব-অলটার্ন স্টাডিজের চিন্তাখাতকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে তিনি একজন উদ্যোগী পুরুষ। তিতুমীর ও বাংলার কৃষক বিদ্রোহকে নিয়ে তিনি একটা চমৎকার কাজ করেছেন। তার এই কাজের পরিণতি হচ্ছে 'ইমান ও নিশান' বইটি। ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবেলা করার সময় বাংলার সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের চৈতন্যে কিভাবে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, কিভাবে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার

www.pathagar.com

নিদর্শনকে তারা বাতিল করে দিতে চেয়েছিল, কিভাবে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে তারা নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ করে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল তার এক তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ আছে এ বইতে। এ বই তিতুমীর কিংবা কৃষক বিদ্রোহের অন্যান্য নায়কদের কোন প্রচলিত জীবনালেখ্য নয়। এটি সাম্রাজ্যবাদের নিরংকুশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিস্পর্ধী হওয়ার চেতনাগত একটি রূপ বিবৃত করেছে।

গৌতম এই চেতনাগত তাৎপর্যকে 'দীন' বা ইমান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে এই দীন বা ধর্মবোধ বা ধার্মিক ঐতিহ্য একটি ক্রিয়াশীল ব্যাপার। প্রাক ঔপনিবেশিক বা প্রাক শিল্পতান্ত্রিক সমাজে ধর্মের ভাষায়ই সাধারণ মানুষ শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই করে বা জমিদারের বিরুদ্ধে রায়তের লড়াই যা তিতুমীরের নেতৃত্বে হয়েছিল সেখানেও ধর্ম রায়তদের প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে উপস্থিত হয়। ইউরোপীয় যুক্তিবাদে বিশ্বাসী অনেকেই ধর্মীয় চেতনা বা ধর্মাশ্রয়ী চৈতন্যের রাজনৈতিক প্রভাবকে লঘু করে দেখতে চেয়েছেন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে কিংবা রাষ্ট্রীয় জুলুম ও জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চৈতন্যও কিভাবে ধর্মীয়ভাবে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে কিংবা একটি ধর্মীয় আন্দোলন কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থবহ ও ক্রিয়াশীল হয় তার নজীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভুরি ভুরি। তিতুমীরের লড়াইয়ের ঘটনা বর্ণনা করে গৌতম ধর্মের সেই প্রকাণ্ড ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। ভারতবর্ষে এক সময় ব্রিটিশ বিরোধী ওহাবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিনের ওহাবীদের বিপ্লবী জেহাদের তত্ত্ব ঔপনিবেশিক শক্তিকে চিন্তিত করে তুলেছিল। ভারতবর্ষব্যাপি ওহাবীদের লড়াইকে বলা যায় সত্যিকারের এক জনযুদ্ধ। এদের দ্বারা তিতু প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বাংলাদেশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম জনযুদ্ধের সূচনা করেন। গৌতম লিখেছেনঃ ঔপনিবেশিক শাসন সৃষ্টি করে এক ত্রিশঙ্কুর জগৎ, সেখানে সবই উল্টো। তাই 'উদারনীতিবাদ' আর 'যুক্তিবাদে' সিদ্ধ 'ভারতপথিক' রাম মোহন তার সব তীক্ষ্ণ সমালোচনা আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েও ইংরেজ শাসনে ভারতের ভবিষ্যৎ দেখেন, ইংরেজ সুবিচারে তাঁর আস্থা অটুট থাকে, 'যুক্তিবাদ' এখানে ইংরেজ শাসকের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি হয়। বারাসতের গণ্ডগ্রামে তাঁরই সমসাময়িক জোলাদের নেতা তিতু গড়ে তোলেন ধর্ম সম্প্রদায়, যেখানে সামন্ততান্ত্রিক ধারণা প্রবল, যেখানে সম্প্রদায় আর কৌম গড়ে ওঠে তথাকথিত যুক্তি দিয়ে নয় বরং ইমান আর বিশ্বাস দিয়ে। সেই তরিকা হয়ে ওঠে কোম্পানি রাজের প্রতিস্পর্ধী, গড়ে তোলে বাশের কেল্লা।

ইউরোপীয় যুক্তিবাদে আস্থাশীল তথাকথিত আধুনিকরা তাই তিতুমীরের লড়াইয়ের মধ্যে কোন 'কাণ্ডজ্ঞান' খুঁজে পাননি। কাজী আবদুল ওদুদ তার বাংলার জাগরণ বইয়ে তিতু সম্পর্কে এরকম নিষ্ঠুর মন্তব্য করেছেন। ওদুদের

www.pathagar.com

সমব্যাথীদের মতামতও একই রকম। আসলে তিতুমীর যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা ছিল অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বাংলার নিপীড়িত কৃষক ও শোষিত মানুষের স্বতঃসফুর্ত সংগ্রাম। তিতুমীরের লড়াইয়ের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তার লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসক ও তার তাবেদার নীলকর- জমিদার শ্রেণী। দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশের অনুগ্রহপুষ্ট জমিদার ও নীলকরদের হাতে যে দুঃসহ অত্যাচার তিতুর অনুচররা সহ্য করেছিলেন তাদের সেই অবরুদ্ধ ক্ষোভকে কাজে লাগান তিতুমীর। ফলে তিতুমীরের নেতৃত্বে তারা শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিনাদ্বিধায় শামিল হন। সমকালে হাজী শরিয়তুল্লাহর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ফরাজী আন্দোলন। এটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয়। তিতুমীরের আন্দোলনের সাথে ফরাজীদের কিছু কিছু মিল থাকলেও ফরাজীরা কেউই তিতুমীরের মত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাওয়াই ছিল ফরাজীদের লক্ষ্য।

কোন কোন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক যেমন বিনয় ঘোষ, সুপ্রকাশ রায়, নরহরি কবিরাজ, স্বর্ণমিত্র তিতুমীরের লড়াইকে শ্রেণী সংগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এরা বিখ্যাত পণ্ডিত উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। গৌতম ভদ্রও কি কিছুটা একই চিন্তার শরিক? হয়তো বা। এদের মোদ্দাকথা হচ্ছে ধর্মের আড়ালে তিতুর লড়াই হচ্ছে কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রেণী সংগ্রাম। কান্টওয়েল স্মিথ লিখেছিলেনঃ

.... the affair was a pure class struggle, and the communalistic confusion of the issue evaporated. The movement made use of a religious ideology, as class struggles in pre – industrialistic society have often done ; but though religious it was not Communalist (Modern Islam in India, W. C. Smith)

ইতিহাসের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় যারা বিশ্বাসী তারা এ ধরনের কথা বলবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওহাবীরা বা তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার সমর্থকরা যে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই শুরু করেছিল তার পিছনে কিন্তু মুসলিম সমাজের শ্রেণী নির্বিশেসে বহু মানুষের জোরালো সমর্থন ছিল। অনেক মুসলিম ধনপতি গোপনে ওহাবীদের অর্থ সাহায্য দিতেন।এই আন্দোলনের শিকড় সমাজের খুব গভীরে না পৌছালে তা এতদিন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারতো না। ওহাবী আন্দোলনকে তাই শুধু শ্রেণী সংগ্রাম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হলে এই বিরাট জনযুদ্ধের সার্বিক রূপটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় না। ওহাবীদের একটা প্রধান তত্ত্ব ছিল জেহাদ, যা ইসলামী

www.pathagar.com

শরিয়াহ থেকে অর্জিত। জেহাদের একটা রূপ হচ্ছে সশস্ত্র যুদ্ধ। এই যুদ্ধ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং অত্যাচারীর চাপিয়ে দেয়া নির্যাতনের অবসানের লক্ষ্যে পরিচালিত। ওহাবীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই জেহাদই পরিচালনা করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক জুলুম, শোষণ ও স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে ওহাবীদের এই প্রতিরোধ স্পৃহা ইসলামী চৈতন্যের ফল। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা এ কথাটা নতুন করে ভাবলে ভালো হয়। আজও পশ্চিম এশিয়ায় যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ চলছে তার পিছনে ইসলামের ভূমিকাই প্রধান। যারা জেহাদ বা ধর্মীয় চৈতন্যকে প্রাক শিল্প তান্ত্রিক সমাজের লক্ষণ হিসেবে মনে করেন তারা আধুনিক কালের এই ধর্মীয় চৈতন্যপুষ্ট আন্দোলনগুলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন জানি না।

গৌতম ভদ্রের মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তিনি তিতুমীরের সংগ্রামকে মোটেই খাটো করে দেখেননি। তিতুমীর বা ময়মনসিংহের পাগলপন্থীদের বিদ্রোহের চৈতন্যে ধর্মভাব, যাকে তিনি বলেছেন ঈমান, বড় স্থান জুড়ে ছিল, তা তিনি জোরের সাথে উল্লেখ করেছেন। তিতুমীরের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এই ঈমানের চৈতন্য শেষ হবার নয়। এটি মুসলিম সমাজকে কালান্তরেও দিশা দিয়ে চলেছে। তিতুমীরের সবচেয়ে কৃতিত্ব বোধ হয় এটাই তিনি বাংলার কৃষক সমাজকে জমিদার- নীলকরের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজের সঠিক চরিত্রটি বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা হরণকারী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে প্রয়োজন এটা জনগণকে খানিকটা হলেও বুঝাতে পেরেছিলেন। বাংলার বুদ্ধিজীবী ও সমাজপতিরা যখন গদগদ কণ্ঠে এদেশে ব্রিটিশের আগমনকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে শ্বেতপ্রভূদের পদলেহনে ব্যস্ত ঠিক সে সময় তিতুমীরের ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

তিতুমীরকে ব্রিটিশ ও তার দেশীয় অনুচররা দস্যু, ধর্মোন্মাদ বলে তিরষ্কৃত করেছিল। আজও মুসলিম সমাজের যেই অংশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদেরকে জঙ্গি, বর্বর, মধ্যযুগীয় তকমায় ভূষিত করা হচ্ছে যাতে এই লড়াইয়ের গুরুত্বকে খাটো করে দেয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের যে চৈতন্য তিতু সৃষ্টি করেছিলেন তা আজও ক্রিয়াশীল।

তিতুমীরের লড়াই ও বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলতে পারে। তার রাজনৈতিক চেতনা, ধর্মের প্রতি ঝোক, যুদ্ধ কৌশলের অপরিপক্কতা, সবই সত্য। কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য উনিশ শতকে এই মানুষটিই নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিজের রক্ত দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গৌতম ভদ্র নিম্নবর্গীয়দের চৈতন্য আবিষ্কারের সূত্রে তিতুমীর সম্বন্ধে সত্য উচ্চারণের যে সাহস দেখিয়েছেন তা অনেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের নজর কেড়েছে।

www.pathagar.com

উইলিয়াম ডালরিম্পলের বই, ১৮৫৭'র লড়াই ও সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ

১

১৮৫৭'র বিপ্লব, অভ্যুত্থান ও জিহাদ সম্বন্ধে আজতক অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এর অধিকাংশের লেখক আবার বিদেশি। এবার এর সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতবর্ষের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র ও নজিরবিহীন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার পুনরালোচনা ও পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্কটিশ লেখক উইলিয়াম ডালরিম্পল ১৮৫৭'র রক্তরাঙা ইতিহাসকে সামনে রেখে একটি মূল্যবান বই লিখেছেন যার নাম The Last Mughal: The fall of a dynasty, Delhi, 1857. ডালরিম্পল ইতিমধ্যে মোগলদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। অনেকেই বলে থাকেন, এই স্কটিশ লেখক মোঘল সংস্কৃতির একজন নিবিড় রসপিপাসু ও অনুগ্রাহিও বটে।

ভারতবর্ষে মোঘলরা এক গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। নাগরিক মনন আর রুচি বলতে এখন যা আমরা বুঝি ভারতবর্ষে তা এই সভ্যতারই কতকটা দান সেটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। গোলাপ, গজল, কাসিদা আর দৃষ্টিনন্দন চিত্রকলা ও স্থাপত্যশৈলী যেমন মোঘলদের একান্ত নিজস্ব, তেমন রসনালোলুপ সুস্বাদু মোঘলাই খাবার ও পশমি জরিদার পোশাক-পরিচ্ছদও মোঘলরা ভারতবর্ষে আমদানি করেছিল। কিন্তু এসব কিছু ছাড়িয়ে মোঘল শাসনের যে বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো তা হচ্ছে, এটা ছিল পুরোপুরি উদার, অসাম্প্রদায়িক, বহুত্ববাদী মনমানসিকতাসম্পন্ন। এই হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির অলিগলি দিয়ে ডালরিম্পল হাঁটাহাঁটি করেছেন বিস্তর। এই হাঁটাহাঁটির খবর আমরা পাই তার কৃত আরও দু'টি জনপ্রিয় বই City of Djinns ও White Mughals-এ। এ বই দু'টিও তার খ্যাতির বিপুল বিস্তার ঘটিয়েছে। ডালরিম্পলকৃত The Last Mughal ১৮৫৭'র বিপ্লবের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। কেবল বিপ্লব চলাকালীন বাহাদুর শাহ জাফরকে ঘিরে দিল্লীতে যে খুনরাঙা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যে অভাবনীয় মহাবিপর্যয় দিল্লীর মানুষকে পেচিয়ে ধরেছিল তার এক অশ্রুসিক্ত, অথচ সুখদ বর্ণনা। লেখকের বর্ণনার মধ্যে এক ধরনের আপাতনিরপেক্ষতা আছে, যার কারণে পাঠক সহজে পীড়িত হয় না,

www.pathagar.com

বিশেষ করে মোঘলদের দিল্লীর সংস্কৃতির সাথে লেখকের নিবিড় সম্পর্ক এবং সেই সময়ের দিল্লীকে নিয়ে তার মৌলিক পড়াশোনা, গবেষণা ও কাজকর্ম বইটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে সন্দেহ নেই। তবে এ বইটির লেখনশৈলী হচ্ছে উল্লেখ করার মতো জিনিস। রাজরাজড়াদের কাহিনী কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস যেভাবে লেখা হয় সেই প্রচলিত ধারা থেকে ডালরিম্পল সরে এসেছেন। বইটি পড়তে গেলে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন ইতিহাসের চরিত্রগুলো কিভাবে লেখকের লেখার কারুকার্যে জীবন ফিরে পেয়েছে এবং পাঠক সেই সব ঐতিহাসিক চরিত্রের ভিতরে হারিয়ে গেছেন, তাদের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্খা আর দুঃসহ স্মৃতিকাতরতার সাথে শরীক হয়েছেন। মাঝে মাঝে ধাঁধাঁয় পড়তে হয় ইতিহাস না ফিকশন পড়ছি! এ বই যে কোন হৃদয়বান পাঠককে শুধু আকর্ষণই করবে না, বাহাদুর শাহ জাফরের ট্রাজিক পরিণতি তার চোখে আসুর দরিয়া বইয়ে দেবে, বিশেষ করে বৃটিশরা দিল্লী পুনরুদ্ধারের পর যে অমানুষিক ও বীভৎস অত্যাচার করেছিল যা সাদা চামড়ার ঐতিহাসিকরা প্রায়শই এড়িয়ে গেছেন কিংবা এই ঘটনাকে বিপ্লবী সিপাহীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসাবে পুরো ঘটনাটির সরলীকরণ করতে চেয়েছেন ডালরিম্পল সেই পর্দা সরানোর কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিপ্লবী সিপাহিদের পরাজয়ের পর বৃটিশরা দিল্লীতে শুধু গণহত্যার উৎসবে মেতে ওঠেনি, মোঘল সংস্কৃতির শেষ চিহ্নকে উপড়ে ফেলার কাজেও তাদের ক্লান্তিহীন উদ্যম রীতিমত পীড়াদায়ক। মোঘল স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শনগুলো পরিকল্পিতভাবে তারা কামানের গোলা আর বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। বৃটিশরা শুধু গণহত্যা করেনি, তারা একটা সংস্কৃতিকেও হত্যা করার চেষ্টা করে।

১৮৫৭-৫৮ সালে দিল্লীতে বৃটিশরা যা করেছিল তা আমাদের স্পেনের Reconquista`র ধ্বংসযজ্ঞ ও হালজামানার বসনিয়ার Ethnic cleansing-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। স্পেনে মৌলবাদী খৃস্টানরা মুসলমানদের বিতাড়িত করবার পর সেখানকার বিখ্যাত মস্ক অফ কর্ডোভার স্থাপত্য শৈলীকে বিকৃত করে দিয়ে এটিকে চার্চে পরিণত করে যা দেখে পরবর্তীকালে রিলকে আক্ষেপ করেছিলেন এবং বর্বর খৃস্টানদের নিন্দা জানিয়েছিলেন। দিল্লীর এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখবার জন্য বেঁচেছিলেন ১৮ শতকের মোঘল সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম রত্ন মীর্জা গালিব। দিল্লীর রক্তস্নানের ভিতর দিয়ে বেঁচে যাওয়া কবি নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, রক্তসমুদ্রে ভাসমান এক সাঁতারু। অন্যত্র এক বন্ধুর কাছে পাঠানো পত্রে তাঁর অন্তর মথিত বেদনাশ্রু এভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

www.pathagar.com

Every armed British soldier
Can do whatever he wants.
Just going from home to market
Makes one`s heart turn to water
The chowk is a slaughter ground
And homes are prisons.
Every grain of dust in Delhi
Thirsts for Muslim`s blood.
Even if we are together
We could only weep over our lives.

২

১৮৫৭'র সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ডালরিম্পলের বইটি ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যা কোন লেখকের জন্য বিরাট প্রাপ্তি। অমর্ত্য সেন, কুলদীপ নায়ার, জিয়াউদ্দীন সর্দারের মত পণ্ডিতেরা বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গৌরবোজ্জ্বল মোঘল সংস্কৃতির অবসান হবার ট্রাজিক ঘটনাই বোধ হয় পাঠককে টেনেছে বেশি এবং ডালরিম্পল এক অদ্ভুত স্মৃতিকাতরতার মধ্যে পাঠকের অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছেন।

কিন্তু ১৮৫৭ সালে এই যে এত বড় ঘটনা ঘটলো তার পটভূমির বিস্তার ও বৃটিশ অত্যাচারের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পুর্ণরূপে অবহিত থাকবার পরও ডালরিম্পল কি পুরোপুরি গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন? পাঠককে স্মৃতিকাতরতার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে এক ধরনের ঔপন্যাসিক সফলতা থাকতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে অভ্যুত্থানের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে তিনি সনাতনী ধারার বাইরে আসতে পারেননি বলেই মনে হয়। সাদা চামড়ার ঐতিহাসিকরা বা এখনকার নিওকন ঐতিহাসিকরা যে ধারার' অনুবর্তী, তার সঙ্গে ডালরিম্পলের মৌলিক পার্থক্য বড় একটা নেই, অথচ তার নিজের লেখার মধ্যেই বহু তথ্য আছে যার থেকে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারত। বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিবিড় পাঠে যে ধারণা গড়ে ওঠে তা হলো বাহাদুর শাহ জাফর কিংবা তার বিপ্লবী সিপাহীদের কর্মকাণ্ডকে তিনি উপনিবেশকারীর বিরুদ্ধে উপনিবেশিতের লড়াই কিংবা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের আজাদী সংগ্রাম হিসাবে বিবেচনা করেননি। বিপ্লবী সিপাহীদের কর্মকাণ্ডের নিরপেক্ষ ও সুখপাঠ্য সামরিক বর্ণনা তিনি দিয়েছেন কিন্তু তাদেরকে স্বাধীনতার সৈনিক ভাবতে ডালরিম্পলের মন

www.pathagar.com

আটকেছে। বইটির বহু স্থানেই তিনি সিপাহীদের mutineers বলে উল্লেখ করেছেন যা পীড়াদায়ক। যারা বিদ্রোহে যোগ দেয়নি তাদেরকে `loyal' বলাটাও দৃষ্টিকটু। উপরন্তু ডালরিম্পল ভারতবর্ষব্যাপি ১৮৫৭'র পুরো ঘটনাকে দেখতে চেয়েছেন দু'টি সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব হিসাবে, যাতে কিনা এর বিপ্লবী তাৎপর্যকে অনেকটা খাটো করা হয়েছে। সেদিনকার ভারতবর্ষের ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম শক্তির সাথে আগন্তুক জবরদখলকারী খৃস্টান শক্তির একটা প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব অবশ্যই কাজ করেছিল সত্য, কিন্তু সেটিই এ ঘটনার পুরো চিত্র মাত্র নয়। শেষ পর্যন্ত এটি ছিল জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে দেশের মানুষের আজাদীর লড়াই।

১৯৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে মরহুম মওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছিলেন, ১৮৫৭'র লড়াই সম্বন্ধে বেশির ভাগ বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর এ উক্তি মিথ্যা নয় এবং আজতক এ অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি বলেই মনে হয়। উপমহাদেশের ঐতিহাসিকদের একটা বিরাট অংশের মনে সাম্রাজ্যবাদের সেই দেখবার ধরনটি অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। নানা রকম তত্ত্বজাল বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদ ও তার গোলাম ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন উপনিবেশবাদ ছিল জনগণের জন্য কল্যাণকর। এর পক্ষে তারা ভুরি ভুরি নজিরও তুলে ধরার কোশেশ করেছেন। সেসব যুক্তিকে কি কুযুক্তি বলা যায়? যেমন সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয়দের কাছে পশ্চিমা সভ্যতার আশীর্বাদ বহন করে এনেছিল অথবা ভারতবর্ষের বদ্ধ ও কুপমণ্ডুক সমাজে সংস্কারের নবতরঙ্গ বইয়ে দিয়েছিল কিংবা আজকে যেমন বলা হচ্ছে সভ্যতার দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশগুলোতে তাদের অপকর্মকে বৈধতা দেয়ার জন্য এসব তত্ত্ব হাজির করেছিল। বৃটিশ রাজকবি রাডইয়ার্ড কিপলিং সাম্রাজ্যবাদীদের সেসব কাজকর্মকে নতুন মাত্রা দিয়ে বলেছিলেন White Men`s Burden. ভাবটা এমন-সাম্রাজ্যবাদীরা না এলে উপনিবেশের মানুষগুলোর মুক্তি ঘটতো না, সভ্যতার আলো থেকে তারা চিরবঞ্চিত হয়ে রইতো। বড় রকম করুণা দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশগুলোতে সভ্য করবার মিশন নিয়ে এসেছে। ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে এ বইয়ে ডালরিম্পলের গভীর কোন বিশ্লেষণ নেই। সাবেকি রচনার মতো চর্বি মেশানো টোটার ফলে উদ্ভূত সিপাহী অসন্তোষের তিনি কিছুটা হালকা বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু লেখকের হয়তো বিশ্বাস এই আলোড়নের মধ্যে সিপাহীদের বিদ্রোহী আচরণ ছাড়া অন্য কিছুর বিশেষ তাৎপর্য নেই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধর্মনির্বিশেষে দলে দলে এই সব বিপ্লবী সেনা বাহাদুর শাহ জাফরকে সম্রাট কবুল করে দিল্লীর

www.pathagar.com

দিকে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ছুটে গিয়েছিল। এ কি কোন তাৎপর্যহীন ঘটনা ছিল কিংবা বিশেষ কোন পটভুমি ব্যতীত এত বড় অভ্যুত্থান ঘটে গেল তা ভাবা বেশ কঠিন বৈকি!

ভারতে 'পশ্চিমা সভ্যতার আর্শিবাদের' তুলনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জুলুম, লুণ্ঠন, উৎপীড়ন যে অনেক বেশি ছিল তা দেশ প্রেমিক ঐতিহাসিকরা ইতিমধ্যে সপ্রমাণ করেছেন, অথচ বিদ্রোহর কারণ বিশ্লেষণে গ্রন্থকার এর উপর কিছুমাত্র জোর দেননি। বিদেশি আধিপত্যের বিরুদ্ধে এ ধরনের সংগ্রাম যে অবধারিত ছিল তা নিয়ে সংশয় নেই। শুধু অবস্থা বৈগুণ্যে সিপাহীরা নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, পরে সর্বস্তরের জনগণ এই অভ্যুত্থানে অংশ নেয়। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত ১৮৫৭-তে দিল্লীর যুদ্ধ চলাকালে ডালরিম্পল অহেতুক 'ওহাবী' ও জিহাদী- প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। বৃটিশরা ওহাবী শব্দটা ব্যবহার করত গাল হিসাবে, যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজকাল জিহাদ শব্দটা একই অর্থে ব্যবহার করে। ওহাবীরা ছিল পিউরিটান ইসলামী ভাবধারায় বিশ্বাসী, একই সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। বৃটিশ বিরোধিতার অপরাধেই সাম্রাজ্যবাদের মিডিয়া তাদের চরিত্র হননে লিপ্ত হয় এবং তাদের পিউটান আদর্শের জন্য ফ্যানাটিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আজকালকার সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়া যেমন করে ইরাকে বা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা কামীদের 'মৌলবাদী' হিসাবে গাল পাড়ছে।

প্রকৃত সত্য হল বাহাদুর শাহ জাফরের আনুগত্য কবুলকারী ফৌজদের অধিকাংশ্যাই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। তাদের কথা মত 'দেশ ও ধর্ম' রক্ষার জন্য তারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। ওহাবীরা এদের সাথেই গলাগলি করে আজাদীর যুদ্ধে শরিক হয়েছিল মাত্র। ধর্মাশ্রিত আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নমুনা পৃথিবীতে একেবারে বিরল নয়। হিন্দু ধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে আমাদের সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম প্রমুখেরা বৃটিশ বিরোধিতায় নেমে পড়েছিলেন। বৃটিশরা এদেরকে টেররিস্ট বলত। আমাদের কোন প্রগতিশীল লেখক, বুদ্ধিজীবীরা এই জন্য তাদেরকে 'সাম্প্রদায়িক' 'ধর্মান্ধ' 'মৌলবাদী' বলেছেন শুনিনি। তাহলে ওহাবী, ফরায়েজীরা সাম্প্রদায়িক, মধ্যযুগীয় হন কোন যুক্তিতে?

১৮৫৭'র অভ্যুত্থানের একটা উল্ল্যেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু মুসলমান ঐক্য এবং এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। দলে দলে হিন্দু ফৌজরা এসে মুসলমান বাহাদুর শাহর আনুগত্য কবুল করেছে এই কারণে যে, তারা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলো, বৃটিশের চেয়ে মোঘল শাসন ছিলো উদার, অসাম্প্রদায়িক,

www.pathagar.com

প্রজাবৎসল মানবতাবাদী চরিত্রসম্পন্ন। এই কারণেই তারা মোঘল শাসনের পুনরুদ্ধারের জন্য জান বাজী রেখে লড়াই করেছিল।
মওলানা আজাদ লিখেছেন, মোঘল আমলে হিন্দু মুসলমান সমস্যা দেখা যায়নি এবং সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপারটিও মোঘল সাংস্কৃতির কাছে পরিতাজ্য ব্যাপার ছিল। কেবলমাত্র বৃটিশরা এসেই তাদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতাকে বাড়-বাড়ন্ত করে তোলে।
বইটি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয় ১৮৫৭ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, শাসকদের বোকামী ও ছোট খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং শাসিতদের মনে সন্দেহ ও ভুল বুঝার একটা গুরুতর সংযোগ ঘটেছিল। এই কারণে বিপ্লবের আগুন দ্রুত বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিল। ডালরিম্পলের এই বিবেচনা অসম্পূর্ণ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ঘটনার বর্ণনায় ডালরিম্পল যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন ঘটনার মূল্যায়নে তার সীমাবদ্ধটাও একেবারে ফেলনা নয়।

৩

সেই যুগে পৃথিবীর অন্যত্র যেভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার চলেছিলো ভারতে ইংরেজ রাজত্ব যে সেই উপনিবেশ গঠনের রকমফের তা বলাই বাহুল্য। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে উপনিবেশকারীরা ঠাণ্ডা মাথায়, হিসাব কষে তাদের যাবতীয় কুকর্মকে নৈতিকভিত্তি দেয়ার জন্য নতুন নতুন তত্ত্ব হাজির করে এবং একটা ইতিহাসের কারখানা গড়ে তোলে। এই কারখানায় বসে তারা উপনিবেশের মানুষের ইতিহাসকে ইচ্ছামতো বিকৃত, বিচ্যুত ও বিধ্বস্ত করে। তারা এসেছিলো নতুন রকমের দাসপ্রথা চালু করতে, অথচ এসবের নাম দিয়েছিল স্বাধীনতা। একালে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হানা দেয়ার সময় বলেছিল Operation Iraq Freedom। এসব কান ফাটানো ঘৃণা উদ্রেককারী আজব চিজের তাহলে অর্থ কি? অর্থ একটাই, উপনিবেশকারী হানাদাররা সব সময়ই নিজেদের জনগনের মুক্তি দাতা বলে পরিচয় দেয়।
বৃটিশরা আমাদের তিতুমীরকে বলতো 'বোকা ও ধর্মোন্মাদ'। ফকির সন্ন্যাসীদের সেকালের বৃটিশ সিভিল সার্ভেন্টরা সরকারি গেজেটিয়ারে Raiders- ডাকাত বলে রিপোর্ট করেছেন। দেশের জন্য যারা লড়াই করছে, জানবাজী রাখছে তারা বোকা, ডাকাত হতে যাবে কেন? উপনিবেশ পন্থার নৈতিক প্রতারণাই এ রকম। অন্যথায় তাদেও অবৈধ কর্মযজ্ঞের বৈধতা মিলবে কোথায়?
সিপাহী বিদ্রোহ কথাটা ইংরেজরাই তাদের কারখানায় উদ্ভাবন করেছিল। ১৮৫৭ সালের ঘটনাকে বৃটিশ শাসক, ঐতিহাসিক ও বৃটিশের অনুগত দেশীয়

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকরা সিপাহী বিদ্রোহ, ভারতীয় বিদ্রোহ দ্যা ইন্ডিয়ান মিউটিনি বলে প্রচার করে। এতে মনে হতে পারে দেশের মানুষ নয়, এটা ছিল গুটি কয়েক পাগলা সিপাহীর উল্টা পাল্টা কান্ডকার খানা, কোনো দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে তারা বিদ্রোহ করেছিল। তার সঙ্গে জনগণের স্বাধীনতার লড়াইয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।

১৮৫৭ সালের ঘটনার বহুদিন পরও ব্রিটিশরা পত্র-পত্রিকায়, পাঠ্যপুস্তকে এভাবে প্রচার প্রপাগান্ডা চালায়। শুধু তাই নয়, কলোনির শিক্ষায় আলোক প্রাপ্ত দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত এ ঘটনাকে স্বাধীনতার লড়াই হিসাবে মেনে নেননি। এদের মধ্যে এম.এন. রায়, রজনী পামে দত্ত, যদুনাথ সরকার, আর.সি. মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়ের মত বুদ্ধিজীবীরাও আছেন। এরা কলোনাইজারদের মত এ ঘটনাকে নিছক সামন্তশ্রেণীর নেতৃত্বে ফিউডাল প্রতিক্রিয়া হিসাবে চালিয়েছেন এবং ধ্বংসোন্মুখ অভিজাতদের মৃত্যু যন্ত্রণা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এদের মতে সিপাহীদের লক্ষ্য নাকি ছিল প্রতিবিপ্লব, তারা ঘড়ির কাটা পিছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। এটা পরিস্কার এ রকম তত্ত্বীয় কুয়াশা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো এই বিপ্লবের বিরাটত্ব ও মাহাত্ম্যকে খাটো করা। এসব দেশি সাহেব সেদিন কলোনির শিক্ষায় এতখানি প্রাণিত হয়েছিলেন, বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইকেও তারা ফিউডাল প্রতিক্রিয়ার উর্ধ্বে চিন্তা করতে পারেননি। কারণ একটাই তাদের মন-মানসও ঐ শিক্ষায় উপনিবেশিত হয়ে পড়েছিল। এসব উপনিবেশিত বুদ্ধিজীবী যেটা বুঝতে পারেননি সেটা হলো বিদেশি শৃঙ্খল থেকে মুক্তি এবং যে শাসনকে বহু লোক জুলুম মনে করে তার উচ্ছেদ চেয়েছিল– ১৮৫৭'র এই বিপ্লবী লক্ষ্যকে সেদিনের প্রেক্ষাপটে কোনভাবেই ফিউডাল প্রতিক্রিয়া বলা যায় না। ইংরেজ শাসনের মৌল বৈশিষ্ট্যই ছিলো শোষণ ও লুণ্ঠন, তবে তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াইকে প্রগতি বিরোধী বলি কোন যুক্তিতে?

তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এত বড় বিপ্লবী অভ্যুত্থান আর কখনো দেখা যায়নি, যা সাম্রাজ্যবাদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। এটা ছিল ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই, বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির চেষ্টা। এই যুদ্ধে সাধারণ মানুষের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ, যুদ্ধের প্রতি সাধারণ মানুষের বিপুল সহানুভূতি, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য– এই লক্ষণগুলো কিন্তু পুরোপুরি জাতীয় ভাবাপন্ন। এখানে স্বতঃস্ফুর্ত এক জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটেছে। শুধু সামন্ত রাজা ও নওয়াবরা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে বলে এটা ফিউডাল ও প্রতিক্রিয়াশীল সেটা ভাবা অযৌক্তিক। তাহলে তো একই যুক্তিতে দখলদার

www.pathagar.com

ইংরেজকে হটিয়ে দেশোদ্ধারের চেষ্টায় যেভাবে জোয়ান অব আর্ক ফরাসি অভিজাত ও জনগণকে একত্রিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাকেও আমরা প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয় ভাবাপন্ন না বলে প্রত্যয়ন করতে পারি। কিন্তু সেই আন্দোলনকে তো কখনো জাতীয় আখ্যা থেকে বঞ্চিত করা হয়নি।

১৮৫৭'র লড়াই যখন চলছে তখন কার্ল মার্কস এ ঘটনাটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল এ লড়াই মূলত আন্তর্জাতিক উপনিবেশবাদ বিরোধী লড়াইয়ের অংশ। ভারতবর্ষে উপনিবেশ লুণ্ঠনই ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং ভারতীয় জনগণের মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল বৃটিশ উপনিবেশকে ধ্বংস করে ভারতীয়দের স্বাধীন-সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। মার্কসের এই বিশ্লেষণকে সেদিনের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট প্রগতিশীল মনে করা সঙ্গত। কেননা তিনি এই যুদ্ধের স্বরূপ চিনতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, মার্কস সেই সব দেশীয় রাজার নিন্দা করেছেন যারা ইংরেজকে সহযোগিতা করেছিল। তিনি তাদেরকে ইংরেজদের পোষা কুকুর হিসাবেও আখ্যায়িত করেছেন। তবে মার্কস শেষ পযর্ন্ত বৃটিশদের আগ্রাসনকে পুঁজিবাদের আগ্রাসন হিসাবেই দেখেছেন এবং তিনি তার বিশ্বদৃষ্টিকে তার তত্ত্বের বাইরে নিতে চাননি।ঔপনিবেশিক যুদ্ধগুলোর পিছনে পুঁজিবাদের একটা বড় ভূমিকা আছে সন্দেহ নেই কিন্তু এটা যে একই সাথে একটা বর্ণবাদী, সাংস্কৃতিক ও সাম্প্রদায়িক লড়াই তা মার্কস গণনার মধ্যে নেননি বা নিলেও তা তার তত্বের আলোয় বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন মাত্র।

৪

১৮৫৭'র বিপ্লবের একাধিক কারণ আলোচিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিকরা তাদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে সেসবের বিচার করার চেষ্টা করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত এটি যে বিদেশি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আজাদীর লড়াই ছিল সে সম্বন্ধে দেশপ্রেমিক মানুষের মনে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। বৃটিশরা শুধু নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদীই ছিল না, এরা একই সাথে ছিল ক্রুসেডার ও সাম্প্রদায়িক। স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের পর রানী ইসাবেলা কলম্বাসের নেতৃত্বে যে সমুদ্রাভিযান শুরু করেছিলেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠনের পাশাপাশি খৃস্ট ধর্মের বিজয় ডঙ্কা এগিয়ে নেয়া। এর পর ইউরোপ থেকে এশিয়া-আফ্রিকার দিকে দলে দলে অভিযানকারীরা ছুটে এসেছে সমরূপ চিন্তা-ভাবনা নিয়েই। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সাথে খৃস্ট ধর্মের সম্পর্ক গভীর এবং ইতিহাসে পরস্পরের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। জেমো কেনিয়াত্তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি আমরা মনে করতে পারি:

www.pathagar.com

When the Europeans came to Africa, Europeans had the Bible in their hands and the Africans lands in their hands. Europens askedAfricans to close their eyes and pray: when they opened their eyes the Africans had the Bible in their hands and the lands in the hands of the Europeans.

এ দেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী বনিকরা যখন আসে তখন তার সঙ্গী হয়ে আসে খৃস্টান মিশনারীরা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ডা ছিল ভারতবর্ষ লুন্ঠনের পাশাপাশি খৃস্ট ধর্ম প্রচার করা। এসব মিশনারীদের পৃষ্টপোষকতা করতেন ইংরেজ রাজ কর্মচারীরা। অনেক রাজকর্মচারী মনে করতেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই হচ্ছে খৃস্টধর্মকে ভারতবর্ষে শক্তিশালী ও পয়মন্ত করে তোলা। লর্ড সলিসবেরি বলেছিলেন, ভারতীয়দের সবাইকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়নি বলেই সিপাহী বিদ্রোহের মত ঘটনা ঘটে। সেক্যুলার ইউরোপের অদ্ভুত চেহারা নয় কি? মিশনারীরা হচ্ছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের অগ্রবাহিনী। প্রথমে তারা কোথাও এসে হাজীর হয়, শান্তির কথা বলে, পরে সেখানে একটা মজবুত ভিত্তি ও ভাবমূর্তি প্রস্তুত হলে সাম্রাজ্যবাদ স্বশরীরে আবির্ভুত হয়। ভারতবর্ষে সাতশ' বছর মুসলমানরা শাসন করে ছিলো কিন্তু জোর করে ধর্মান্তরের কোন ঘটনা ঘটেনি। এ রকম হলে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রধান অংশ হিন্দু থাকতে পারতো না। ঔপনিবেশিক শাসনে হিন্দু ও মুসলমান যুগপৎভাবে স্বধর্ম হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। আমাদের মুন্সী মেহেরুল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে এই সাম্রাজ্যবাদী মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন সে কথা আমরা জানি। ইতিহাসের গতিতেই মুন্সী মেহেরুল্লাহর মত মানুষেরা সেদিন দাড়িয়ে পড়েছিলেন।

১৮৫৭'র বিপ্লবের পিছনে তাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণ যেমন আছে তেমনি আছে ধর্মীয় কারণ। সেদিন এই অভ্যুথান না হলে ভারতবর্ষের ভাগ্য হয়তো অন্য রকম লেখা হতো- এটি একটি স্পেন বা ফিলিপাইনের মতো খৃস্টান দেশে পরিণত হতো।

বৃটিশরা শুধু জোর করে ধর্ম প্রচার করার চেষ্টা করেনি, তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে র মাধ্যমে এ দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে ফেলতে উদ্যত হয়, তেমনি নিষ্ঠুরভাবে খাজনা আদায় করে জনগণকে পথে বসায়। এই খাজনা আদায়ের প্রকৃতি এতই নিষ্ঠুর ছিল যে তার ফলশ্রুতিতে '৭৬-এর মন্বন্তরের মত দুর্বিষহ ঘটনা ঘটে। একদিকে জোর করে খাজনা আদায়, অন্যদিকে দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য

www.pathagar.com

ধ্বংস করে ভারতবর্ষকে বৃটিশের বাজারে পরিণত করে সাধারণ মানুষের দুর্দশাকে সীমাহীন করে তোলা হয়। এভাবে খাজনা আদায় থেকে শুরু করে যত প্রকার অত্যাচার-অবিচার সম্ভব ইংরেজরা দেশের মানুষের উপর নির্বিবাদে চালিয়ে যায়। ফলে ইংরেজের উপর তাদের ক্ষোভ ধুমায়িত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দেশীয় রাজা ও নওয়াবরাও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নানা অজুহাতে তাদের রাজ্যগুলো গ্রাস করার কুটচালে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এমনি করে ১৮৫৭'র পরিস্থিতি যখন উপস্থিত হয় তখন রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং গোলামীর বন্ধন কাটবার জন্য সবাই একত্রিত হয়।

৫

বাংলা ভাষীদের মধ্যে ১৮৫৭'র বিপ্লবী ঘটনা নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির একটা কারণ অবশ্যই ইংরেজদের অপপ্রচার। কিন্তু তার চেয়ে ভয়াবহ কারণ হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশে একটি দাসসুলভ, সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় ইংরেজরা। এদের ১৮৫৭'র স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি কোন সহানুভুতি ছিল না। বৃটিশ শাসনের সুবাদে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেদিন কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দেয়ায় তারা নির্বিচারে ১৮৫৭'র মত বিপ্লবী ঘটনাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী একদিকে যেমন ছিল বৃটিশ অনুগত, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক ও মুসলমান বিদ্বেষী। এরা পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা আঁচ করতে পারলেও ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যের কথা ভাবতে পারেননি এবং সত্যিকার অর্থে দেশের জনজীবন থেকে তারা ছিলেন বিছিন্ন। বৃটিশের কলোনি বিস্তারে এরা ছিলেন বিশ্বস্ত সহায়ক শক্তি। এরাই ইংরেজের ভারত জয়কে ভগবানের মঙ্গলময় বিধান এবং ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের শাসন হিসাবে প্রত্যয়নপত্র দিয়েছিলেন। ১৮৫৭'র অভ্যুত্থনের সময় কলকাতাকেন্দ্রিক ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও জমিদার শ্রেণীর ভূমিকাকে দাসত্ববৃত্তির নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবেই উল্লেখ করা যায়। এদের ভূমিকার সাথে মীর জাফরের ভূমিকার কোন তফাৎ নেই।

ইংরেজের উপর ভরসা করেই এই মধ্যবিত্ত কলকাতায় বাংলার রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছিল। ইংরেজও সহযোগিতা দিয়েছিল যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনুগত্য ধরে রাখা যায়। যুদ্ধের সময় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ বৃটিশরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল।

নামে বাংলার রেনেসাঁস হলেও এটা ছিল মুলত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের উৎকৃষ্ট নমুনা। এই পুনরুজ্জীবনবাদের পথ ধরেই তথাকথিত বাংলার রেনেসাঁর পুরোধারা

www.pathagar.com

হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটান, কালে যা সর্বভারতীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, ঈশ্বর গুপ্ত, নবীন সেনদের জাতীয়তাবাদ সেকুলার ছিল না। সঙ্গত কারণেই তাদের কর্মযজ্ঞ অসাম্প্রদায়িক ও বৃটিশ বিরোধী হতে পারেনি। এই হিন্দু রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠতম রত্ন রবীন্দ্রনাথও বৃটিশ শাসনকে শেষ পর্যন্ত ইশ্বরের শাসনের বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারেননি। কলোনি বিস্তারের এমন বিচিত্র ব্যাখ্যায় কৌতুক বোধ করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। বৃটিশের সহযোগিতায় কলকাতায় সাম্প্রদায়িকতার যে বিষফল রোপিত হয়েছিল তাই কালে কালে মহীরুহে পরিণত হয় এবং ভারতবর্ষ জুড়ে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার মি. জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের জাতীয়তাবাদের বিকাশ একদিনে ঘটেনি। আনন্দ মঠের অভীষ্ট জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। আজকাল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে নানা রকম সমন্বয় পন্থার কথা শোনা যায় কিন্তু আনন্দ মঠের জাতীয়তাবাদে এর আদৌ কোন স্থান ছিল কি? এই রকম সাম্প্রদায়িকতার তোড়ে একদিন ভারতবর্ষই দু'টুকরো হয়ে যায়। হয়তো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অভীষ্ঠও ছিল তাই।

১৮৫৭ সালে বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, নবীন সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাদের সমগোত্রীয়রা এ লড়াইকে সমর্থন করেননি। কারণ তারা মনে করেছিলেন এতে আবার মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। মহাবিদ্রোহ ও মুসলিমবিরোধিতায় এ শ্রেণীর লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি রীতিমত লজ্জাজনক। সাম্প্রাদায়িকতা যে চিন্তাশীল মানুষদেরও কতখানি কলুষিত করে দেয় এ তার বড় প্রমাণ। মুসলিম বিদ্বেষ, বৃটিশের দালালি ও সাম্প্রদায়িকতা যেন এক সাথে গলাগলি করছে! একটা উদাহরণ নেয়া যাক:

একেবারে মারা যায় যত চাঁপ দেড়ে (দাড়িওয়ালা)।
হাঁসফাঁস করে যত প্যাঁজখোর নেড়ে ॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে ॥
কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছা খোল্লা তোবাতাল্লা বলে আল্লাহ মরি। (ঈশ্বর গুপ্ত)

এই সাম্প্রদায়িকতার পরিণাম, যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোটেই প্রীতিকর হয়নি তাতো ইতিহাস অনুরাগী পাঠকবৃন্দের জানা। ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় অবদান যে এই সাম্প্রদয়িকতা তা বলাই বাহুল্য।

www.pathagar.com

৬

১৮৫৭'য় দিল্লী, লাখনৌ, মিরাট, বুন্দেলখণ্ডে যা ঘটেছে আজ তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বাগদাদ, বসরা, কাবুল, কান্দাহারে। সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ পরিবর্তন হয়েছে, চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি। সেদিন বৃটিশরা ভারতবর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লুণ্ঠন করতে, খৃস্ট ধর্ম প্রচার করতে আর স্বাধীনতা কেড়ে নিতে। একালে তাদের জায়গায় আমেরিকা বসেছে। এরা ইরাকে, আফগানিস্তানে হানা দিয়েছে একইভাবে লুণ্ঠন করতে, স্বাধীনতা কেড়ে নিতে আর খৃস্ট ধর্মের জয়ডঙ্কা বাজাতে। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, তিনি যীশুর প্রেরণায় ক্রুসেডে নেমেছেন। তবে হানাদাররা সারা দুনিয়াকে যতই বোকা বানাবার চেষ্টা করুক না কেন, ঔপনিবেশিক যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক যুদ্ধ বলেই ধরা পড়বে।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, সেকালের মত একালেও সাম্রাজ্যবাদের দাস আর গোলামের কোন অভাব হয়নি। সেকালের মত একালেও সুশীল সমাজ আছে যারা মোটেই তখনকার তুলনায় সাম্রাজ্যবাদের কম গুনগান করছে না। চিরকালই পশ্চিমা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদার নীতির মুখোশ পরে সাম্রাজ্যবাদের দালালি ও মোসাহেবী করে। ১৮৫৭'র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যারা সেদিন দাঁড়িয়েছিল, তাদের বক্তব্য বিবৃতির সাথে আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদী সমর্থকদের মতামতের কি আশ্চর্য মিল এবং যুগপৎভাবে তা অশ্লীল ও হাস্যকর।

১৮৫৭ আমাদের জন্য একটা পথের দিশা রেখে গিয়েছিল। সেটি পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী। কোন সন্দেহ নেই আজও মানব জাতির প্রধান সংকট সাম্রাজ্যবাদ এবং তার থেকে মুক্তির জন্য ১৮৫৭'র শিক্ষা সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৭'র বিপ্লব পরাস্ত হয়েছিল, তার অনেক কারণ ছিল। দুর্বল নেতৃত্ব, দুর্বল সাংগঠনিক ভিত্তি, অসমন্বিত পরিকল্পনা, প্রাযুক্তিক অনগ্রসরতা প্রত্যেকটি ১৮৫৭'র বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। তারপরও বলতে হবে ১৮৫৭'র চেতনা সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের সংগ্রামে অনন্ত প্রেরণা হয়ে আছে।

১৮৫৭'র সার্ধ শতবার্ষিকীতে ডালরিম্পলের বই পড়বার পর মনে হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ঔচিত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি উনিশ শতকের গোলাম বুদ্ধিজীবীদের ভাষণকে পরিহার করে শোভন, সজ্জন ও শরীফ ভদ্রলোকদের মেজাজ ও যুক্তিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাতে কি সাম্রাজ্যবাদের ঔচিত্য ভাঙবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে? এর একটাই উত্তর, না।

www.pathagar.com

যেন ভুলে না যাই

পলাশীর যুদ্ধের একশ বছর পর ভারতবর্ষের দিক দিয়ে ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে এক গণঅভ্যুত্থান ঘটে। এই যুদ্ধের ব্যাপকতা ও গভীরতা দেখে সুদূর ইউরোপে বসে কালমার্কস বিস্মিত হয়ে যান। তিনি এ যুদ্ধকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসেবে দেখেন। আমাদের দেশপ্রেমিক রাজনীতিক ও ঐতিহাসিকদের মতামতও সেই রকম। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও তার পোষ্য ঐতিহাসিকরা এই যুদ্ধকে স্রেফ মিউটিনি বলে চালায়। এই যুদ্ধকে কতকগুলো বিদ্রোহী ও বেয়াদব সিপাহীর কান্ডকারখানা হিসেবে উল্লেখ করে এর গুরুত্বকে খাটো করার অপচেষ্টাও তারা করে। ইংরেজ যে দেশেই গেছে সেখানকার মানুষের স্বাধীনতার দাবী আর আন্দোলনকে বিদ্রোহ আর সন্ত্রাস বলে নিষ্ঠুর সামরিক শক্তি দিয়ে তা দমন করার চেষ্টা করেছে। ভারতে, বার্মায়; মালয়ে, সুদানে, মিশরে সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদের চেহারা একই রকম।

ইংরেজ আমাদের তিতুমীরকে বলতো সন্ত্রাসী। বহুদিন ধরে ওহাবী শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে গালি হিসেবে। আমাদের আজাদী সংগ্রামের নায়কদের চরিত্র হনন করতে ইংরেজের মিডিয়া এতটুকু ত্রুটি রাখেনি।

সন্ত্রাস শব্দটার ব্যাখ্যা স্থানভেদে কালভেদে সব সময় পাল্টেছে। আমাদের দিক দিয়ে যা ছিল আজাদীর লড়াই, মুক্তির সংগ্রাম ইংরেজের দিক দিয়ে তাই ছিল সন্ত্রাস। ইংরেজ চেয়েছিল আমাদের দাবিয়ে রাখতে। আমাদের মুক্তিকামীরা ইংরেজের সেই শৃঙ্খল ভাঙতে চেয়েছিল। এই দাবিয়ে রাখার ইতিহাসের পাশাপাশি শৃঙ্খল ভাঙার ইতিহাসও সমানভাবে এগিয়ে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে ইংরেজ আজ পিছু হটেছে। তা বলে সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটেনি। ইংরেজের জায়গায় এসেছে আমেরিকা। আজকের ইরাকে, আফগানিস্তানে যারা মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে তাদেরকেও পশ্চিমা মিডিয়া বলছে সন্ত্রাসী। সেদিনের উপনিবেশিত ভারতের সাথে আজকের ইরাকের, আফগানিস্তানের শ্রেণীগতভাবে বড় কোন তফাৎ নেই।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামীদের শায়েস্তা করার জন্য ইংরেজ কালাপানির দেশ ভারত মহাসাগরের আন্দামান দ্বীপে একটা বিরাট জেলখানা গড়ে তুলেছিল। আসলে

www.pathagar.com

এটা ছিল একটা বিভীষিকাময় কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। এটির নাম ছিল সেলুলার জেল। অনেকটা আজকের বাগদাদের আবু গারিব ও কিউবার গুয়ান্তানামো কারাগারের সাথে তুলনীয়।

এই সেলুলার জেলে আটক মুক্তি সংগ্রামীদের উপর সেদিন নেমে এসেছিল অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এই বিভীষিকার কাহিনী পাওয়া যায় মরহুম মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদীর লেখা থেকে। খয়রাবাদী ছিলেন বড় আলেম। ১৮৫৭'য় ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিবিড়ভাবে শরীক হয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধে বিপ্লবীদের পরাজয় ঘটলে ইংরেজ সৈন্যরা তাকে পাকড়াও করে। তার উপর চলে যত রকমের অত্যাচার এবং শেষ পর্যন্ত এক প্রহসনের বিচারে তাকে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানেও তার উপর চলে নানা রকমের অত্যাচার। তার সামাজিক পদমর্যাদাকে এতটুকু মূল্য দেয়া হয় না। তাকে একসময় মেথরের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তিনি যখন দেখেন এভাবেই তার জীবন শেষ হয়ে যাবে তখন এ বিভীষিকার কাহিনী লিখে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু 'অসভ্য' ইংরেজ তাকে একটুকরো কাগজও দেয় না। নিজের জন্য যোগাড় করে রেখেছিলেন একটুকরো কাফনের কাপড়। অগত্যা সেই কাফনের কাপড়েই লিখে যান ইতিহাস। এই ইতিহাস যখন পড়ি তখন চোখের পানিতে বুক ভেজাই। মনে হয় এ হচ্ছে আলেক্সান্ডার সোলঝেনিৎসিনের আর এক আর্কিপেলাগো। আর্কিপেলাগোর কথা কিছু কিছু আমরা জানি। আন ফ্রাঙ্কের ডায়রীর কথাও আমরা জানি। কিন্তু এ কাফনে লেখা ইতিহাসের খবর আমরা অনেকেই রাখি না। নানা রকম স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা শুনতে শুনতে এখন আমরা আমাদের প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসই ভুলতে বসেছি।

আঠারশ' সাতান্নর বিপ্লব একদিনে প্রস্তুত হয়নি। বলা হয়ে থাকে এ যুদ্ধ ছিল অপরিকল্পিত। সব জনযুদ্ধই কিছুটা অপরিকল্পিত থাকে। কিন্তু এর প্রস্তুতির ইতিহাসও দীর্ঘ ও রক্তরাঙা। পলাশীর পর একশ বছর মুসলমানরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বে এই যুদ্ধ চলতে থাকে। এর মধ্যে চব্বিশ পরগনার তিতুমীরের লড়াই এবং বালাকোটের সৈয়দ আহমদ শহীদের জেহাদ ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে যায়। এসব যুদ্ধ জেহাদের রূপ ধারণ করেছিল এবং জেহাদ কারীরা ওহাবী নামে পরিচিত হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে ওহাবী আন্দোলন ছিল ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। এ আন্দোলনের

www.pathagar.com

জনভিত্তি ছিল গভীর, চরিত্রের দিক দিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন বিরোধী এবং এর বিস্তার ছিল পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। দেখা গেছে বিপ্লবীরা লড়াই করেছে সীমান্ত প্রদেশে কিন্তু তাদের টাকা আর যোদ্ধা গিয়েছে সারাদেশ থেকে। এই যে জনযুদ্ধ এর সত্যিকারের মূল্যায়ন আজও হয়নি। আমাদের দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকরাও এই যুদ্ধের যথার্থ স্থান নির্ণয় করতে সফল হননি। এই গৌরবের ইতিহাস আমরা কিছুটা পাই এক ইংরেজ রাজ কর্মচারীর কাছ থেকে। নাম উইলিয়াম উইলসন হান্টার। তার বইটির নাম আমাদের ভারতীয় মুসলমান। এর উপশিরোনাম হচ্ছে, তারা কি রানীর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। ইংরেজের অবিচারের কথা এখনও আমাদের পড়তে হয় ইংরেজের লেখা বই থেকে। যদিও হান্টার সাহেব মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে এ বই লিখেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। মুসলমান সমাজের ইংরেজ বিরোধী ভূমিকার বিবরণের পাশাপাশি মুসলমানের প্রতি ইংরেজরা কি কি অবিচার করেছে এ বইতে তারও একটা ফর্দ আছে। ১৮৫৭'র যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায় তখন ইংরেজরা চিন্তা করেছিল মুসলমানরা কেন এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। এই কেন'র কারণ খুঁজতে যেয়ে তারা হান্টার সাহেবকে দিয়ে এই বই লেখায়।

বহুদিন পর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাইয়েমুদ্দীন আহমদ 'ওহাবী মুভমেন্ট' বলে একটা বই লেখেন। যতদূর জানি দেশীয় পটভূমি থেকে দেখা ওহাবীদের মুক্তি আন্দোলন নিয়ে এটি হচ্ছে সবচেয়ে তথ্যবহুল ও গবেষণা সমৃদ্ধ বই।

বাংলায় এ বিষয় নিয়ে কিছুটা কাজ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী গৌতম ভদ্র। তার বইয়ের নাম ইমান ও নিশান। তিনি অবশ্য তিতুমীরের লড়াই নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদ শহীদ নিয়ে বিশেষ কিছু বলেননি। অনেকের ধারণা তা করা গেলে বইটি পূর্ণাঙ্গ হতো। সব মিলিয়ে বলা যায় ওহাবীদের পরিচালিত দীর্ঘকালব্যাপি এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশের লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা যারপরনাই দুঃখজনক। অনেক ক্ষেত্রে তাদের অবহেলা ও অস্বীকৃতি মেনে নেয়া কষ্টকর। অথচ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেদিন বিপুল পরিমাণ ওহাবীদের যোদ্ধা সংগৃহীত হয়েছে। তারা সুদূর সীমান্ত প্রদেশে যেয়ে যুদ্ধ করেছে। ওহাবীদের স্বাধীনতাকামী কাজ-কর্মে এখানকার কৃষিজীবী মুসলমানরা এক গভীর নৈকট্য বোধ করেছে।

www.pathagar.com

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কাজী মিঞাজান ছিলেন এরকম একজন ওহাবী সৈনিক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অত্যন্ত গোপনে ও সুকৌশলে তার এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। বহুদিন সে ঘটনা কেউ জানতে পারেনি। একদল ধৃত ওহাবীদের নিয়ে আম্বালায় বিচার চলাকালে তার নাম প্রকাশ পায়। তিনি ধরা পড়ে যান। কিন্তু তার অসাধারণ প্রত্যুতপন্নমতিত্ব, কৌশল, সর্বোপরি স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই মানুষটির কাজকর্ম দেখে সেকালের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রটির গোয়েন্দা বিভাগও ভড়কে যায়। এমনি কাজী মিঞাজানের মত হাজার হাজার উৎসর্গীকৃত মহৎপ্রাণের উদাহরণ দেয়া যায় যারা পরিবার পরিজন বাড়ি-ঘর আরাম-আয়েস ত্যাগ করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেয়ে স্বেচ্ছায় 'বিদ্রোহী' হিসেবে আজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এদের কেউ ধরা পড়েছেন, বিচারে ফাঁসী হয়েছে অথবা দ্বীপান্তর কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মজনু শাহ, মুসা শাহ, চেরাগ আলী, দুদুমিঞা, তিতুমীর, শমশের গাজীর মত কয়েকজন ছাড়া অসংখ্য বিপ্লবীর ইতিহাস অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। ইংরেজ ও তার করুণা লিপ্সু দেশীয় ঐতিহাসিকরা তাদের বইয়ে এই বিপ্লবী অধ্যায়টিকে মোটেই আমলে নেননি। হান্টার সাহেব তার বইয়ে মৌলভী ইয়াহিয়া আলী, আব্দুল গফফার, রহিম বক্স, এলাহী বক্স, হুসাইনী ইলাহী, আব্দুল করিম, মোহাম্মদ জাফর প্রমুখ বিপ্লবীর কথা বলেছেন। তিনি তাদেরকে রাজদ্রোহী, ইংরেজ বিদ্বেষী বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে এরাই ছিলেন মুক্তি পাগল বিপ্লবী বীর।

১৮৫৭ সালে ভারত জুড়ে যে বিপ্লবের দাবানল জ্বলে ওঠে তার কারণ হিসেবে ব্রিটিশরা গোচর্বি ও শুকরচর্বি মিশ্রিত কার্তুজের কথা বললেও এটা ছিল একটা নিছক উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতাকামী মুসলমানরা দীর্ঘ একশবছর ধরে এ মহাবিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। এই বিরাট প্রেক্ষাপট ছাড়া এ বিপ্লব কখনো অনুষ্ঠিত হতে পারতো না।

যে বিপ্লবের অনেকখানি গোড়াপত্তন হয়েছিল এই বাংলাদেশে সেখানকার ঐতিহাসিক বুদ্ধিজীবীরা এরকম একটা ঘটনাকে বেমালুম চেপে গেলেন কি করে। এর কারণ হচ্ছে এই বাংলাদেশ থেকেই শুরু হয়েছিল ইংরেজের বিজয়াভিযান, এই অভিযানে ইংরেজের সহযোগী ছিল এখানকার হিন্দুরা। ইংরেজ আসার পর অবস্থান পরিবর্তনের কারণে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব চলে যায় হিন্দুদের হাতে। যারা ছিল এক হিসেবে ইংরেজেরই সৃষ্টি। তাই

www.pathagar.com

রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিম চন্দ্র, ইশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ বিজ্ঞজনেরা সেদিন যারা কলাকাতায় বসে বাবু কালচার ও বাবু রেনেসাঁর উজজীবন ঘটিয়েছিলেন তারা প্রাণপণে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী এই মুক্তি সংগ্রামের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এদের ইতিহাস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতা ও কতকক্ষেত্রে দালালীর ইতিহাস। ইংরেজি শিখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দালালী ও মুৎসুদ্দীগিরির মাধ্যমে এরা এদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকারকে প্রায় একচেটিয়া করে ফেলেছেন। তাই পলাশীর পর থেকে একশ বছরের অধিক সময় চলা এই দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে এখানকার হিন্দুদের পাওয়া যায়নি। এদের ভূমিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত এখানকার উৎপীড়িত কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের বিরুদ্ধে। সাতান্নর বিপ্লবের সময় এদের ভূমিকাতো রীতিমত প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়ে পড়ে।

এই বিপ্লবের ইতিহাস আমরা জানি না এর একটা কারণ ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের প্রয়োজনে সত্যকে চাপা দিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী নতুন করে ইতিহাস সাজিয়ে বসেছে। শীর্ষ স্থানীয় হিন্দু ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই যা লিখেছেন তা মূখ্যত বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক। দুঃখের বিষয় নতুন ইতিহাস রচনায় যারা এগিয়ে এসেছেন তারাও অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রচলিত অর্ধসত্য ইতিহাস অনুসরণ ও অনুকরণ করে গেছেন। এই অর্ধসত্য ইতিহাসই এতকাল গলধঃকরণ করানো হয়েছে আমাদের উঠতি বয়সের কোমলমতি তরুণদের। এভাবে তারা নিজের ইতিহাসই শুধু ভোলেনি, নিজের ইতিহাসকেও ঘৃণা করতে শিখেছে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদের ইতিহাস তাই আমরা ভুলে গিয়েছি। এমনকি সেটা জানাও আজ আমরা কর্তব্য বলে মনে করি না। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার ইতিহাস নিয়ে আজ আমরা কয়জনা গৌরববোধ করি? আমাদের ভাবটা এমন আফটার অল এটা মুসলমানদের লড়াই। সুতরাং এটা সাম্প্রদায়িক হতে বাধ্য। ভুল ইতিহাস যেমন আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে তেমনি ইংরেজের ফেলে যাওয়া সেকুলার শিক্ষাও আমাদের মাথা ভালো করে ধোলাই করে দিয়েছে। ইসলাম মানেই এখন মধ্যযুগীয়, বর্বর ও হিংস্র। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াকু অভিব্যক্তিকে আমাদের দারুণ ভয়। আমাদের বুদ্ধিমাণ ও এলিটশ্রেণী ইসলামকে পাশে সরিয়ে রাখতে তাই বেশি আগ্রহী।

www.pathagar.com

সাতান্ন'র বিপ্লব বাহ্যত ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের চেতনা ব্যর্থ হয়নি। এই বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা জ্বলে ওঠে তাই সৃষ্টি করে অন্য এক ধরনের জাগরণ। সেই জাগরণ থেকে আসে স্বাধীনতা। সাতান্নর বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকরা নানা কথা বলেছেন। এর প্রত্যেকটা কারণ হয়তো সত্য। তবে নেতৃত্বের ব্যর্থতা একটা বড় কারণ। সাতান্নর বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব বর্তেছিল শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ'র উপর। বাহাদুর শাহ'র ধমনীতে মোঘল রক্ত ছিল, আর ছিল আন্তরিকতা, এর অতিরিক্ত তার আর কিছু ছিল না। সংকটে, দুর্যোগে নেতৃত্বের ভূমিকা বিরাট। এই ভূমিকা যথার্থভাবে পালিত না হলে কি হতে পারে আমাদের ইতিহাসই তার নজীর। অথচ ভারতবর্ষের মানুষ সেদিন বাহাদুর শাহকে ত্রাতা হিসেবে ধরে নিয়েছিল। তিনি পরিণত হয়েছিলেন একটা প্রতীকে। তার দিকেই সবাই তাকিয়ে ছিল। কিন্তু প্রতীক দিয়েতো যুদ্ধে জেতা যায় না। এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটা যুদ্ধে জেতার জন্য যে ধরনের মন মানসিকতা দরকার, যে ধরনের কৌশল ও সাংগঠনিক দক্ষতা দরকার তা বাহাদুর শাহ'র ছিল না। বাহাদুর শাহর বিপর্যয়ের মধ্যে আজকের মুসলিম দুনিয়ার নেতৃত্বের সংকটকে খুব ভালো করে দেখতে পাই। আজকের মুসলিম নেতৃত্ব যোগ্যতার দিক দিয়ে বাহাদুর শাহর চেয়ে মোটেই এগিয়ে নেই। তাই চলমান সাম্রাজ্যবাদের সামনে তাদের মুখ থুবড়ে পড়াই হয়ে উঠেছে নিয়তি।

নেতৃত্বের সংকটের পাশে সেদিন জাল-জুয়াচুরি ও গাদ্দারীর ঘটনাও ঘটেছিল। মীর জাফরের মতো অনেকেই সেদিন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যারা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। এই গাদ্দারীও সাতান্নর বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার একটা কারণ। আজকের মুসলিম বিশ্বেও গাদ্দারের সংখ্যা একেবারে কম নয় যারা সাম্রাজ্যবাদের হয়ে মুসলমানের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবিরাম কাজ করে চলেছে।

সাতান্নর বিপ্লব কিছুটা হলেও আমাদের চক্ষুস্মান করতে পেরেছিল, বোধ হয়। গাদ্দারদের ভূমিকা হয়তো ছিল। কিন্তু এদের পাশে বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস আরও উজ্জ্বল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উত্তুঙ্গ নজীরও এটা। এই ইতিহাসই আমাদের বার বার পথ দেখিয়েছে। বখত খাঁ, মৌলভী আহমদ উল্লাহ, বেগম হযরত মহল এমনি আরো কত শত নাম। আমরা যেন এদের ভুলে না যাই।

www.pathagar.com

১৮৫৭ : সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহ

১৮৫৭ সালে কলোনিয়ালিজমের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের মানুষ এক দুর্দান্ত লড়াই করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত হলেও এটা ছিল আদতে ভারতের সব মানুষের আজাদীর লড়াই। পুরো উনিশ শতক জুড়ে এত বড় ও রক্তরাঙ্গা প্রতিরোধের মুখোমুখি আর কখনো হতে হয়নি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের। আজ আফগানিস্তান বা ইরাকে একই অভিজ্ঞতা নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানকার পথে প্রান্তরে আজ ঘুরে ফিরে সেই ১৮৫৭। আজ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, আফগানিস্তান কিংবা ইরাকের বিপ্লবীদের বলছে ' সন্ত্রাসী' কিংবা 'মৌলবাদী' তেমনি সেদিনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ১৮৫৭'র বিপ্লবকে বলেছিল কতক গুলো পাগলা সিপাহীর উল্টাপাল্টা কাজ কর্ম, তাদের দ্বারা শুরু করা দাঙ্গা ফাসাদ। তারা তাদের ভাড়াটিয়া ঐতিহাসিকদের দিয়ে প্রচার করেছিল এটা সিপাহী বিদ্রোহ। সত্য বটে দেশপ্রেমিক সিপাহীরাই এ যুদ্ধের সূচনা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি পরিণত হয়েছিল গণযুদ্ধে এবং এর লক্ষ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা। আমরা ইতিহাস থেকে দেখছি খুব দ্রুত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, ব্রিটিশ আর্মি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সর্বত্র এই বিপ্লবী সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে এবং যোগ দিয়েছে হাতিয়ার তুলে ধরা জনসাধারণের সঙ্গে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে টলিয়ে দেয়ার দিক থেকে এমন প্রবল ঘটনার তুলনা নেই। কেন কানপুর, মীরাট, রায়বেরিলি, লাখনৌ, ঢাকার মানুষ একই সাথে উতলা হয়ে উঠেছিল, কেন এখানকার বিপ্লবী সিপাহীরা দলে দলে রওয়ানা দিয়েছিল দিল্লীর দিকে। শুধুই কি গরু আর শুয়োরের চর্বি মিশানো টোটা দাঁতে কাটতে হচ্ছে, বলে? না। আসলে বিদ্রোহটা ছিল একটা জেহাদ। এ জেহাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, উপনিবেশ লুণ্ঠনকারীর বিরুদ্ধে, আজাদী হরণকারীর বিরুদ্ধে। সর্বোপরি এ লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে ১৭৫৭ সালে ভারতবর্ষের শিরে যে গ্লানি চেপে বসেছিল একশ বছর পরে ১৮৫৭ সালে তা মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল।

লড়াইয়ের সময় দিল্লী, লাখনৌ, কানপুর, মাদ্রাজের রাজপথে দেয়াল লিখন করে এ জেহাদে জনগণকে শরীক হওয়ার আহবান জানানো হয়েছিল। লক্ষণীয়, জেহাদে যারা শরীক হবে না তাদেরকে দোজখের আগুনে জ্বলতে হবে

www.pathagar.com

বলে অভিশম্পাতও করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই ও আজাদীর আকাঙ্খা ভারতীয় জনমানসের কত গভীরে পৌঁছেছিল এ তার প্রমাণ। দেশপ্রেমিক সিপাহীরা এ সময় উচ্চ কণ্ঠে এই গান গাইত ঃ

দরিয়া মে তুফান
বড়ি দূর ইংলিশস্থান;
জলদি যাও, জলদি যাও
ফিরিঙ্গি বেঈমান।

স্কটিশ লেখক উইলিয়াম ডালরিম্পল রোমাঞ্চকর ভঙ্গিতে ইতিহাস লিখে বেশ নাম করেছেন। তার একটা বিখ্যাত বইয়ের নাম হচ্ছে দ্যা লাস্ট মুঘল ঃ দ্যা ফল অফ আ ডাইনেস্টি, দিল্লী, ১৮৫৭। এই সাদা চামড়ার লেখকের ইতিহাস লেখার ভঙ্গিকে বেশ প্রশংসাও করেছেন অনেকে। অমর্ত্য সেন, খুশবন্ত সিং, মুশীরুল হাসান প্রমুখ বলেছেন 'সাধারণ মানুষকে কি তিনি ইতিহাসে আগ্রহী করতে চান? তাহলে এভাবেই রোমাঞ্চকর সুখপাঠ্য ভঙ্গিতে ইতিহাস লেখা উচিত।' এই ডালরিম্পলও ১৮৫৭'র জেহাদ ও দেশপ্রেমিক সিপাহীদের বিপ্লবী ভূমিকাকে পূর্ব ও পশ্চিমের সশস্ত্র বিরোধ হিসেবে দেখেছেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার কথা হচ্ছে ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহ মূলতঃ ইসলামী মৌলবাদের সঙ্গে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ লড়াইয়ের অংশ। তার মানে সিপাহী বিদ্রোহেও ইসলামী জঙ্গিবাদের গন্ধ পাচ্ছেন ডালরিম্পল। বোঝা গেল এই স্কটিশ ঐতিহাসিক তার সাদা চামড়ার নীচে বর্ণবাদের ছবিকে লুকোছাপা করতে পারেননি। তিনি তার পূর্বসূরী ঐতিহাসিকদের মত ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, লুণ্ঠন, অবিচারের বিরুদ্ধে আজাদীর লড়াইকেও মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের সাথে একার্থ করে দেখেছেন। কিন্তু একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ আন্দোলন, আজাদীর লড়াই কেন জঙ্গিবাদ হতে যাবে? তাহলে কি ডালরিম্পল ও তার সহযোগী ঐতিহাসিকরা প্রতিরোধের পরিবর্তে উপনিবেশিত জাতিগুলোকে ঔপনিবেশিক ত্রাস সৃষ্টিকারী প্রভুদের আনুগত্য করার পরামর্শ দিচ্ছেন না?

মজার ব্যাপার হলো ১৮৫৭'র ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধটা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল হিন্দু মুসলমানের যৌথ লড়াই। বিপ্লবীরা ধর্মনির্বিশেষে বাহাদুর শাহ জাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছে। হিন্দুরাও একজন মুসলমান বাদশাহকে ভারত সম্রাটরূপে মেনে নিয়েছে। বিপ্লবের যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের নামগুলো পর্যালোচনা করলেও বোঝা যায় এ বিদ্রোহের

www.pathagar.com

পিছনে সাম্প্রদায়িক চরিত্র খোজা অর্থহীন। বাহাদুর শাহ জাফর, মঙ্গল পাণ্ডে, ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাই, তাতিয়া টোপি, বেগম হযরত মহল, মৌলভী আহমদুল্লাহ, বখত খাঁ, হাবিলদার রজব আলী প্রমুখ অনেকেই এ বিদ্রোহের নেতৃত্বের প্রথম সারিতে ছিলেন। মহাবিদ্রোহের বিশাল ঘটনার পিছনে ছিল সাধারণ জনগণের এই ঐক্য। এই কারণে এচিসন নামক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ উচ্চপদস্থ এক সামরিক অফিসার তখন দুঃখ করে লিখেছিলন 'এক্ষেত্রে আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ব্যবহার করতে পারিনি। ডালরিম্পলের মত ঐতিহাসিকরা ভারতের জনগণের উপনিবেশবিরোধী প্রথম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ইসলামী জঙ্গিবাদ, সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদি বলে চালাতে চেয়েছেন কারণ এতে এই মহাবিদ্রোহের মর্যাদাকে খাটো করা যায়। এটা সত্য ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহের প্রেক্ষাপট রচনায় মুসলমানদের ভূমিকাই ছিল বেশি। কারণ ইংরেজরা তাদের কাছ থেকেই রাষ্ট্র ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল এবং তাদের উপর দিয়েই বস্তুতঃ চলেছিল ইংরেজের রাজরোষ ও জুলুমবাজী। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওহাবীদের আন্দোলন ছিল ঐতিহসিক ঘটনা। ওহাবী আন্দোলন ছিল ভারতের মুসলমানদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। এ আন্দোলনের ভাবধারার সাথেই সম্পৃক্ত হয়েছিলেন বালাকোটের বিখ্যাত সৈয়দ আহমদ শহীদ ও বারাসাতের মীর নিসার আলী তিতুমীর। পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে ওহাবীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ গড়ে তুলেছিল এবং পলাশীর পর থেকে প্রায় একশ বছর ধরে তারা লড়াই চালিয়েছিল। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব যারা দিয়েছিলেন তারা সবাই ছিলেন দেশপ্রেমিক, অধিকাংশই আলেম ও দ্বীনদার ব্যক্তি। এ সব সাহসী মানুষেরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভয়ংকর চরিত্র যথার্থ চিনতে পেরেছিলেন। ওহাবীরা আজাদীর যুদ্ধকে জেহাদ হিসেবেই বিবেচনা করতো। এ কারণেই সাম্রাজ্যবাদীদের সেদিনের মত আজকেও জেহাদ শব্দটার প্রতি এত ন্যাক্কার। একই কারণে ইংরেজ ও তার পোষ্য দালালরা 'ওহাবী' শব্দটা একালের 'মৌলবাদ' কথাটার মতো গালি হিসেবে ব্যবহার করতো এবং এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের নেতৃবৃন্দকে Mad Mullah, Damn Mullah ও Bloody Fanatic বলে কটাক্ষ করতো যাতে আন্দোলনের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে দেয়া যায়। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের মুসলমানদের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্খাকে পিষে মারার ব্যবস্থা করে। উপনিবেশগুলোতে যখনই প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছে, জনগণ আজাদীর

www.pathagar.com

আকাঙ্খায় মাঠে নেমেছে তখনই সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের নানাভাবে চরিত্র হনন করার চেষ্টা করেছে। প্রয়োজনে শক্তির জোরে প্রতিরোধকারীদের নির্মূল করে দিয়েছে।

সাদা চামড়ার ঐতিহাসিকরা ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহকে ছোট করার চেষ্টা করবেন এটা যে স্বাভাবিক সেটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু ঔপনিবেশিক আবহাওয়ায় যে সব দেশি ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীর মানস গঠন হয়েছে এবং কালো চামড়ার নিচে যারা নিজেদের ব্রিটিশ পরিচয় দিতে পছন্দ করেন তারাও কিন্তু সাদা চামড়ার ঐতিহাসিকদের মতামত অনুসরণ করে গেছেন। রজনী পামে দত্ত, যদুনাথ সরকারসহ বহু ভারতীয় ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবী ইংরেজদের মত ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম সর্বব্যাপি স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে মেনে নিতে চাননি। তাদের মতে এটা ছিল সামন্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে নিছক সিপাহী বিদ্রোহ। এরা যাই বলুন না কেন সুদূর ইউরোপে বসে মার্কস ও এ্যাঙ্গেলস ১৮৫৭'র যুদ্ধকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং এটিকে উপনিবেশবিরোধী মুক্তি সংগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করেন। এটা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় বিদ্রোহে রাজা জমিদাররা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে মার্কস কোথাও তাদের ফিউডাল, প্রতিক্রিয়াশীল বলেননি। তিনি তাদের দেশপ্রেম ও সাহসের প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে মার্কসের এদেশীয় মতানুসারী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের অনেকে ১৮৫৭'র জাতীয় অভ্যুত্থানের সময় তৎকালীন কলকাতার বাবু বুদ্ধিজীবী, বেনিয়া ও জমিদারদের মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদের দালালী এবং প্রতিক্রিয়াশীল মুৎসুদ্দীর ভূমিকাকে ঠিক নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেননি, অনেক ক্ষেত্রে মহাবিদ্রোহকেও তারা অবমূল্যায়ন করেছেন। এর কারণ হচ্ছে এরা প্রগতিশীলতার অন্তরালে কলকাতার বাবুদের প্রতিক্রয়াশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষমতান্ধ অনুকারিতার চরিত্র ছাড়তে পারেননি।

লক্ষণীয় বিদ্রোহটা শুরু হয়েছিল বাংলা থেকে যেখানে নাকি ইংরেজ তার উপনিবেশের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে। যদিও ১৮৫৭'র বিদ্রোহের সময় মূল যুদ্ধটা হয়েছিল উত্তর ভারতে। বাংলার বহরমপুর, ব্যারাকপুর, জলপাইগুড়ি, ঢাকা ও চট্টগ্রামে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভাগিরথী নদীর পূর্বপারে কলকাতা থেকে ১৪ মাইল উত্তরে ব্যারাকপুর সেননিবাসে মহাবিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়। এই সূচনাকারীদের নায়ক ছিলেন ২৬ বছরের তরুণ অযোধ্যার

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ মঙ্গল পান্ডে। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানির ফৌজ তাকে গ্রেফতার করে ফাসী দেয়। চট্টগ্রামে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন হাবিলদার রজব আলী। যিনি তার ক্ষুদ্র সেনাদলসহ যুদ্ধ করতে করতে সেনানিবাস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

এই বিদ্রোহের আশু কারণ ছিল দেশি সিপাহীদের প্রতি ইংরেজদের দাসসুলভ অপমানজনক আচরণ, ইংরেজ ও দেশি সিপাহীদের ভিতরকার তনখার ফারাক, ইংরেজ সিপাহীদের দ্রুত পদোন্নতি, তাদের দেশীয় সিপাহীদের চেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা প্রদান। সর্বোপরি গরু ও শুয়োরের চর্বি মিশানো টোটা দাঁত দিয়ে ছেড়ায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্মনাশের আশংকা। কোম্পানি কর্তৃক ধর্মনাশের এই সম্ভাবনায় সিপাহীরা ফুসে ওঠে এবং ধর্মের নামেই শুরু হয় বিদ্রোহ, জেহাদ। কিন্তু পেছনের কারণ ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত শোষণ, লুণ্ঠন, বঞ্চনার একশ' বছরের ইতিহাস এবং এই ইতিহাসজাত প্রবল ও ক্রুদ্ধ জনরোষ। বিদ্রোহের এই আগুনে ফুলে ওঠে দিল্লী, লাখনৌ, কানপুর, ঝাঁসি, রায়বেরিলি, রোহিলাখন্ড, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, মীরাট। বিপ্লবী সিপাহীরা জনগণকে সাথে নিয়ে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বাদশাহ ঘোষণা করে লড়াই শুরু করে।

লক্ষণীয় শেষ মোঘল উত্তরাধিকারকে বিপ্লবীরা দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে এটাই প্রমাণ করেছিল ইংরেজরা হচ্ছে জবরদখলকারী এবং ভারতের প্রকৃত শাসক হলেন মোঘল বাদশাহরা। ভারতীয় জনমানসে মোঘলদের স্থান কত সুউচ্চ ছিল এ ঘটনা তাই প্রমাণ করে।

বিপ্লবীদের সহযোগে সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের জনগণের এই অভ্যুত্থান ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের ভিত একরকম কাঁপিয়ে দেয়। বিপ্লবীরা ১০,০০০ বর্গমাইল এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং বিপ্লবীদের অধীনস্থ এলাকায় প্রায় ৩,৮০,০০০০০ মানুষের বসতি ছিল। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এত বড় আঘাত সেদিন আর কোন উপনিবেশিত দেশের জনগণ দিতে পারেনি। তাই এই অভ্যুত্থান শুধু ভারতের মানুষকে উজ্জীবিত করেনি, সারা দুনিয়ায় যারাই ঔপনিবেশিক জুলুম, শোষণের শিকার হয়েছিল তারাই এ ঘটনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করবার প্রেরণা পেয়েছিল। বস্তুতঃ এই সময় চীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সব বিদ্রোহ ও গণবিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল তার সঙ্গে ভারতের এই জাতীয় অভ্যুত্থানটি ছিল একই সূত্রে গাঁথা।

www.pathagar.com

পুরো ভারতবর্ষের সাথে এই মহাবিদ্রোহের কালে বাংলাদেশের জনসাধারণও কমবেশি একাত্ম হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে পলাশী পরবর্তী একশ' বছরের মধ্যে কলকাতার বাবু, বেনিয়া, মুৎসুদ্দি, জমিদার ও বুদ্ধিজীবী যাদের উত্থান ঘটেছিল তারা ব্যতীত বাংলাদেশের আমজনতা এ ঘটনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তিতুমীরের আন্দোলনের মত পূর্ববঙ্গে পলাশী পরবর্তী সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার গর্ভজাত জমিদার ও নীলকর সাহেবদের জুলুম, বেঈনসাফীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা। এরাই বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক লোকজ ঐতিহ্য গড়ে তোলে এবং স্থানীয় বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতের বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করে। এই সময় ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা ছিলেন দুদু মিঞা। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় ফরায়েজীরাও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, ফলে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে দুদু মিঞাকে আলীপুর জেলে আটক রাখা হয়।

১৮৫৭'র বিদ্রোহের সময় ২৬ নভেম্বর ঢাকার সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং লালবাগ দুর্গে বিপ্লবী সিপাহীদের সাথে ইংরেজদের ভয়ংকর সংঘর্ষ হয়। শেষে বিপ্লবী সিপাহীরা নদী সাতরিয়ে পলায়ন করে। যারা ধৃত হয় তাদেরকে আন্ডাঘর ময়দান (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) সদরঘাট, লালবাগ, চকবাজারে এনে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয় এবং দিনের পর দিন জনমনে আতংক সৃষ্টির জন্য সেই লাশ গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

সভ্যতার দাবীদার (?) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বিদ্রোহ দমনের পর পুরো ভারত জুড়ে এই নিষ্ঠুর অপকর্মটি করে। সভ্যতার আড়ালে হত্যা, লুণ্ঠন, শোষণ, অবিচার, চালানো সাম্রাজ্যবাদের পুরনো খাসলত। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে এর চেহারা একই।

৫৭'র বিপ্লব বাহ্যতঃ ব্যর্থ হয়েছিল। এর নানা কারণ ছিল। কিন্তু এই মহাবিদ্রোহ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত নিপীড়িত মানুষের অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। ৫৭'র বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু বিপ্লবের চেতনা ব্যর্থ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ আজও নানা দেশে নানা প্রকারে অব্যাহত ও সচল রয়েছে। সেই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে শৃখলিত মানুষের আজাদীর লড়াইও চলছে। সাম্রাজ্যবাদ যতদিন থাকবে, ৫৭'র বিপ্লবী চেতনাও ততদিন টিকে থাকবে। জাতি হিসেবে এই বিপ্লবী চেতনার আমরাও অংশীদার একথা যেন কেউ ভুলে না যাই।

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনের আরমাগেডন

'শ্যারন কোনো কবিতা পেতে পারে না।
কারণ ও ভাষাকে ধ্বংস করে,
তার মাঝে আছে জিঘাংসা এবং রক্তের পিপাসা।'

মাহমুদ দারবিশ

আরমাগেডন (Armageddon) শব্দটা ইংরেজিতে এসেছে প্রাচীন হিব্রু ভাষা থেকে। এর মানে হচ্ছে খুব বড় আকারের বিপজ্জনক ও খুনরাঙ্গা যুদ্ধ। নিউ টেস্টামেন্টেও এই শব্দটার ব্যবহার আছে। এখানে মহাপ্রলয় বা কেয়ামতের আগে দুনিয়াতে ন্যায়-অন্যায়ের শেষ যুদ্ধ বোঝাতে এ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। ফিলিস্তিনে আজ যে লড়াই চলছে তাকেও বলা যায় এক ধরনের আরমাগেডন। ফিলিস্তিনের জনপ্রিয় কবি মাহমুদ দারবিশ উপরোদ্ধৃত কবিতায় ন্যায়-অন্যায়ের সেই পক্ষ বিচার করেছেন। সেখানে আজ জিঘাংসু ও রক্তপিপাসুদের সঙ্গে লড়াই চলছে মজলুম মানুষের। কোরআন শরীফে যাকে বলা হয়েছে মুস্তাকবিরিন (অত্যাচারী) ও মুস্তাদাফিনের (অত্যাচারিত) যুদ্ধ।

এ যুদ্ধের শুরুটা অনেক পুরনো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের ভিতর শুরু হয় জিওনিস্ট আন্দোলন। সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইহুদিদের জন্য একটা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন। জিওনিস্ট আন্দোলনের একজন বড় নেতা ও তাত্ত্বিক হলেন ভিয়েনার ইহুদি সাংবাদিক ড. থিওডর হারজেল। তখন পর্যন্ত এ আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকলেও কোথায় এ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হবে এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। তবে জিওনিস্ট আন্দোলনের অনেক নেতা তাদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত 'ইহুদিদের প্রতিশ্রুত বাসভূমি' যে আজকের ফিলিস্তিন এলাকায় হওয়া উচিত তা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। সে হিসেবে জিওনিস্ট আন্দোলন ছিল পুরোপুরি ধর্মবাদী আন্দোলন, কোনো সেকুলার আন্দোলন নয়। সে সময় ফিলিস্তিন ছিল অটোমান খলিফাদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি আরবি ভাষী প্রদেশ। ইহুদি নেতারা অটোমান খলিফা সুলতান আবদুল হামিদের কাছে

www.pathagar.com

ফিলিস্তিন এলাকায় তাদের বসতি গড়ার জন্য কিছু জমিন প্রার্থনা করেন। খলিফা সেই অনুরোধ সঙ্গত কারণেই রাখতে পারেননি।

জিওনিস্ট আন্দোলন কখনো কামিয়াব হতো না যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক হেরে না যেত। তুরস্কের হেরে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো আরব নেতাদের গাদ্দারি ও ব্রিটিশ রাজনীতিকদের চাতুর্য ও অন্তর্ঘাত। আজকে আমরা হানাদার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্মুখে আমেরিকাকেই হামেশা দেখতে অভ্যস্ত বলে ব্রিটেনের ষড়যন্ত্র, হামলাবাজি ও কূটকৌশল সম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজখবর রাখি না। আজকে আমেরিকা ও তার সাঙ্গাত ইসরাইল যে অঞ্চলটিতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, সে এলাকাটা এক সময় নিয়ন্ত্রিত হতো সাম্রাজ্যবাদের আরেক দোসর ব্রিটেনের হাতে। এ কালে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নামের আড়ালে আমেরিকার নেতৃত্বে ইসলাম ও ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে, এক সময় ব্রিটেন সে কাজটিই করেছে। আজ আমেরিকা সেই ধারাবাহিকতাকেই এগিয়ে নিচ্ছে মাত্র।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমা খ্রিস্টান মিশনারি ও গুপ্তচররা তুরস্কের নিয়ন্ত্রিত আরবিভাষী অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। মিশনারিরা সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদের অগ্রবাহিনী হিসেবে কাজ করেছে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য, যাতে মূল সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টীয় শক্তি সহজে এসে পা গাড়তে পারে। আমাদের উপমহাদেশেও এর বিস্তর নমুনা আছে। পাদ্রীরা এখানে ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য চর্চা ও বিকাশের নামে কলকাতার বাবুদের দিয়ে কালে কালে এক বিকৃত হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িকতার তমসায় আচ্ছন্ন করে দেয়। এই মিশনারিরাই তুর্কি নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জায়গায় আরবি সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র খুলে বসে, যা কালক্রমে হয়ে ওঠে আরব জাতীয়তাবাদের ঘাঁটি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল টি. ই. লরেন্স, হ্যারি সেন্ট জন ফিলবির মতো ব্রিটিশ গুপ্তচররা।

টি. ই. লরেন্স আরবি পোশাক পরে বেদুইনদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন আর তুর্কিদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের উস্কানি দিতেন। লরেন্স পরে বিপুল সাহিত্য খ্যাতি পেয়েছিলেন তার গোয়েন্দাগিরিকে ভিত্তি করে 'Seven Pillars of Wisdom' বই লিখে। এই বইকে কেন্দ্র করে পরে তৈরি হয় বিখ্যাত 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' ছবি। এখানে লরেন্সের ইমেজকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা

www.pathagar.com

হয়েছে তুর্কিদের জোয়াল ভেঙে আরবদের মুক্তিদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। আসলে লরেন্স ছিলেন নিছকই সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট, প্যান-ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোধা।

যা হোক মিশনারি ও ব্রিটিশ গুপ্তচররা আরব নেতা ও এলিটদের এটা খুবই ভালো করে বোঝাতে পেরেছিল, তুর্কিরা তাদের শাসন ও শোষণ করছে। তুর্কিরা ইসলামের আসল প্রতিনিধি নয়। তারা ইসলামের সমূহ ক্ষতি ও বিকৃতির কারণ হয়েছে মাত্র। তাই আরবদের মুক্ত হতে হবে তুর্কিদের শৃঙ্খল থেকে। তুর্কি অটোমানদের অর্ধেক পৃথিবী জোড়া প্যান-ইসলামিক ভিত্তিকে ভাঙতে সেদিন আরব জাতীয়তাবাদের ভ্রূণকে লালন করেছিল ব্রিটিশ সরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আজকের ফিলিস্তিন অঞ্চলে তুর্কি ও ব্রিটিশ সেনাদের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এতে আরবরা করে ব্রিটিশদের সমর্থন। এ যুদ্ধে তুর্কিরা হেরে যায় এবং কয়েক লাখ সৈন্য হারায়।

ব্রিটেনের তরফ থেকে টি. ই. লরেন্স আরবিভাষীদের অটোমান খলিফার বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহের উস্কানি দিচ্ছেন, তখন অন্যদিকে তার আরব মিত্রদের এই বলে প্রবোধ দিচ্ছেন–ব্রিটেন তাদের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে; কিন্তু যুদ্ধের পর ব্রিটেন সে ওয়াদা রাখেনি। যুদ্ধের পর কুখ্যাত বেলফুর ঘোষণা দেয়া হয়। সেই ঘোষণায় ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেনের সম্মতির প্রতিশ্রুতি ছিল। সোজা কথায় আরবরা প্রতারিত হয়েছিল। এভাবে আরব বিশ্বকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল। ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই আয়োজনকে ইকবাল বলেছিলেন 'Outpost of Western Imperialism', যা যথার্থ অর্থেই সত্য।

প্রথমদিকে এই ইহুদি রাষ্ট্রটিকে উগান্ডায় প্রতিষ্ঠার কথা উঠেছিল। সেরকম হলে আজকের মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এড়ানো যেত। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা শেষ পর্যন্ত তা করেনি। তাই প্রশ্ন ওঠে, পশ্চিমারা ফিলিস্তিনে শুধুই কি ইহুদিদের 'প্রতিশ্রুত বাসভূমি' দিতে চেয়েছিল, না এর মাধ্যমে তাদের শত শত বছরের মুসলিম-বিদ্বেষ ও ক্রুসেডীয় জিঘাংসা রূপায়ণের পরিকল্পনা করেছিল। খাঁটি মার্কসবাদীরা যেমন মনে করেন, পৃথিবীর বৃহৎ তেলের মজুদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য ব্রিটিশ এ কাজটি করেছিল তা হয়তো

www.pathagar.com

আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য নয়। তুর্কিদের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ জেনারেল এলেনবি জেরুজালেমে গাজী সালাহউদ্দীনের কবরে পদাঘাত করে উচ্চারণ করেছিলেন ইতিহাসের আর এক সত্য : সালাদীন, আমরা আবার ফিরে এসেছি। ক্রুসেড আজো মরেনি।

অটোমান খলিফাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটিশরা কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ আরব নেতার সমর্থন পায়। ইহুদি নেতা ভাইজম্যান একবার বলেছিলেন, পয়সা দিয়ে আরব নেতাদের হাত করা যায়–এ কথাটা অসঙ্গত ছিল না। পয়সা দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, ক্ষমতার টোপ দিয়ে বা অন্যান্য কৌশলে ব্রিটিশরা আরব নেতাদের নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিল। এদের একজন হচ্ছেন হেজাজের হাশেমি বংশের শরীফ হোসেন যিনি হজরত মোহাম্মদের (স.) বংশধারার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দাবি করেছিলেন। এই শরীফ হোসেন ছিলেন আমাদের দেশের মীর জাফরের মতো, যে কিনা নবাবীর লোভে ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। শরীফ হোসেনকে ব্রিটিশরা টোপ দিয়েছিল তুর্কিদের পরাজয়ের পর তাকে মুসলিম জাহানের খলিফা বানানো হবে। এ কারণে ব্রিটিশরা হোসেনের ইমেজকে উচ্চকিত করার চেষ্টা করে তার জনসমর্থনের ভিত্তিকে সম্প্রসারণের জন্য।

ব্রিটিশের সঙ্গে শরীফের এই মিতালী যখন চলছে তখন আমাদের দেশে শুরু হয়েছে বিখ্যাত খেলাফত আন্দোলন। আমাদের নেতারা অন্তত এটা বুঝেছিলেন, তুর্কি খেলাফতের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটা যদি টিকে না থাকে তবে মুসলিম দুনিয়া দুর্বল হয়ে পড়বে। মুসলমান জগতে কোনো Core State বা Super Power থাকবে না। শেষমেশ মুসলমানরা পাশ্চাত্যের সামনে অসহায় হয়ে যাবে। আমাদের খেলাফত নেতারা যেটা বুঝতে পেরেছিলেন, শরীফ হোসেন প্রমুখ আরব নেতারা সেটা বুঝতে পারেননি বা নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে এমত চিন্তাকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

শরীফ হোসেনের পর ব্রিটিশরা যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে তাদের দলে ভিড়িয়েছিল তিনি হলেন ইবনে সউদ। এই ব্যক্তিটি ছিলেন প্রথমদিকে ওহাবিদের সমর্থক। পরে তিনিই ব্রিটিশের সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থনে আরব উপদ্বীপের সর্বেসর্বা বনে যান।

বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই ধূর্ত ইংরেজ ফ্রান্স, ইতালি ও রাশিয়ার সঙ্গে বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার পরিকল্পনা করে। এই

www.pathagar.com

পরিকল্পনাই সাইকেসপিক চুক্তি নামে পরিচিত যা অটোমান খেলাফতকে পশ্চিমের উপনিবেশ হিসেবে বিভক্ত করে। এই চুক্তির ফলেই মধ্যপ্রাচ্যে কতকগুলো রাজা-বাদশাহ নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্ম হয় যা বর্তমানে জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক ও কুয়েত রাষ্ট্রের চেহারা নিয়েছে। এসব কৃত্রিম জাতি-রাষ্ট্র ফুটিয়ে তোলার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সংহতিকে দুর্বল করা, তাদের পারস্পরিক বিবাদ জিইয়ে রাখা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অভিসন্ধিকে অব্যাহত রাখা। সাম্রাজ্যবাদীদের সে ইচ্ছা ভালোমতই কার্যকরী হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটেন ভাগে পায় ফিলিস্তিন ও জর্ডান, ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে থাকে সিরিয়া ও লেবানন, ইতালিকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় আনাতোলিয়ার অংশবিশেষ আর রাশিয়া পায় আরমেনিয়া ও কুর্দিস্তান। অটোমানদের হারের পর সাইকেসপিক ও বেলফুর চুক্তির বিশ্বাসঘাতকতার দিক শরীফ হোসেন নির্মমভাবে উপলব্ধি করেন এবং সিংহাসন ত্যাগ করেন। পরে তার তিন পুত্র আলী, ফয়সল ও আবদুল্লাহ আরব শাসনে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করেন। অন্যদিকে ধূর্ত ইংরেজ এদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আরব জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। হোসেনের প্রথম পুত্র আলী হেজাজ দখল করেছিলেন; কিন্তু ব্রিটিশ সমর্থিত ইবনে সউদের সেনাবাহিনীর হাতে পরাস্ত হন। ইবনে সউদকে দিয়ে হাশেমি বংশকে উৎখাত করার পেছনে ব্রিটিশের লক্ষ্য ছিল তাৎণিকভাবে হাশেমিদের খেলাফতের দাবির ন্যায্যতাকে ভুল প্রমাণ করা।

দ্বিতীয় পুত্র টি. ই. লরেন্সের সহযোগী ফয়সল অটোমানদের কাছ থেকে সিরিয়া দখল করেছিলেন; কিন্তু ফরাসিরা তাকে বিতাড়িত করে। পরে ব্রিটেন তাকে ইরাকের বাদশাহ বানায়। তার ছেলে গাজী এবং গাজীর ছেলে ফয়সল দ্বিতীয় ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইরাক শাসন করেন। '৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে দ্বিতীয় ফয়সল নিহত হন।

হোসেনের তৃতীয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌র মাধ্যমে জর্ডানে এখনো হাশেমি বংশের শাসন টিকে আছে। আবদুল্লাহকে ব্রিটেন জর্ডানের বাদশাহ বানায়। আবদুল্লাহ তার পিতার মতোই ব্রিটিশের দালাল ছিলেন। এমনকি তার আব্বার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পরও তিনি ব্রিটিশের দালালিকেই মোক্ষ মনে করেন, ব্রিটিশ স্বার্থের দেখভাল করেন এবং বিশ্বাস করেন ব্রিটিশ

www.pathagar.com

প্রভুদের সঙ্গে বিবাদে তার কোনো ফায়দা নেই। ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার ফলে আরবদের মধ্যে উত্থিত জনরোষ দমনে ব্রিটেন আবদুল্লাহকে কাজে লাগায়। আবদুল্লাহ ১৯৫১ সালে আল আকসা মসজিদে খুন হন। তখন তার ষোল বছর বয়সী নাতি হোসেন সিংহাসন লাভ করেন এবং ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত জর্ডান শাসন করেন। এই হোসেনের ব্রিটিশ ও আমেরিকাপ্রীতি সর্বজনবিদিত। মোটকথা, জর্দানের হাশেমি রাজবংশ সাম্রাজ্যবাদের পেটোয়া। সাম্রাজ্যবাদের দেখভাল করা ছাড়া আরব জনগণের স্বার্থের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ইবনে সউদের রাজবংশ সম্পর্কেও একই কথা। এদের কাজ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ দেখা, সাম্রাজ্যবাদের দায়িত্ব এদের টিকিয়ে রাখা।

এই ঐতিহাসিক বিবরণটা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো একটা জিনিস আমাদের উপলব্ধি করা, ব্রিটিশ রাজ কি নিপুণতা ও দক্ষতার সঙ্গে স্বার্থান্ধ, ক্ষমতালিপ্সু, ভোগবিলাসী ও কওমের স্বার্থ উপেক্ষাকারী আরব শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ উদ্ধারের কাজে এবং আরব জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যের রাজা-বাদশাহ, আমির, রইস ও শেখরা আজো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সিলসিলা বহন করে চলেছেন। সেখানকার রক্তস্নানের প্রেক্ষাপটেও মধ্যপ্রাচ্যের বাদশাহদের নিস্পৃহতা ও পশ্চিম-নির্ভরশীলতার কারণ খোঁজা তাই কষ্টকর নয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল তথা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে না ওঠার এটাও একটা বড় কারণ। হামাসের মতো গণতন্ত্রী, বিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দলের উত্থান তাই এই বাদশাহ-রইসদের কাছে একেবারেই না-পছন্দ। কারণ এদের উত্থান তাদের ও তাদের প্রভুদের ভিত্‌কে নড়বড়ে করে দিতে পারে। এ কারণেই হামাস নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনার সঙ্গে বাদশাহদের পরিকল্পনার কোনো মৌলিক তফাৎ নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পঞ্চাশ বছরে আরব দুনিয়ায় আমরা নানা টানাপোড়েন দেখেছি। বিশেষ করে ইসরাইল সৃষ্টি হয় ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের প্রস্তাবে এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনে, যা আরব দেশগুলো মেনে নিতে পারেনি। তারা জড়িয়ে পড়ে ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে। এর আগেই ইহুদি নেতারা সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনে সারা দুনিয়া থেকে ইহুদিদের এনে জড়ো করছিল ফিলিস্তিনে তাদের অভীষ্ট রাষ্ট্র

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এরা খুব চড়া দামে ফিলিস্তিনে জমি কিনতে থাকে আর ফিলিস্তিনের আরবরা রাতারাতি ধনী হওয়ার লোভে তাদের জমিগুলো বিক্রি করে দিতে থাকে ইউরোপ থেকে আসা ইহুদিদের কাছে। আরবরা ভাবতেই পারেনি, ইহুদিরা জমি কিনছে তাদের একটা পৃথক রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য। ইসরাইলের সঙ্গে এই টানাপোড়েনের ভিতরেই পল্লবিত হয় আরব জাতীয়তাবাদ। ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের টানা কষ্টকল্পিত সীমানায় বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত আরবদের ঐক্যবদ্ধ করার পেছনে সোভিয়েত রাষ্ট্রের মতাদর্শের একটা ভূমিকাও ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ক্ষয় হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইলের ট্রাস্টিশিপ হাতে নেয় আমেরিকা এবং ইসরাইল-মার্কিন অক্ষশক্তির প্রভুত্বের মোকাবিলায় এই আরব জাতীয়তাবাদ এগিয়ে আসে। এর নেতৃত্ব দেন ইজিপ্টের জামাল আবদুল নাসের। জাতীয়তাবাদী নেতারা পশ্চিমা প্রভুত্ব ঠেকাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিতালী করে, আবার বিশ্ব রাজনীতিতে পুঁজিবাদ ঠেকাতে কমিউনিস্ট শিবিরের মিত্র বাড়াতে সোভিয়েত ইউনিয়নও আরবদের কাছে টানে। এই মিত্রতা কোনো নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়েছিল সাময়িক, কৌশলগত কারণে। ইসরাইলের ব্যাপারে সোভিয়েতেরও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। তাছাড়া ইসরাইল প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েতের ভূমিকাটাও ফেলনা নয়। ইসরাইলকে রক্ষা করতে আমেরিকা যেভাবে বস্তুগত ও নৈতিক সহযোগিতা দেয়, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ইসরাইলকে ঠেকাতে আরবদের জন্য সেরকম কোনো কিছুই করেনি। ফলে ১৯৬৭ ও '৭৩ সালে দুই-দুইবার সম্মিলিত আরব শক্তি ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে আরব জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন ভাঙচুর হয়ে যায়। তাছাড়া আরব শাসকদের কুৎসিত অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, দুর্বিনীত আচরণ ও সোভিয়েত দ্বিধার পরিপ্রেক্ষিতে আরব জনগণও আরব জাতীয়তাবাদের মরীচিকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের মানস জমিনে ফের বেড়ে ওঠে ইসলামিক পুনরুত্থানবাদ। তারা ভাবতে থাকে, ইসলাম ছেড়ে দেয়ার ফলেই আজ তাদের এই দুর্গতি। সুতরাং দুর্গতি মোচনের জন্য ইসলামের কাছে ফিরে যাওয়ার বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

এই পর্বেই ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনে মার্কিন-ইসরাইলি চাপ-তাপে ছিন্নভিন্ন, বেঈমানি আর অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ পিএলও ও ইয়াসির আরাফাতকে চ্যালেঞ্জ করে ১৯৮৮ সালে গাজা ভূখণ্ডে শেষ ইন্তিফাদা বা বিদ্রোহের সময় জন্ম নেয় ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন–হামাস। এই হামাস মতাদর্শিকভাবে ইজিপ্টের মুসলিম ব্রাদারহুড দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষ করে কমিউনিজমের পতনের পর আরাফাত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং আমেরিকার চাপে ইসরাইলের সঙ্গে তাদের পছন্দমত অসলো চুক্তি স্বাক্ষর ও ইহুদি রাষ্ট্রের মান্যতা স্বীকারে রাজি হয়ে যান। এভাবে কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনের শহীদদের রক্তে গড়ে ওঠা আজাদি আন্দোলনের সঙ্গে মোনাফেকি করতে গিয়ে আরাফাতের মতো বিপ্লবী নেতাও ফুরিয়ে যান। তার পিএলও দ্রুত জনপ্রিয়তা হারায় এবং ষড়যন্ত্রের আখড়ায় পরিণত হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, যুদ্ধবাজ বুশ-শ্যারনের আক্রমণে বিধ্বস্ত-লাঞ্ছিত ফিলিস্তিনিদের কাছে আরাফাত জাতীয় পরাজয়ের প্রতীক হয়ে ওঠেন।

মজার ব্যাপার হলো, অসলো চুক্তির আগে হামাস ও পিএলও উভয় দলকে পশ্চিমারা সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচনা করত; কিন্তু চুক্তির পর পশ্চিমাদের কাছে আরাফাত সন্ত্রাসী থেকে রাতারাতি রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হন। হামাস পূর্বাপর সন্ত্রাসী রয়ে যায়, কেননা তারা পশ্চিমের ব্যবস্থাপত্র কবুল করতে অস্বীকার করে।

যাই হোক, আজ হামাস ফিলিস্তিনি যুবকদের আদর্শ। সেখানকার গণমানুষের আশা-ভরসার স্থল। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ক্যারিশমেটিক অথচ প্রতিবন্ধী নেতা শেখ আহমদ ইয়াসিন, যিনি ইসরাইলি মিসাইলের আঘাতে শহীদ হন। হামাস একদিকে ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে, অন্যদিকে তাদের সামাজিক কার্যক্রম ফিলিস্তিনি গণমানুষের হৃদয় জয় করেছে। তারা ফিলিস্তিনে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল তৈরি করেছে। প্রচুর ফিলিস্তিনির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে মুখের বুলি ছাড়া ফাতাহর এখন দেয়ার কিছু নেই। ফাতাহ তার বিপ্লবী চরিত্র বিসর্জন দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বশ্যতাকেই অধিকতর 'বাস্তববাদী' ও 'প্রগতিশীল' বলে মেনে নিয়েছে।

www.pathagar.com

হামাসের জনপ্রিয়তা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, ইমাম সব শ্রেণীর মধ্যেই ঈর্ষণীয়। এটা তারা তাদের কল্যাণমুখী কাজের দ্বারাই অর্জন করেছে। পশ্চিমারা হামাসকে যতই সন্ত্রাসী বলুক না কেন, হামাস গণসংগঠন হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছে। একজন ভাষ্যকারের উদ্ধৃতি নেয়া যাক : 'HAMAS runs the best social services network in the Gaza Strip ... Structured and well organized, HAMAS is trusted by the poor (Gaza's overwhelming majority) to deliver on its promises, and is perceived to be far less corrupt and subject to patronage than its secular nationalist counterparts, especially Fateh ... Some senior officials in UNRWA (United Nations Relief Works and Agency) in Gaza acknowledged that HAMAS is the only faction they trust to distribute UNRWA food donations to the people. (John L. Esposito কৃত The Islamic Threat: Myth or Reality? দ্রষ্টব্য)

তাই ফিলিস্তিনে আজ যে 'আরমাগেডন' চলছে সেখানে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যের জায়গাটা স্থির করা দরকার। এটা জরুরি এই কারণে, এই পার্থক্য বুঝতে না পারলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ সহজ হবে না। এজন্যই ইতিহাসের পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা। ফিলিস্তিনের জিল্লতির জন্য আমেরিকা-ইসরাইলের অক্ষশক্তি অবশ্যই দায়ী; কিন্তু সেই যন্ত্রণাকে প্রলম্বিত করার পেছনে মুসলিম সমাজের যে অংশ সাম্রাজ্যবাদের বশ্যতা মেনে নিয়েছে, যে রাজা-বাদশাহ-স্বৈরশাসক ও প্রগতিশীল তকমাধারীরা সাম্রাজ্যবাদের কল্কি পাওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের অবস্থানটাও চিহ্নিত হওয়া দরকার। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের পর্যালোচনা এবং এই অঞ্চলে যুক্ত স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীগুলোর কৌশলের স্বরূপ জানা গেলেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

www.pathagar.com

সানুসী আন্দোলন

আমাদের দেশে এক সময় ওহাবী আন্দোলন প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ আন্দোলনের পথ ধরে ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং বালাকোটের সৈয়দ আহমদ শহীদ সীমান্ত প্রদেশে জেহাদ আন্দোলনের উন্মেষ ঘঠান। ইসলামের ভিতরকার এ সব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বহুবছর ধরে ইসলামের উপর আপতিত আবর্জনা রাশি ও সংস্কার সমূহ অপসারণ করে ইসলামকে তার মৌলিক বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে আনা। রসূল স.-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পর থেকেই ইসলামের বিস্তার শুরু হয় এবং এ ধারা মোটের উপর নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বিভিন্ন সুলতান ও বাদশাহদের হাতে অব্যাহত থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামকে যেমন নিত্য নতুন মানুষ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতে হয়, তেমনি নতুন নতুন প্রশ্ন, সমস্যা ও চিন্তাধারার মোকাবেলাও করতে হয়। এর ফলে ইসলামের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখ নেই এমন সব প্রথা পদ্ধতি ও চিন্তাভাবনা ঢুকে পড়ে এবং যে কারণে ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে একধরনের অবিশ্বাস ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এর প্রতিকারেই এসব আন্দোলনের জন্ম।

তাছাড়া আঠার আর উনিশ শতকে যখন এসব আন্দোলনের জন্ম তখন মুসলিম দুনিয়ায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আছড়ে পড়ে এবং প্রযুক্তিতে প্রাগ্রসর ও সামরিকভাবে অধিকতর উন্নত ইউরোপীয়দের মোকাবেলা করা তখন মুসলমানদের জন্য প্রায় দুস্কর হয়ে ওঠে। এসব আন্দোলনের শক্তি অর্জনের এটাও একটা কারণ। লক্ষ্যভ্রষ্ট মুসলমানদের সংগঠিত করে এ আন্দোলন যেমন তাদের নেতৃত্ব দেয় পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জেহাদে তাদেরকে সমানভাবে উজ্জীবিতও করে।

আমাদের দেশে যখন এসব আন্দোলন চলছিল তখন আফ্রিকার লিবিয়াতেও প্রায় একই ধরনের সানুসী আন্দোলন শক্তি অর্জন করতে থাকে। এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ ইবনে আলী আস সানুসী যিনি বিশেষভাবে সানুসী আল কবীর (Grand Sanusi) হিসেবে পরিচিত। সানুসী আল কবীরের হাতে এ আন্দোলনের উন্মেষ ঘঠলেও তার পুত্র সৈয়দ আল মাহদীর হাতে প্রকৃত অর্থে সানুসী আন্দোলনের গৌরবজনক উত্থান ঘঠে।

www.pathagar.com

সৈয়দ মোহাম্মদ ইবনে আলী আস সানুসীর জন্ম আলজেরিয়াতে। কিন্তু তিনি তার আন্দোলনের সূচনা করেন পবিত্র মক্কা শরীফে এবং পরবর্তী কালে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন লিবিয়ার সাইরেনিকা অঞ্চলকে।

সানুসী আল কবীরের চিন্তা ভাবনার একটা ধারণা আমরা পাই তার লেখা বইগুলোতে। মূলতঃ তার লেখা বইগুলোই হচ্ছে সানুসী দর্শনের ভিত্তি। অনেক গবেষক মনে করেন সানুসী আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ওহাবী চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। এ কথা সত্য দুটো আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবন এবং আন্দোলনের নেতারা আদর্শ হিসেবে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন হযরত রসূল (সাঃ) ও তার পূণ্য খলিফা চতুষ্টয়ের সময়কে। ইসলামের সূচনাযুগের শিক্ষা ও আদর্শকে নতুন করে প্রয়োগ করবার কথা তারা ভেবেছিলেন। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় সমকালের এ দুটো আন্দোলন পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া সানুসী আল কবীর আন্দোলনের সূচনাপর্বে একটা বিরাট অংশ সময় হেজাজ ও ইয়েমেনে কাটান, সেখানে তার ওহাবীদের সংস্পর্শে আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

আবার অন্যদিকে মোহাম্মদ ইবনে আলী আস সানুসী ও মোহাম্মদ ইবনে আবদ-আল-ওহাব উভয়েই এয়োদশ শতকের সিরিয়ার মুজতাহিদ, হাম্বলী আইনজ্ঞ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইবনে তাইমিয়া মনে করতেন মুসলমানরা বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুশীলনের দিক দিয়ে একটি স্বতন্ত্র ধারার অনুসারী, এই পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব ও তার ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তাদের মৌলিক লক্ষ্য এবং এই বিশ্বাসই হচ্ছে তাদের সর্বকর্মের প্রধান নিয়ামক। ইবনে তাইমিয়া ধর্মীয়, রাজনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক সকল সমস্যার সমাধান কোরআন ও সুন্নাহর ভিতর থেকে গ্রহণ করতে হবে বলে মনে করতেন। একই সাথে তিনি ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত করার পক্ষে জোরালো মতামত দেন। তিনি অবশ্য রসূল স.-এর ইন্তেকাল ও তার সময়ের অন্তবর্তীকালে ইসলামের মধ্যে উদ্ভুত কোরআন-হাদীস বহির্ভূত যাবতীয় সংস্কার ও প্রথা-পদ্ধতি বিলোপের পক্ষে রায় দেন। সমকালে ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাভাবনা ইসলামী চিন্তাজগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই ও পরবর্তীকালে মুসলিম পুনরুজ্জীবনকামী আন্দোলনসমূহ যেমন ওহাবী ও সানুসীদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। সানুসীরা অবশ্য আরও একজনের কাছে তাদের দর্শনের ব্যাপারে যথেষ্ট ঋণী। ইনি হচ্ছেন ইমাম গাজ্জালী। গাজ্জালী শরীয়াহ ও

www.pathagar.com

সুফীবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। এ কারণেই সানুসীদের মধ্যে সুফীবাদের একটা বিশেষ ধারার প্রচলন দেখা যায় এবং সানুসী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইবনে আলী আস সানুসী আন্দোলনের কর্মীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি চালু করেছিলেন যার লক্ষ্য ছিল আত্মার বিশুদ্ধতা অর্জন। এ সব কথা তিনি তার আস সালাসাবীল, বুঘইয়াত আল মাকাসিদ, ইকাজ আল ওয়াসনান প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদ উল্লেখ করেছেন।

ওহাবীদের সাথে সানুসীদের একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে ওহাবীরা শরীয়াহ ব্যাতীত অন্য সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, অন্যদিকে সানুসীরা শরীয়াহর সাথে সুফীবাদের একটা বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। সানুসী আল কবীর মনে করতেন একজন মুসলমানের প্রকৃত সাফল্য আসতে পারে শরীয়াহর সাথে সুফীবাদের যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে। সানুসীদের ভাষায় আদর্শ সুফী ব্যক্তিত্ব হলেন স্বয়ং হযরত রসূল স.।

ইজতিহাদ সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী আস সানুসীর মতামত রীতিমত উৎসাহপ্রদ ও আশাব্যাঞ্জক। তিনি মনে করতেন ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করার কোন অবকাশ নেই বরং কোরআন সুন্নায় যথেষ্ট পারদর্শিতা থাকলে যে কেউ ইজতিহাদের কথা বিবেচনা করতে পারে। আলী আস সানুসী মনে করতেন তকলীদের (Traditional View) ধারণাটা হচ্ছে কোরআন ও হাদীস পরিপন্থী। কোন মুজাতাহিদ তার ধারণার সমর্থনে তকলীদের অনুকুল মতামত পেতে পারেন, তিনি চাইলে তকলীদকে অনুসরণ করতে পারেন কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামদের নজীর তাকে অনুসরণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি উল্লেখ করেন কেউ চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করতে বাধ্য নয়। উপরন্তু মতামত পোষণ ও ব্যক্ত করার স্বাধীনতা থাকা চাই। আলী আস সানুসীর খোলামেলা বক্তব্যকে মাযহাবপন্থী আলেমরা বিশেষত: মালেকী মাযহাবের অনুসারী মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমরা তীব্রভাবে সমালোচনা করেন।

রাজনীতির ব্যাপারে সানুসীদের প্রাথমিকভাবে আপাত নিরপেক্ষ মনে হলেও পরবর্তীকালে রাজনীতি ও জেহাদ দুটিতেই সানুসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

এটা সত্য পুরো মুসলিম উম্মাহকে একটি ইমামতের পিছনে ঐক্যবদ্ধ করার মিশন নিয়ে মোহাম্মদ আলী ইবনে আস সানুসী কাজ শুরু করলেও রাজনীতি ব্যাপারে তিনি কোন মতামত দেননি। তিনি তখনকার মত মুসলমানদের সামাজিক ও

www.pathagar.com

ধর্মীয় পূনর্গঠনটার উপর বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। রাজনীতি ব্যাপারে যা কিছু ঘটেছিল তা পরবর্তীকালের ঘটনা। এর সাথে দ্বিতীয় সানুসী সৈয়দ আল মাহদী, বিশেষ করে তৃতীয় সানৌসী সৈয়দ আহমদ আশ শরীফ জড়িত হয়েছিলেন কেননা তখন তাকে ফরাসি ও ইতালী ঔপনিবেশিক শক্তির মোকাবেলা করতে হচ্ছিল।

আগেই উল্লেখ করেছি মোহাম্মদ ইবনে আলী আস সানুসী হিজাজে কাজ শুরু করলেও লিবিয়ার সাইরেনিকা অঞ্চলকে তার আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সেকালে লিবিয়া ছিল উসমানী খেলাফতের অধীন। বড় বড় শহরগুলোতে তুর্কী প্রশাসকরা রাজকার্য চালালেও সাইরেনিকার দুর্গম মরু অঞ্চলে তাদের প্রভাব ছিল সীমিত; ফলে এ অঞ্চলে আগে থেকেই একটা রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছিল। এ ছাড়া সানুসী আল কবীরের মনে হয়ত এটা থাকা অস্বাভাবিক নয় যে এরকম একটা অঞ্চল যা খেলাফতের প্রভাবমুক্ত সেখানেই তার কাজ শুরু করতে সুবিধা হবে। পাশ্ববর্তী আলজেরিয়ায় তখন ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তি হাত বাড়িয়েছে। সুদানে আজ যয়তুনা এবং মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমরা মোহাম্মদ ইবনে আলী আস সানুসীর ধর্মীয় মতামতের প্রতি প্রচণ্ড বিরূপ হয়ে উঠেছেন। এমতবস্থায় উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে সাইরেনিকাকেই তিনি তার আন্দোলনের জন্য উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। তাছাড়া সাইরেনিকার সাথে মধ্য আফ্রিকার যোগাযোগ ছিল চমৎকার; তিনি হয়ত তখনকার মত ভবিষ্যতে সেদিকে সানুসী প্রভাব বিস্তারের কথাও ভেবে দেখবেন।

মোহাম্মদ ইবনে আলী আস সানুসী যে আন্দোলন শুরু করেন তার উদ্দেশ্য শুধু ইসলামের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে শক্তি অর্জন ছিল না, ইসলামকে তিনি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ারও চেষ্টা করেছিলেন। সাইরেনিকার মরুভূমির অবাধ্য বেদুইনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে তিনি তাদেরকে যেভাবে শাসনে এনেছিলেন তা কখনো তুর্কী খলিফা কিংবা লিবিয়ার এককালীন কিরমানলী সুলতানদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। দস্যুতা ও ডাকাতি ছিল যে সব দুর্ধর্ষ বেদুইনদের রক্তের উত্তরাধিকার তারাই একদিন সানুসী আন্দোলনের প্রভাবে ইসলামের সিপাহসালার হয়ে উঠলো।

সানুসী কেন্দ্রগুলোকে বলা হতো জাবিয়া। এখান থেকেই মূলত: সানুসী নীতি ও আদর্শের প্রচার চলতো। সাইরেনিকার বিভিন্ন মরু অঞ্চলে এসব জাবিয়া প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয়েছিল। জাবিয়ার দায়িত্বে থাকতেন একজন প্রশাসক, যাকে সানুসী কোন কেন্দ্রে ইতোপূর্বে প্রশিক্ষণ নিতে হতো। সাধারণতঃ জাবিয়ার স্থান নির্বাচন হতো কোন মরুদ্যান বা মরুভূমির কোন কূপকে কেন্দ্র করে। জাবিয়ায় থাকতো মসজিদ, প্রশাসকের বাসা, আন্দোলনের কর্মীদের থাকবার জায়গা। জাবিয়ার সাথে সাধারণতঃ যুক্ত থাকতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে আন্দোলনের কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হতো। আন্দোলনের কর্মীদেরকে বলা হতো ইখওয়ান। এসব ইখওয়ানদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। জাবিয়ার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেয়া হতো।

জাবিয়ার প্রশাসকরা মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ চালাতেন। মরুভূমির পরিবেশে যেখানে উসমানী প্রশাসকদের প্রভাব ছিল না বললেই চলে, সেখানে যাবিয়ার প্রশাসকরা বেদুইনদের খবরদারি করতেন, তাদের মামলা-মোকদ্দামার ফয়সালা করতেন এবং তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত হারে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। একরকম বলা চলে লিবিয়ার উসমানী প্রশাসনের ভিতরে একটি দ্বিতীয় সানুসী প্রশাসন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সানুসীদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো তারা কখনোই উসমানী খেলাফতকে চ্যালেঞ্জ করেনি এবং এরকম পরিকল্পনাও তাদের ছিল না। নিছক উসমানী খেলাফতের ভিতরে থেকেই তারা তাদের সংস্কার কাজ অত্যন্ত নীরবে এগিয়ে নিয়েছে। পারতপক্ষে তারা উসমানী খেলাফতের কর্তা ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছিল। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় সানুসী যথাক্রমে সৈয়দ মোহাম্মদ ইবনে আলী আস সানুসী ও সৈয়দ আলী মাহদী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন খলিফার সাথে রাজনৈতিক বোঝাপড়া করতে গেলে তাদের মহৎ উদ্দেশ্যের ক্ষতি হবে মাত্র। কিন্তু সানুসীরা যত শক্তি অর্জন করতে লাগলো ততই তারা সকলের নজর কাড়তে শুরু করলো এবং স্বয়ং খলিফাও তাদেরকে সমীহ করতে শুরু করলেন। দ্বিতীয় সানুসী সৈয়দ আলী মাহদীর সময়ে সানুসী কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়, সাইরেনিকার সীমান্ত অতিক্রম করে সানুসী নীতি ও আদর্শের বাণী ত্রিপোলিটানিয়া, আরব, সুদান, আলজেরিয়া ও মিশরে ছড়িয়ে পড়ে। এসব স্থানে সানুসী কেন্দ্র জাবিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিপুল এলাকার জনসাধারণের কাছে সানুসীয়া নীতি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে বলতে গেলে এখানে একটি অঘোষিত সানুসীয়া রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সানুসী নেতারা এই বিপুল জনসাধারণের ধর্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা ছাড়াও তাদের আর্থ-সামাজিক ও জাগতিক প্রয়োজনের দিকেও খেয়াল রাখতেন। এইভাবে কালক্রমে সানুসীরা এই বিরাট অঞ্চলের নেতৃপদে উঠে আসে।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিকের কতকগুলো ঘটনা সানুসী নীতিতে পরিবর্তন সূচনা করে এবং নিছক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের পরিবর্তে সানুসীরা এবার রাজনীতি ও জেহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে।

প্রথমত মধ্য আফ্রিকায় ফরাসি সম্প্রসারণ নীতি সানুসীদেরকে বেকায়দায় ফেলে। ফরাসিরা মধ্য আফ্রিকায় সানুসীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রভাবে ভীত হয়ে চক্রান্ত শুরু করে এবং সানুসীদের ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। এমনতাবস্থায় সানুসীরা কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি, তারা ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে সানুসীরা পরাজিত হয়েছিল সত্য কিন্তু এর মাধ্যমে তারা আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। দ্বিতীয়ত: ১৯১১ সালে ইতালি লিবিয়া আক্রমণ করলে সানুসীরা পুনরায় ইতালির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। প্রথম দিকে তুর্কী প্রশাসন লিবিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য কিছু চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে ১৯১২ সালে তুর্কীরা ইতালির সাথে আউচি চুক্তির ফলে লিবিয়া থেকে পশ্চাদপসারণ করে। সেক্ষেত্রে পুরো লিবিয়ার আজাদী সংগ্রামের দায়িত্ব যেয়ে সানুসীদের উপর বর্তায়। এ সময় সানুসীদের প্রধান ছিলেন সৈয়দ আহমদ আশ-শরীফ। ১৯২৫ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে পুরো লিবিয়াকে ইতালি গ্রাস করে। এ সময় সানুসীরা ইতালির বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সানুসীদের এ মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী বিশেষ করে সানুসী নেতা উমর আল মুখতারের আত্মত্যাগের কাহিনী রীতিমত কিংবদন্তী হয়ে আছে।

লিবিয়ায় ইতালির উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সানুসী রাষ্ট্রটিরও অবসান ঘটে, এভাবে আফ্রিকার ইসলামী আন্দোলনের একটি অধ্যায় শেষ হয়ে যায়।

সময়ের প্রয়োজনেই সানুসী আন্দোলনের জন্ম। আফ্রিকার রঙ্গমঞ্চে সানুসীদের আবির্ভাব ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উনিশ শতকে যখন পুরো মুসলিম দুনিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের তোপের মুখে পড়ে টলটলায়মান হয়ে উঠেছে সেই কালে সানুসী নেতারা রীতিমত একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার্থে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের নজীর স্থাপন করে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন উদ্দেশ্যের সততা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা থাকলে খুব সামান্য থেকে অনেক বড় কিছু সৃষ্টি করা যায়।

www.pathagar.com

দেওবন্দের ওলামারা

আজকের দেওবন্দ মাদ্রাসার ঐতিহ্যের সাথে মুসলিম ভারতের ধর্মীয় নেতা ও আলেমদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামের এক দীর্ঘ ইতিহাস জড়িয়ে আছে। দেওবন্দ মাদ্রাসার নিষ্ঠাবান প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মওলানা কশেম নানুতভী ও তার শিষ্য সহচর মওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী। উনবিংশ শতাব্দীতে ওহাবী আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবার পর মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনের পর ভারতে পুরোপুরি বিটিশ সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলন কার্যতঃ শেষ হয়ে যায়। নতুন পরিস্থিতিতে মুসলমান ওলামারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাদের এ যাবৎ কাল পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামের নীতি ছেড়ে দিয়ে এক সাংস্কৃতিক রণনীতি গ্রহণ করেন। নতুন করে গৃহীত এ নীতির ফল হিসেবেই দেওবন্দ মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয়।

সেদিনের ওলামারা বুঝতে মোটেও দেরী করেননি, ব্রিটিশের লক্ষ্য শুধু ভারতে সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নয়, মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামোটাও অবলীলায় ধবংশ করে দেয়া তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। মুসলিম আইনের বদলে ব্রিটিশ আইনের প্রবর্তন, মুসলমান শিক্ষালয়গুলো বন্ধ করে দেয়া কিংবা এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর একমাত্র আয়ের উৎস ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো ছিনতাই করে নেয়া এবং ফারসীর বদলে ইংরেজি রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চালু করা– এ সব কিছুই ছিল মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করে দেয়ার বড় রকমের চক্রান্ত। সে কারণে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতারা তাদের লক্ষ্য নির্ধারণে মোটেও দেরী করেননি। প্রধানতঃ আলেম শ্রেণী ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে একটা সেতু-বন্ধন সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা।

এ মাদ্রাসার কারিকুলাম, সিলেবাস প্রভৃতি প্রণীত হয়েছিল ইসলামী ঐতিহ্যের ধরনে। আর প্রতিষ্ঠাতারাও তখনকার মত মনে করেছিলেন ঐতিহ্যিক শিক্ষা হারিয়ে গেলে এই ফিতনা ও বিবাদের যুগে মুসলিম সমাজের বিশুদ্ধতা আর থাকবে না। এ কালের ধর্মহীন শিক্ষাক্রম এ বিশুদ্ধতা একেবারেই বিনষ্ট করে দেবে। এর মানে এই নয় প্রতিষ্ঠাতারা কোন রকম বিজ্ঞান শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তারা যুক্তি দেখিয়েছিলেন এ সমস্ত শিক্ষা নেয়ার জন্য সরকারি আনুকুল্য প্রাপ্ত অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কেউ ইচ্ছা করলে এ মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে। কার্যত: এ অঙ্গীকার টেকেনি মাদ্রাসার দীর্ঘ কোর্সের কারণে, তাছাড়া ঐ ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে মিলিয়ে ফেলারও

www.pathagar.com

অনেকে বিরোধী ছিলেন। যাই হোক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেওবন্দ মাদ্রাসা কালক্রমে বহু নন্দিত হয় এবং ইসলামী দুনিয়ায় কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এর স্থান প্রায় একরকম নির্দিষ্ট হয়ে যায়। দেওবন্দের প্রাণপুরুষ মওলানা মোহাম্মদ কাশেম নানুতভী সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তিনি ছিলেন ধীমান ও প্রচন্ড রকমের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। একজন ঐতিহ্যবাদী আলেম হিসেবে তিনি আলীগড় আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, এমনকি আহলে হাদীস আন্দোলনও তার সুনজরে পড়েনি। কেননা এরা আইনী ব্যাপারে চারটি মাযহবের গুরুত্বকে প্রায় অস্বীকার করে বসেছিল। মওলানা নানুতভী স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কোরআন ব্যাখ্যার ১৫টি নীতিকে সমালোচনা করেছেন যা তার হানাফী আইনের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের উচ্চারণ। একই সাথে এ ছিল আলীগড় আন্দোলনের প্রতি দেওবন্দের এক ধরনের প্রতিক্রিয়াও বটে। মওলানা নানুতভীর সহযোগী মওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, যিনি আলীগড় আন্দোলনের প্রতি পুরোপুরি অসহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহর মৌলিক চিন্তাভাবনা দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। তিনি মনে করতেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমান সমাজের হিতৈষী হতে পারেন কিন্তু তার ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ইসলামের জন্য 'মরণবিষ' ছাড়া কিছু নয়। সৈয়দ আহমদ খানের প্রতি এই অসহযোগিতামূলক অবস্থান বিশেষ করে তার মুসলিম স্বাতন্ত্র্যমূলক রাজনীতির প্রতি উপেক্ষাই হয়তো পরবর্তীকালে দেওবন্দের ওলামাদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দুদের সাথে সহযোগিতামূলক রাজনীতির পক্ষে ফতোয়া দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কিছু কিছু সামাজিক প্রশ্ন ও সমস্যার ক্ষেত্রে যেমন বিধবাদের পুনর্বিবাহ, নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্ন এবং মুসলমান সমাজে হিন্দু প্রভাবিত সংস্কার বর্জন প্রভৃতির ব্যাপারে দেওবন্দের ওলামাদের বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট। সেদিক দিয়ে তারা ছিলেন সীমান্ত প্রদেশের মুজাহিদ আন্দোলনের দৃষ্টান্তের অনুসারী। যাবতীয় বিদ্যা বর্জন এবং সুন্নাহর নীতির প্রতি তারা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রাক আধুনিক যুগের চিন্তাভাবনার সাথে একমত ছিলেন। মওলানা নানুতভী বিদ্যাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহর কোন অংশের বর্জন কিংবা এর সাথে কোন কিছুর সমন্বয় অথবা সুন্নাহর প্রকৃতি বদলে দেবার নামই হচ্ছে বিদ্যা।

অন্যদিকে দেওবন্দের ওলামারা শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও ওহাবী অনুসারীদের অনেক কার্যক্রমকে অনুমোদন দেননি, যেমন পীরের মাযার জিয়ারত না করা এবং তাদের সুপারিশ করার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস না আনা। শাহ ওয়ালীউল্লাহ যেমন বিশ্বাস করতেন ইসলামের চার মাযহাবের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রয়োজন, মওলানা নানুতভী ঠিক তা মনে করতেন না। তিনি হানাফী বিশ্বাসেই অবিচল থাকার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মওলানা নানুতভী একজন অনলবর্ষী বক্তাও ছিলেন এবং

www.pathagar.com

ইসলাম বিরোধী খ্রিস্টান মিশনারী ও হিন্দু আর্য সমাজীদের সাথে তিনি বহুবার উন্মুক্ত মঞ্চে ধর্মীয় বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৮৭৬ সালে এরকম একটা ধর্মীয় বিতর্কে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হিন্দু থেকে খ্রিস্টান ধর্মালম্বনকারী রেভারেন্ড তারা চাঁদ। তিনি বহুবার আর্য সমাজ নেতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকেও উন্মুক্ত মঞ্চে ধর্মীয় বিতর্কে নামার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি দেওবন্দের ওলামাদের সহমর্মীতা থাকা স্বত্ত্বেও ১৯২৬ সালে তারা পুনরায় আর্য সমাজীদের পরিচালিত 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠনের' মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ধর্মীয় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন।

ধর্মীয় ব্যাপারে দেওবন্দের ওলামারা ফারাঙ্গী মহলের ওলামাদের চিন্তাভাবনার কতকটা অংশীদার ছিলেন বলে মনে হয় এবং তারা ফারাঙ্গী মহলের ওলামাদের মতোই সুফীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন এবং ওহাবীদের বিরোধিতা করতেন। দেওবন্দের ওলামারা মনে করতেন নবী ও দরবেশদের মৃত্যুর পরও তাদের শারীরিক অস্তিত্ব নিঃশেষ হয় না, তাদের আত্মা ও শরীর উভয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। খতমে নবুয়তের প্রশ্নে দেওবন্দের ওলামারা সুদৃঢ় অবস্থান নেন ও কাদিয়ানীদের তীব্র বিরোধিতা করেন। তারা খতমে নবুয়তকে বিচার করতেন – স্তর, ধারাক্রম ও কালের (rank, chronology and space) পরিপ্রেক্ষিতে।

মওলানা নানুতভী ও মাওলানা গাঙ্গোহীর কাল শেষ হলে দেওবন্দের ওলামাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন মওলানা মাহমুদ-আল-হাসান, যিনি শায়খুল হিন্দ নামে বহুল পরিচিত। তার নেতৃত্বে দেওবন্দ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে ও ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ থেকে এখানে ছাত্ররা ধর্মতত্ত্বে উচ্চশিক্ষা নিতে আসে। ১৯১০-এর পর তার উদ্যোগে আলীগড় ও দেওবন্দের পার্থক্য অনেকটা কমে যায় এবং এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য ও বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের কাজ শুরু হয়। অবশ্য ১৯২০-এর দিকে খেলাফত আন্দোলনের সময় মওলানা মাহমুদ–আল-হাসান, মওলানা মোহাম্মদ আলীর মতোই আলীগড়ের প্রতি এর সরকার নির্ভরতার কারণে ক্ষুব্ধ হন। এই ক্ষোভ থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় দিল্লীর জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামীয়া যা ছিল আলীগড়ের ইংরেজ অনুগত নীতির বিরুদ্ধে একটা বড় প্রতিবাদ। আলীগড়ের বিরুদ্ধে মওলানা মাহমুদ–আল-হাসানের দ্বিতীয় অভিযোগটি ছিল তার পূর্বসূরীদের মতোই। তিনি মনে করতেন আলীগড় তার ছাত্রদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে খৃস্টান (Cultural christianization) ও ধর্মের ব্যাপারে সংশয়ী করে তুলছে।

আলীগড়ের নীতি নির্ধারকদের সাথে তার একটা বড় পার্থক্য ছিল তিনি জিহাদের প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন। অন্যদিকে আলীগড় নেতৃত্ব ছিল একান্তই ইংরেজ নির্ভর ও ইংরেজ অনুগত। জিহাদকে মওলানা মাহমুদ–আল-হাসান মানব সমাজের

www.pathagar.com

কল্যাণ ও সমৃদ্ধির যৌক্তিক বাহন হিসেবে বিবেচনা করতেন। মওলানার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কীদের সাথে যোগাযোগের নীতি গ্রহণ করেন এবং সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন যার মূল লক্ষ্য ছিল ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উৎখাত। এ সময় তিনি হিজাযে যান এবং সেখানে তুর্কী নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির প্রতিপাদ্য ছিল যুদ্ধে তুর্কীদের বিজয় সাপেক্ষে ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, বিনিময়ে ভারতের মুসলমানরা যুদ্ধের সময় তুর্কী খেলাফতের পক্ষে ঐকান্তিকভাবে সমর্থন যোগাবেন। দুঃখের বিষয় এই চুক্তির কপি পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা হস্তগত করে ফেলে। অন্যদিকে তখন হিজাজে চলছিল ভিন্ন এক চক্রান্ত। মক্কার শরীফ হোসেন ব্রিটিশের প্ররোচনায় তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ব্রিটিশের এজেন্ট শরীফ হোসেন মক্কার আলেমদের কাছ থেকে এই মর্মে একটি ফতওয়া সংগ্রহ করে যে, তুর্কীরা যেহেতু কোরায়েশ নয় সে কারণে তাদের খেলাফত দাবী করার কোন এক্তিয়ার নেই। মওলানা মাহমুদ-আল-হাসান শরীফ হোসেনের এই চক্রান্ত টের পান এবং এই মর্মে জারিকৃত ফতোয়ায় স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন এই বলে যে কোরআন শরীফের কোথাও এমন কথা নেই খেলাফত কোন গোত্র বা নির্দিষ্ট জাতির একচ্ছত্র সম্পত্তি। এ কারণে শরীফ হোসেনের লোকজন মওলানা মাহমুদ-আল-হাসানকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেয়, যারা তাকে মাল্টায় দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখে।

এছাড়া মাহমুদ-আল-হাসান আফগানিস্তানে তার এক বিশেষ দূত মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে পাঠান, যাতে সেখান থেকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম পরিচালনা করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত প্রদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় এবং তা দমন করতে ব্রিটিশকে বেশ বেগ পেতে হয়। তুর্কী ও জার্মান গোয়েন্দারা এ সময় আফগানিস্তানে আসে এবং তাদের উৎসাহ ও পরামর্শে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে একটি প্রবাসী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রবাসী সরকারে মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেওবন্দের ওলামাদের খেলাফত ব্যাপারে এই উৎসাহের মধ্যে একটা প্যান ইসলামী ঐক্যবোধের পরিচয় মেলে যা সেদিন ব্রিটিশের প্রচারিত জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ধারণার উর্ধে উঠে ইসলামের বিশ্বজনীনতার প্রতি এ সমস্ত আলেমদের এক ধরনের বিশ্বস্ত আনুগত্যের উচ্চারণ বলে ধরে নেয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেওবন্দের ওলামারা, নদওয়াত আল উলামা ও ফারাঙ্গী মহলের ওলামাদের সাথে একসূত্রে মিলিত হয়ে জমিয়ত আল ওলামা-ই-হিন্দ নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে। এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন করে এবং উসমানী খেলাফতের সংরক্ষনকে একটা বড় উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। দেওবন্দের ওলামারা খুব ভালো করে বুঝেছিলেন শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উসমানী খেলাফত একটা বড় প্রতীক হিসেবে টিকে আছে। ব্রিটিশের চক্রান্তে সেই খেলাফত যদি ধ্বংশ হয়ে যায় তবে মুসলমানরা বহুধা বিভক্ত ও হতাশাগ্রস্ত একটা জাতিতে পরিনত হবে। আজ চারদিকে বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ার দিকে তাকালেই স্পষ্ট হবে সেদিনের ওলামাদের সংশয় ও উদ্বেগের যথেষ্ঠ কারণ ছিল। মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের নেতৃত্বে যখন ভারতে খেলাফত আন্দোলনের সূচনা হয় তখন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতারা তাতে পূর্ণ সহযোগিতা দেন। এ পর্যন্ত জমিয়তের কার্যসূচীতে যা ছিল তা হলো ব্রিটিশ বিরোধিতার পাশাপাশি প্যান ইসলামী চেতনার সমন্বয় করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে মওলানা মাহমুদ আল হাসান গান্ধীর অহিংস ও শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলনকে মুসলিম জিহাদের কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করেন, অন্তত: যতদিন সশস্ত্র স্বাধীনতার সুযোগ না আসে। মওলানা অবশ্য মনে করতেন ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে মুসলমানদের অংশগ্রহণ অবশ্যই তাদের শরীয়তের নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে হবে এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তারা ততক্ষণ পর্যন্তই সমর্থন করতে থাকবে যতক্ষণ না হিন্দুরা এমনকোন নীতি গ্রহণ করে যা তাদের স্বার্থের বিপক্ষে যায়।

১৯২৭ এর দিকে এসে জমিয়তে ওলামার নীতিতে বড় পরিবর্তন আসে বলে মনে হয় এবং এ পরিবর্তনে কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদের বড় রকমের প্রভাব যে কাজ করেছিল তা প্রায় অনস্বীকার্য। জমিয়ত এতকালের প্যান ইসলামী নীতি থেকে সরে আসে ও মওলানা আজাদের বিঘোষিত সমন্বয়মূলক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। এসময় মওলানা আজাদও তার পূর্বেকার প্যান ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে দেন ও কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী দর্শনে দীক্ষা নেন। এব্যাপারে মওলানা আনওয়ার শাহ ও দেওবন্দে মওলানা মাহমুদ আল হাসানের উত্তরাধিকারী হুসাইন আহমদ মাদানী মওলানা আজাদের রূপান্তরিত চিন্তা ভাবনার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেন। এই রূপান্তর কেন দেওবন্দের মত একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যের আন্দোলনকে গ্রাস করল তা বুঝে দেখা যেতে পারে।

দেওবন্দের ওলামারা বরাবরই আলীগড় আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। আলীগড় নেতৃত্বের ইংরেজ আনুগত্য তাদের ভালো লাগেনি। আলীগড় নেতৃত্বের মতোই মুসলিম লীগের প্রথমদিককার আনুগত্যের রাজনীতিও তাদের ভালো লাগবার কথা নয়। এই আনুগত্যের রাজনীতির বিরোধিতা করতে যেয়েই দেওবন্দের ওলামারা ব্রিটিশবিরোধী কংগ্রেসের রাজনৈতিক মিত্রে পরিণত হন; সেই মিত্রতা এতদূর মজবুত হয়েছিল যা আর কখনো ছিন্ন হয়নি। কিন্তু দেওবন্দের ওলামারা যেটা বুঝতে

www.pathagar.com

পারেননি বা চাননি সেটা হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যাত্রাও শুরু হয়েছিল আনুগত্যের রাজনীতির পথেই। তাছাড়া ভারতে হিন্দুদের সহযোগিতা ব্যাতীত ব্রিটিশ শাসন এতদিন দীর্ঘস্থায়ী যেমন হতো না তেমন শক্তিশালীও হতে পারতো না। আজও দেওবন্দ আন্দোলনের জন্য এটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে আছে যাদের পূর্বসূরীরা দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে এবং যাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, তাদের উত্তরসূরীরা কিভাবে কংগ্রেসের সমন্বয়মূলক সেকুলার রাষ্ট্র চিন্তার সাথে একাত্মবোধ করতে পারলো!

১৯৪০ থেকে ৪৭ সাল পর্যন্ত দেওবন্দের ওলামারা তথা জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করে। মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণার বিপক্ষে বেশ কয়েকটি বিবৃতি দেন। এর মধ্যে ভুখণ্ড ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সমর্থনে প্রদত্ত বিবৃতিটি আল্লামা ইকবালের নজরে আসে। তিনি মাদানীর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন ও তার ভুলের দিকে ইংগিত করে বলেন, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে নিতান্তই সাম্প্রতিক কালের পাশ্চাত্যের ধারনা, যা কোনভাবেই ইসলামী রাজনৈতিক দর্শনের অংশীদার হতে পারে না। এ ধরনের পাশ্চাত্যমূখী ধারণা মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেবে মাত্র। যাই হোক পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করতে যেয়ে দেওবন্দের ওলামারা কিন্তু অনেকটা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যান। মুসলিম ভারতের ইতিহাসে এটি একমাত্র ঘটনা যে ওলামারা এই প্রথম সাধারণ মুসলমানদের বিপক্ষে অবস্থান নিলেন।

রাজনৈতিক পার্থক্য যাই থাকুক না, দেওবন্দ ইসলামী শিক্ষার এক অভূতপূর্ব কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। দেশি বিদেশি অসংখ্য ছাত্রের এটি হয়ে উঠেছিল তীর্থভূমি। শুধু তাই নয় দেওবন্দ তৈরি করেছিল অসংখ্য আলেম যা ভারতীয় মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। এদের মধ্যে দু'একজন হচ্ছেন মওলানা আশরাফ আলী থানবী, যিনি বেহেশতি জেওর বইটি লিখে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষাপ্রচারে বড় রকমের ভূমিকা পালন করেছেন; হুসাইন আহমদ মাদানী, যিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার পরিচালক ছিলেন এবং তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শাব্বীর আহমদ উসমানী, যিনি পাকিস্তানের শাইখ-উল-ইসলাম হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

অন্যান্যদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও হাফিজুর রহমান সিয়ারভী, এরা দুজন ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন। স্বনামধন্য চিকিৎসক হাকিম আজমল খান, আহলে হাদীস নেতা সানাউল্লাহ অমৃতসরী ও পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেম এহতেশামূল হক থানভীও দেওবন্দের সৃষ্টি।

www.pathagar.com

হায়দারাবাদ ট্রাজেডি

উনিশ আর বিশ শতককে বলা যায় মুসলমানদের জন্য এক ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ। এ কালে এসে মুসলমানরা যা পেয়েছে তার চেয়ে হারিয়েছে অনেক বেশি। সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত থাবা একালে মুসলমানদের যত বেশি রক্ত ঝরিয়েছে বোধ হয় এর নজির ইতিহাসে খুব একটা পাওয়া যাবে না। দেখতে দেখতে মুসলমান দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের করতলগত হয়েছে। শত শত বছরের মুসলিম ঐক্যের প্রতীক খেলাফত খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে আর সেই সাথে মুসলমানদের উপর নির্যাতন আর নিবর্তনের দীর্ঘ ট্রাজেডি রচিত হয়েছে। এরকম এক ট্রাজেডির নাম হচ্ছে হায়দারাবাদ। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পুরোহিত বৃটেন শুধু মুসলিম দুনিয়ায় তার খবরদারি আর রক্তক্ষয় করেই ক্ষান্ত হয়নি। উপনিবেশগুলো থেকে বিদায় নেবার সময় তারা এমন সব সমস্যা জিইয়ে রেখে গেছে যার মাশুল আজও মুসলমানদের গুণতে হচ্ছে। এর একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে আজকের কাশ্মীর। কিন্তু কাশ্মীরের সাথে হায়দারাবাদের পার্থক্য হচ্ছে কাশ্মীরের জনগণ অদ্যাবধি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী জেহাদ জারি রেখেছে আর হায়দারাবাদের আজাদী পাগল মানুষের সংগ্রামকে অত্যাচার আর নিবর্তনের স্টীমরোলারের তলায় স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন হায়দারাবাদের নাম পৃথিবী মনে রাখেনি। হায়দারাবাদ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, তার ছিল স্বাধীন প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা- এসব আজ বিস্মৃত প্রায় ইতিহাসের গর্ভে আশ্রয় পেয়েছে। মীর লায়েক আলীর লেখা The Tragedy of Hyderabad গ্রন্থে হায়দারাবাদের আজাদী পাগল মানুষের সেই বেদনাঘন কাহিনীর বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। মীর লায়েক আলী ছিলেন স্বাধীন হায়দারাবাদের শেষ প্রধানমন্ত্রী। আগ্রাসি ভারতের বিরুদ্ধে হায়দারাবাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে এই লায়েক আলী তার দেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য শেষাবধি লড়াই চালিয়ে ছিলেন। এ লড়াই যখন চলছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী স্বাধীন হায়দারবাদের ওপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন বিশ্ব শান্তির মন্ত্র উচ্চারণকারী পুরোহিত দেশগুলো এ অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

টু শব্দটিও করেনি। এমনকি জাতিসংঘও না। হায়দারাবাদের মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে। তখন থেকেই হায়দারাবাদকে কেন্দ্র করে মুসলিম শিল্প-সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটে তা পুরো দাক্ষিণাত্যকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও হায়দারাবাদ পুরোপুরি স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়নি। ব্রিটিশ সরকারের সাথে চুক্তি সপেক্ষে এটি একটি দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশের বিদায়ক্ষণেই হায়দারাবাদের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন বুঝতে পেরেছিল পৃথিবী জুড়ে তার কারবার করবার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তখন তারা ভারত ত্যাগের একরকম প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিল। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দুদের সহযোগিতায়। তাই বিদায়ের কালেও তারা পুরনো মিত্রকে অসন্তুষ্ট করতে চায়নি। ভারত বিভক্ত হোক এবং ভারতের বুক জুড়ে মুসলিম লীগের দাবী মোতাবেক একটা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক- মুসলিম বিদ্বেষী বৃটেন কখনোই চায়নি। ভারতের শেষ ভাইসরয় ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। তিনি ছিলেন নেহেরুর ব্যক্তিগত বন্ধু। তিনিও চাননি ভারত বিভক্ত হোক। কেবল মাত্র কায়েদে আযমের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সামনে ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের দাবীকে অখন্ডনীয় বাস্তবতা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। পাকিস্তানের দাবীকে যখন ধূলিসাৎ করা গেল না, তখন নেহেরু ও তার সাম্রাজ্যবাদী বন্ধু মাউন্ট ব্যাটেন র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে বিকলাঙ্গ পাকিস্তান দেয়ার ব্যবস্থা করল। মুসলমানদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি উপেক্ষা ও ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে খর্বাকৃতির পাকিস্তান দেয়ার এসব গোপন পরামর্শের কথা পরবর্তীকালে ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক লাপিয়ের কৃত Freedom at Midnight গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। দেশ বিভাগের সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, দেশীয় রাজ্যগুলো তাদের ইচ্ছানুসারে ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে অথবা তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারবে। মীর লায়েক আলী জানিয়েছেন, এ সিদ্ধান্ত অনুসারেই হায়দারাবাদের নিযাম মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, হায়দারাবাদ ভারত বা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রেই যোগ দেবে না, সে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই থাকবে।

www.pathagar.com

মাউন্ট ব্যাটেন উত্তরে নিযামকে জানান যে, তিনি তার পত্র যথাযথভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি খুব শিগগিরই তার উত্তর আশা করছেন। মীর লায়েক আলী লিখেছেন- উত্তর পত্রটি অবশ্য কখনোই আসেনি। কেন না, মাউন্ট ব্যাটেন পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন, তিনি নিযামের পত্রটি ব্রিটিশ সরকারের নিকট আদৌ প্রেরণ করেননি। মাউন্ট ব্যাটেনের এই স্বীকৃতির সাথেই যোগ রয়েছে হায়দারাবাদকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দের গভীর ষড়যন্ত্রের। ভারত বিভাগের পরেও কংগ্রেস মাউন্ট ব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করেছিল। এ ছিল তার মুসলমানদের সাথে বেঈমানীর পুরস্কার। মাউন্ট ব্যাটেনকে কংগ্রেস কর্তৃক গভর্নর জেনারেল নিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজ্যগুলোকে সুচতুর দক্ষতার সাথে ভারতভুক্ত করা। দেশীয় রাজ্য হিসেবে কাশ্মীর ও হায়দারাবাদের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক এবং নেহেরুর দৃষ্টি বেশি করে পড়েছিল এ দুটি রাজ্যের ওপর। দেশ বিভাগের সাথে সাথে হায়দারাবাদ নিজেকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা করে। সেখানে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি স্বাধীন সরকারের জন্য যা যা প্রয়োজন তাও চালু করা হয়। কিন্তু অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা নেহেরু এটা মেনে নিতে পারেননি- ভারতের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পাকিস্তানের মতো আর একটা স্বাধীন রাষ্ট্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। তাই তিনি একে সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে রাতারাতি দখল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আগ্রাসনের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। এ দিনটি নির্ধারণ করার পিছনে একটা কারণ ছিল। এর মাত্র দুদিন আগে কায়েদে আযম ইন্তেকাল করেছিলেন- সমগ্র পাকিস্তান তখন শোকে মুহ্যমান। ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, এ সময় হায়দারাবাদে অভিযান চালালে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তেমন কোন বাধা সৃষ্টি হবে না। কার্যত তাই হয়েছিল। আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ভারতীয় বাহিনীর সাথে হায়দারাবাদের সেনাবাহিনী টিকে থাকতে পারেনি। হায়দারাবাদ ভারতের পদানত হয়েছিল। মাত্র পাঁচ দিনের যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী ৭০,০০০ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ এগুলো তো ছিলই। এই যে সার্বিক গণহত্যা, ভারতীয় বাহিনীর মানবতা বিরোধী রক্তক্ষয় ও লোকক্ষয়ের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক চোখ তুলে তাকায়নি।

www.pathagar.com

জাতিসংঘ থেকে খবর এল– হায়দারাবাদ সংক্রান্ত যে আলোচনা সভা ১৬ সেপটেম্বর হওয়ার কথা ছিল, তা ২০ তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্বজুড়ে মুসলিম দলনের যে চিত্র একালে আমাদের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে, তা একটাই ইংগিত করে মুসলিম নিবর্তনের ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ার সব শক্তিই এক ও অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। তাই হায়দারাবাদে ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের চালিকশক্তিগুলো নিষ্ক্রীয়তার অভিনয় করে গেছে।

হায়দারাবাদের যুদ্ধ থেকে আর একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে– মুসলমানদের বিপর্যয় তার ভেতর থেকেই যুগে যুগে সূচিত হয়েছে। যুদ্ধে নিযাম বাহিনীর পরাজয় এত ত্বরিত গতিতে সম্ভব হতো না, যদি হায়দারাবাদ বাহিনীর প্রধান এল এদরুস বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন। পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফর যে ভূমিকা পালন করেছিলেন সাঈদ আহমদ এল এদরুস তার পুনরাভিনয় করেছিলেন মাত্র। এ আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না, যদি বিশ্বাসঘাতক এল এদরুসের পাশে দেশপ্রেমিক কাশেম রিজভীর নাম উচ্চারিত না হয়। এই দেশপ্রেমিক নিজস্ব উদ্যোগে দু'লাখ বাহিনীর এক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেছিলেন। যারা ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল।

হায়দারাবাদ আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। কিন্তু সে ইতিহাস আমাদের জন্য কতকগুলো দিক নির্দেশনাও রেখে গেছে। অখণ্ড ভারততত্ত্বের প্রবক্তারা উপমহাদেশব্যাপি ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন এখনো বিসর্জন দেয়নি। এই স্বপ্নের কথা সেই দশম শতাব্দীতে আলবেরুনী তার কিতাবুল হিন্দে পরিষ্কারভাবে লিখে গেছেন। মনুসংহিতার সমাজের প্রধানরা যে অন্যের ন্যায্য দাবী দাওয়াকে কখনোই মেনে নেয় না, তার কথা আলবেরুনীর চেয়ে সুন্দরভাবে কেউ বলতে পারেননি। আধুনিক কালে জওহরলাল নেহেরু তার Discovery of India গ্রন্থে অখণ্ড ভারতব্যাপি সেই স্বপ্ন বিস্তারের কথা পুনরায় উচ্চারণ করেছেন। এ ইতিহাসের পাতাগুলো আজ আমাদের নেড়ে চেড়ে দেখবার প্রয়োজন আছে বৈকি। কারণ যে শক্তি হায়দারাবাদের বুক চিরে রক্তের বন্যা ছুটিয়েছিল, তারা যে আমাদের আজাদীকে পায়ের তলে পিষে মারবে না তার কোন গ্যারান্টি নেই। সেই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কাশেম রিজভীর মতো দেশ প্রেমিকদের কোমর বেঁধে দাঁড়ানোর সময় আজ এসেছে।

www.pathagar.com

ফরায়েজী আন্দোলন ঃ আত্মসত্তার রাজনীতি

হাজী শরিয়তুল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলনের নায়কেরা আঠার-উনিশ শতকের উপনিবেশ কবলিত বাংলাদেশের মাটির ভিতর যুগ-যুগান্তরের বিদ্রোহ ও নিঃশ্বাসের এক প্রবাহ ধ্বনি শুনেছিলেন। আজকের ই-মেল, সাইবার বুক ইত্যাদিতে অভ্যস্ত আমরা যখন দেখছি বিশ্বায়নের বদৌলতে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পুরো ব্যাপারটাই বিপন্ন ও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে তখন ফরায়েজীদের প্রাসংগিকতা যে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ফরায়েজী আন্দোলন জাতীয় মাইল স্টোন হিসেবেই স্বীকৃত। সুতরাং ঐ ঘটনার বিবরণী পেশ করা নিছক অতীতচারিতা ছাড়া কিছু নয়। বরং আজকের একমেরু বিশ্বে প্যাক্স আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী অভিঘাতে যখন দুনিয়ার তাবৎ দেশ ও তার জনগণ সন্ত্রস্থ ও অনিশ্চিত বিভীষিকায় আচ্ছন্ন তখন কি আমরা ফরায়েজীদের মত অবলীলায় বলতে পারবঃ

আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে তার মালিক হলেন আল্লাহ। যেহেতু আল্লাহ জমি দান করেছেন এবং মানুষ হল তার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি, সেজন্য এই স্বর্গীয় দান ব্যবহার করবার অধিকার সকলের রয়েছে। সুতরাং যারা চাষ করে, জমি তাদেরই। তাই জমিদার কর্তৃক কৃষক শোষণ ভয়ানক অপরাধ। আর যেহেতু আল্লাহ জমির উপর সকলের সমান অধিকার দান করেছেন, সেজন্য জমি থেকে খাজনা আদায় করা তার আইনের পরিপন্থী।

ফরায়েজীরা যখন তাদের এই বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করেছিলেন তখন কালমার্কস ও এঙ্গেলসের বিখ্যাত কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো প্রকাশিত হয়নি কিংবা তাদের প্রচারিত শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা উপনিবেশ কবলিত বাংলাদেশে রীতিমত অপরিজ্ঞাত ছিল।

হাজী শরিয়তুল্লাহ ও দুদু মিঞার আন্দোলন প্রথম দিকে ছিল ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয় এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াও লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

ফরায়েজী আন্দোলনের সমর্থকরা ছিলেন মূলতঃ ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও ঢাকার দরিদ্র কৃষক ও তাতী শ্রেণীর মানুষ। এরা দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশের

www.pathagar.com

সমর্থনপুষ্ট জমিদার ও নীলকরদের হাতে দুঃসহ অত্যাচার সহ্য করছিলেন। এদের সেই ক্ষোভকে কাজে লাগান হাজী শরিয়তুল্লাহ ও দুদু মিঞা। ফলে এদের নেতৃত্বে তারা শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিনা দ্বিধায় শামিল হন। ক্ষুধা ও দারিদ্র ক্লিষ্ট মানুষের এই বাঁচার সংগ্রামকে হাজী শরিয়তুল্লাহ ও দুদু মিঞা এক বৈপ্লাবিক স্তরে উন্নীত করেন এবং শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের এই সংগ্রাম ইসলামী ভাবাদর্শ দ্বারা বিপুলভাবে উজ্জীবিত হয়।

আজকালকার যে সব আধুনিক ভাবুক ও বুদ্ধিজীবীরা প্রচার করেন ধর্মের কোন প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং মানব মুক্তির লক্ষ্য সূচক ভূমিকা নেই তারা ফরায়েজী আন্দোলন এবং সমসাময়িক তিতুমীরের তরীকায়ে মোহাম্মাদীয়া আন্দোলনকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন জানি না।

ফরায়েজী আন্দোলন ছিল আঠার-উনিশ শতকে পুরো মুসলিম জগতব্যাপি যে সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল তারই অংশ বিশেষ। এসব আন্দোলনের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলিম সমাজে যুগ যুগ ধরে যে সব অনৈসলামী আচার ও রেওয়াজ ঢুকে পড়েছিল তার থেকে মুক্ত করে ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ ফিরিয়ে আনা এবং আল কোরআনের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা। এ আন্দোলনের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ইসলামের মূল্যবোধের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি, ইনসাফ ও সমতাবাদী বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মুসলিম দেশগুলোতে এসময় যে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা নানাভাবে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান। এসব আন্দোলনের নায়করা তাই সব ধরনের জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন এবং দেশি বিদেশি অত্যাচারী শাসককুলের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফরায়েজী আন্দোলনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে তৎকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম জগতের এই পরিবর্তনগুলো মাথায় রাখতে হবে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটে এবং বাঙালি মুসলমানের ভাগ্যের দরজা এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করে এবং একদল পদলেহী জমিদার ও মধ্যসত্ত্বভোগীর উত্থান ঘটায়। এদের বল্গাহীন আচরণে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কৃষককুল ঝাঁঝরা হয়ে যায়, যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। এই দরিদ্র কৃষকরা বছরের এক মৌসুমে লাঙ্গল চষতো, আর এক মৌসুমে তাত বুনতো। জমিদারের অবৈধ করভারে চাষীরা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ সরকারের বাণিজ্যনীতির ফলে দেশীয় তাত শিল্প শেষ হয়ে যায়। মূলতঃ এই দরিদ্র চাষা ও বেকার তাতীরাই ছিল ফরায়েজী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সমর্থক। ১৭৫৭ সালের পর ব্রিটিশের বৈরী আচরণে মুসলমান অভিজাত শ্রেণী নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের পক্ষে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব ছিল না। এই শূন্যতার প্রেক্ষাপটে সাধারণ মুসলমানের ভিতর থেকেই প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গে এটি ফরায়েজী আন্দোলনের আকার নেয়। পশ্চিমবঙ্গে তিতুমীরের আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ দুটোই ছিল প্রায় সমসাময়িক সময়ের আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে এসব আন্দোলন ছিল মাটি ও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন। অন্য দিকে তৃণমূল থেকে গড়ে ওঠা এসব আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় অনুচরদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল।

আমাদের দেশের ইতিহাস যারা লিখেছেন তাদের একটা বড় অংশ আজ পর্যন্ত তিতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহ কিংবা ফকির মজনু শাহর মত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসাধারণ ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেননি। এর কারণ হচ্ছে এরা সাম্রাজ্যবাদের আধুনিকতা নামক গোলামীর প্রকল্পকে হজম করেছিলেন। এই সব সাম্রাজ্যবাদপন্থী বা সহযোগী ঐতিহাসিকদের ঘৃণা এমনই তীব্র যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে এই অধ্যায়টি পুরোপুরি খারিজ করে দিতেও কসুর করেন না। অনেকে এই সব আন্দোলন ও সংগ্রামকে নিতান্ত 'সাম্প্রদায়িক' ও 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলেও নিন্দা করেন। কারণ এই সব আন্দোলনের নায়করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং ইসলাম ধর্মের বৈপ্লবিক তাৎপর্য থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন।

বামপন্থী ভদ্রলোকদের সমস্যা হচ্ছে ঐ ধর্ম জিনিসটা। ধর্মকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো যায় কি না এ নিয়ে তারা এখনো দ্বন্দ্বে ভোগেন। এই কারণে এ সব আন্দোলনকে তারা নিছক পশ্চাৎপদ কৃষক চেতনার চিহ্ন জ্ঞানে বিচার করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এসব আন্দোলন ছিল অগ্রসর চিন্তারই প্রকাশ। কিন্তু এই বিচারটা নির্ভর করছে আপনি কোথায় আছেন তার উপরে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মের উজ্জ্বল ভূমিকাটা সেকালেও যেমন গৌরবের একালেও তেমনি সমান তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিম

www.pathagar.com

এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের রিরুদ্ধে আজ যে লড়াই চলছে তার পিছনে তো ধর্মই প্রধান হাতিয়ার।

ফরায়েজী আন্দোলনের গতি প্রকৃতির দিকে নজর দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে এর উত্থান ঘটলেও শেষ পর্যন্ত এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এদেশেীয় বরকন্দাজ জমিদার-নীলকরদের শোষণের হাত থেকে নিস্কৃতির পথ দেখানোয় দরিদ্র মুসলমান কৃষক সমাজে এই আন্দোলন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় ফরায়েজীদের প্রচারিত সামাজিক সুবিচার ও অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার দাবী অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। যে কোন আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী ছাড়া ঐ আন্দোলনের কার্যকারিতা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। ফরায়েজী আন্দোলনের ভিতরে জনগণের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের ইংগিত ও শক্তি নিহিত ছিল বলে ঐ আন্দোলন এত প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু তাই নয়, এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দারা হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তৎপরবর্তী দুদু মিঞার নেতৃত্বে তিতুমীরের মত একটা বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটতে পারে বলে ধারণা করেছিল। উত্তর আফ্রিকার সানুসী আন্দোলনের মত ফরায়েজী আন্দোলনও রীতিমত একটা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র কায়েম করে ফেলেছিল। ফরায়েজীদের তৎপরতায় অত্যাচারী জমিদাররাই শুধু ভড়কে যায়নি, ব্রিটিশরাজও রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের কালে ব্রিটিশরা তাই দুদু মিঞাকে জেলে পুরে রাখে এবং দীর্ঘদিন তিনি কারাবাস করেন। এ সময় ফরায়েজীদের উপরও ব্রিটিশের জুলুম ও নিষ্ঠুরতা নেমে আসে।

বাংলার মুসলামান সমাজ যখন ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পথ ধরে স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ খুঁজছে তখন বাঙালি হিন্দু সমাজের নেতারা কলকাতায় বসে এদেশে ব্রিটিশের আগমন ও শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও শাসন হিসেবে গণ্য করে শ্বেত প্রভুদের পদলেহনে ব্যস্ত। এই প্রেক্ষিতে ফরায়েজী ওহাবী আন্দোলনের মূল্য বিচার জরুরি। বাংলার মুসলমান সমাজে যখন জন্মেছেন তিতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহরা তখন প্রতিবেশী সমাজে এগিয়ে এসেছেন রামমোহনের মত মানুষেরা। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিবর্তন তাই একভাবে হয়নি। রামমোহনের চোখে ব্রিটিশের আগমন ছিল ঈশ্বরের আশীবাদ স্বরূপ। তার হাত ধরেই কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু রেনেসাঁর উত্থান। সেদিন একজনের চোখে যা ছিল আধুনিকতা বা রেনেসাঁ আর একজনের চোখে তাই ছিল গোলামীর নামান্ত

www.pathagar.com

র। রামমোহন বাঙালি হিন্দু সমাজের জন্য অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাকে কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে অভিবাদন জানাতে পারবে না। তিতুমীর কিংবা হাজী শরিয়তুল্লাহকে নিয়ে সেই রকম কোন সংশয় নেই। ফরায়েজী আন্দোলনের বিপ্লবী তাৎপর্য বুঝতে হলে বাঙালি মুসলিম সমাজের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবন করা চাই। কারণ এরা প্রকৃতিগতভাবে কোন অন্যায় অবিচার ও জুলুমবাজী সহ্য করতে রাজী নয়। এই কারণেই ব্রিটিশরা ক্ষমতা দখলের পর ভারতবর্ষে একশ' বছরব্যাপি মুসলমানরা বিভিন্নভাবে যে লড়াই চালিয়েছিল বাঙালি মুসলিমরা তাতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল।

ফরায়েজী আন্দোলনের নায়করা আমাদের পূর্বপুরুষদের রাজনৈতিক পরাজয়ের দিনে বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মচেতনা ও আত্মপরিচয় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বড় রকমের ভূমিকা রেখেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়াই হচ্ছে এই পরাজয়ের কারণ। তাই এর প্রতিকার কল্পে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন তারা। পাশাপাশি সেই সময়ে নেতৃত্বহীন মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে নিপীড়িত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের পথ ধরেই পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়। সুতরাং ফরায়েজী আন্দোলনকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দেলনের প্রথমপর্ব হিসেবেও উল্লেখ করা যায়।

আজ প্রায় দুই শতাব্দী পরে একালের প্রেক্ষিত্রে ফরায়েজী আন্দোলনের আদৌ কোন প্রাসংগিকতা আছে কি? যে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফরায়েজী বিপ্লবীরা লড়াই করেছিলেন সেই ব্যবস্থা আজও অটুট আছে। সাম্রাজ্যবাদের কৌশল পাল্টেছে, চরিত্র পাল্টেনি। দুর্বীনিত সাম্রাজ্যবাদের শোষণ লুণ্ঠন ও বেঈনসাফী আজও পৃথিবীব্যাপি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিটি জনগোষ্ঠী ও ধর্মবিশ্বাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে বিধ্বস্ত, বিকৃত করে বিশ্বব্যাপি একটি এককেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈকি ব্যবস্থা গড়ে তুলবার পায়তারা চলছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পৃথিবীর তাবৎ নিপীড়িত মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প নেই। এই ঐক্য শুধু কথার ঐক্য নয়। মতাদর্শিক ঐক্যও হওয়া চাই। ফরায়েজীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক উজ্জীবন ও আত্ম আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যে নমুনা রেখে গেছেন তা আজও পথের দিশা দিতে পারে। আজকের দিনে ফরায়েজী আন্দোলনের এখানেই গুরুত্ব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com